তারা অশরীরী

তারা অশরীরী

গোরাচাঁদ মিত্র

শঙ্খ প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন, ১৩৭০

প্রকাশক
মনোরঞ্জন মজুমদার
শঙ্খ প্রকাশন
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর
শ্রীনিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ শিল্পী
সমীর মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

প্রতিমা

আগস্ট মাসের সন্ধ্যা। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। বারীনের ফ্ল্যাটে সুনন্দ প্রবাল আর আমি আড্ডা দিচ্ছিলাম। প্রত্যেকের হাতে হুইস্কির গেলাস। একসময় প্রবালই কথাটা তুলল। —হ্যাঁ রে! এবার পুজোয় আমরা কোথায় যাচ্ছি?

বারীন নির্বিকার মুখে বলল—অ্যান্টার্ক্‌টিকায়।

প্রবাল একটু চটে গেল। —মাতলামি করিসনে! দু'চার চুমুক পেটে পড়তেই অ্যান্টার্ক্‌টিকা! কথাটা আমি সিরিয়াসলি বলছি। একটু আগে থেকে প্ল্যানপ্রোগ্রাম না করলে গতবারের মত ফেঁসে যাব।

বারীন এবার মিটিমিটি হেসে বলল—মাতলামি বলছিস! মালটা কার? শালা! বাপের জন্মে খাঁটি স্কচ কখনও চোখে দেখেছিস? খাচ্ছিস। চুপচাপ খা। বাইরে কেমন বর্ষার সেতার বাজছে শোন!

সুনন্দ বলল—বারীন! প্রবাল কিন্তু ঠিকই বলছে। এবার পুজোর সময়টা কোথায় কাটাব, আজই ঠিক করে ফেলা উচিত।

বারীন গেলাসে চুমুক দিয়ে চোখের ইশারায় প্রবালকে দেখিয়ে বলল—প্রবাল খচে গেলে ওর মুখটা কেমন ভুতুড়ে হয়ে যায় কেন বল তো? আমার ধারণা, ওর মধ্যে একটা ভূত আছে। বৃষ্টিবাদলা, আর তাতে সন্ধ্যাবেলা! আপন গড ! ওকে দেখে সত্যি আমার ভয় করছে।

প্রবাল হেসে ফেলল। বলল—ঠিক বলেছিস বারীন! আমার ভূতটা বলছে, এবার পুজোর সময়টা কোনও নির্জন জায়গায় পোড়ো বাড়িতে কাটিয়ে আসি। কাছাকাছি নদী আর শ্মশান থাকাও উচিত।

সুনন্দ বলল—ভ্যাট ! আজে-বাজে কথা বলার চেয়ে প্ল্যানটা ঠিক করা যাক। গতবার আমরা হাথিয়াগড়ে গিয়ে যথেষ্ট দুর্ভোগে পড়েছিলুম। আমার মতে, এমন কোনও জায়গা ঠিক করা হোক, যেখানে ভিড়ভাট্টা নেই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে। সেই সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদও পাওয়া যাবে।

বারীন কী বলতে যাচ্ছিল, সেইসময় ডোরবেল বাজল। বারীনের কাজের লোক মধু এসে দরজায় উঁকি দিল। বারীন তাকে বলল—তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গে! আমি দেখছি।

মধু বেগতিক বুঝে কেটে পড়ল। বারীন বেরিয়ে গেল। পেশায় সে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। কিন্তু মক্কেলদের সে তার এই ডেরায় আসতে দেয় না। তা ছাড়া আজ রবিবার। এই ফ্ল্যাটটাতে সে রবিবার বা অন্যান্য ছুটির দিনটা কাটাতেই আসে। আমরা, যারা তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাদের টেলিফোনে সে আমন্ত্রণ করে। আমরা সকাল থেকে রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত আড্ডা দিই। খাওয়াদাওয়া করি। মদ্যপানের ব্যাপারে অবশ্য বারীন যথেষ্ট সতর্ক। দৈবাৎ কেউ আউট হলে বারীন তাকে আউট করেই দেয়।

বারীন বেরিয়ে গেলে আমরা পরস্পর মুখ তাকাতাকি করছিলুম। সুনন্দ চাপা স্বরে বলল—গেলাসগুলো টেবিলের তলায় চালান করে দে! বলা যায় না! বারীনের দাদা বা বাবা—

তাকে থামিয়ে প্রবাল বলল—ধুর ব্যাটা! যে-ই আসুক, এ ঘরে সে ঢুকবে না। আর বাইরের লোক হলে বারীন তাকে দরজা থেকেই বিদায় করে দেবে। কিংবা তেমন জরুরি কিছু হলে বসার ঘর তো আছেই।

তখনই বারীনের জোরালো হাসি শোনা গেল। তারপর সে যার কাঁধ ধরে এ ঘরে ঢুকল, তাকে দেখে আমরা উল্লাসে হইচই করে উঠলুম। প্রবাল বলল—আরে রাজপুত্তুর যে! আয়! আয়! আমার পাশে বস!

সুনন্দ বলল—হ্যাঁ রে রাজপুত্তুর! অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলিস তুই?

বারীন ধমকের ভঙ্গিতে বলল—শাট আপ! শাট আপ! সাইলেন্স! রাজপুত্তুরের অনারে আজ আর এক পেগ করে খাওয়া যাবে। ...

বিজয়েন্দুকে আমরা রাজপুত্তুর বলি, তার কারণ আছে। তার পূর্বপুরুষ রাজা-জমিদার ছিলেন। তা ছাড়া তার চেহারাও চোখে পড়ার মত সুন্দর। গায়ের রং ফর্সা। চোখে কড়া পাওয়ারের সোনালি ফ্রেমের চশমা। চুলগুলো কোঁকড়ানো আর অগোছালো। এ বেলা তার পরনে সাদা চুস্ত পাজামা আর সাদা পাঞ্জাবি। আমাদের দেখে নিয়ে সে বলল—আসলে কী ব্যাপার জানিস? আজ সারাটা দিন কেমন একলা লাগছিল। মাঝেমাঝে একটা আনক্যানি ফিলিং—ঠিক বোঝাতে পারব না। মাঝেমাঝে এটা আমার হয়। সন্ধ্যায় ঠিক করলুম বারীনের ডেরায় যাওয়া যাক। আমি জানতুম, তোরা এখানে থাকবি। আমি একটা মনের মত পরিবেশ চাইছিলুম। আসলে ওই ফিলিংসটা অসহ্য লাগছিল।

বিজয়েন্দু কথা বলে আস্তে এবং প্রত্যেকটা শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে। আর 'আসলে' শব্দটা তার মুদ্রাদোষ বলা চলে। সে ডিভানের একপাশে বসল। তৎক্ষণে বারীন একটা গেলাসে হুইস্কি আর আইসকিউব ঢেলে তার সামনে ধরে বলল—সেবা করতে আজ্ঞা হোক রাজপুত্তুর! আমি—সত্যি বলছি, ভীষণ দুঃখিত যে, রাজপুত্তুরের কথা আমার মাথায় ছিল না।

গেলাসটা একটু অনিচ্ছার ভঙ্গিতে হাতে নিয়ে বিজয়েন্দু বলল—খাব?

আমরা একবাক্যে বললুম—খা! খা!

বিজয়েন্দু গেলাসে চুমুক দিয়ে বলল—সিগারেটের প্যাকেটটা ফেলে এসেছি। আসলে কোন-কোন দিন আমার কী যে হয়, কিছু মনে থাকে না।

বারীন তাকে একটা বিদেশী সিগারেট দিয়ে লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিল। তারপর বলল—ভাগ্যিস আমাদের চারজনের বউ নেই। অসুখবিসুখে বউ টেঁসে গেলে নিশ্চয় তোর মত অবস্থা হত। আনক্যানি ফিলিং না কী বললি! বিদ্যাপতির একটা লাইন আছে না? এ ভরা বাদর/মাহ ভাদর/শূন্য মন্দির মোর! ওরে রাজপুত্তুর! তোব বিছানা—সরি! মন্দির যে শূন্য!

বিজয়েন্দু হাসবার চেষ্টা করে বলল—না! ওসব কিছু নয়! তোদের ঠিক বোঝাতে পারব না। আসলে—

প্রবাল তার কথার উপর বলল—নিকুচি করেছে তোর আসলের। তোকে দেখে আমার কথাটা মনে পড়েছে। হ্যাঁ রে! বিহারে কোথায় যেন তোর ঠাকুর্দার একটা বাড়ি ছিল? সেটা কি আছে?

—সে তো রাজগড়ে। বিজয়েন্দু একটু অন্যমনস্কভাবে জানালার দিকে তাকাল। —বাড়িটা নেই। কেয়রাটেকার বাড়িটা প্রায় দখল করে বসেছিল। বছর তিনেক আগে বাবা বাড়িটা এক ভদ্রলোককে বেচে দিয়েছেন। আসলে রাজগড় এলাকা অসাধারণ একটা বিউটি স্পট। তোরা অ্যামেরিকার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ানের কথা জানিস।

বারীন বলল—আমি দেখে এসেছি। অ্যারিজোনার রাজধানী ফিনিক্স থেকে প্লেনে গিয়েছিলুম। ছোট্ট প্লেন খাদের মধ্যে দিয়ে উড়ে গিয়েছিল। কোথাও-কোথাও মন্দিরের মত দেখায়। মার্কিনরা দেশ-বিদেশের দেব-দেবীদের নাম দিয়েছে।

প্রবাল তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—রাজপুত্তুরকে বলতে দে!

বিজয়েন্দু বলল—ঠিক গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন না হলেও রাজগড়ের দক্ষিণে একটা গভীর গিরিখাত আছে; তলায় একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। প্রায় আড়াই হাজার ফুট নীচে নদীটা দেখলে রুপোর ফিতের মত মনে হয়। খাতের দুদিকে পাথরে মনে হবে আশ্চর্য কিউবিক চিত্রকলা। আসলে হাজার-হাজার বছর ধরে বাতাসে পাথর ক্ষয়ে গিয়ে ওইরকম অবস্থা।

বারীন বলল—গ্র্যান্ড ক্যানিয়নেও কলোর্যাডো নদী বয়ে যাচ্ছে।

প্রবাল খাপ্পা হয়ে বলল—তুই থামবি? রাজপুত্তুর আমাদের একটা জায়গার খোঁজ দিচ্ছে।

সুনন্দ বলল—কিন্তু ওখানে থাকব কোথায়? বিজয়েন্দুর বাবা তো বাড়ি বেচে দিয়েছে।

বিজয়েন্দু বলল—তোরা কি কোথাও বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান করেছিস?

প্রবাল বলল—হ্যাঁ। তবে এখন নয়। অক্টোবরে পুজোর ছুটির কয়েকটা দিন। সুনন্দ বলছিল জায়গাটা নির্জন হবে। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থাকবে। সেই সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগও থাকবে।

সুনন্দ বলল—আমরা প্রত্যেক বছর পুজোর সময়টা বাইরে দূরে কোথাও কাটিয়ে আসি। তুই হলি এক রাজপুত্তুর। আমাদের দলে জুটলে দুর্ভোগ বা কষ্টে পড়বি বলেই তোকে কখনও সঙ্গে নিতে চাইনি। বুঝলি তো?

বিজয়েন্দু হাসল। হাসলে ওকে আরও সুন্দর লাগে। সে বলল—না রে! কেন আমাকে সঙ্গে কখনও নিসনি, তার কৈফিয়ত দেওয়ার দরকার নেই। আসলে এ কথাটা তো ঠিক, মানে—ছোটবেলা থেকে যেভাবে মানুষ হয়েছি, একেবারে আদুরে গোপাল! বেশিদূর হাঁটাচলা করতে পারি না। এতটুকু শারীরিক পরিশ্রম সহ্য হয় না।

বারীন বলল—দ্যাখ বিজয়েন্দু। ওসব ভনিতা ছাড়। তোদের সেই বাড়িটা না হয় বিক্রি হয়ে গেছে। কিন্তু রাজগড়ে নিরিবিলি থাকবার মত জায়গা কি নেই?

—আছে। বিজয়েন্দু সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল। —আমাদের বাড়িটা রাজগড়ের শেষ প্রান্তে হলেও তত নির্জন এলাকা নয়। কিন্তু প্রায় হাফ কিলোমিটার দূরে একটা টিলার গায়ে সরকারি বাংলো আছে। যে-ভদ্রলোক আমাদের বাড়িটা কিনেছেন, তাঁকে চিঠি লিখলে

বাংলোয় থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। একটাই অসুবিধে—ওখানে বিদ্যুৎ নেই।

সুনন্দ লাফিয়ে উঠল। —তা হলে অ্যাডভেঞ্চারের লেজ ধরার সুযোগ এসেই গেল! তুই কালই সেই ভদ্রলোককে চিঠি লিখে পোস্ট করবি। আমরা ষষ্ঠীর দিন বেরিয়ে পড়ব। সপ্তমীতে পৌঁছুব। থাকব লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত।

প্রবাল গম্ভীর হয়ে বলল—রাজপুত্তুরেও আমাদের সঙ্গে যাবে।

বিজয়েন্দু যেন একটু চমকে উঠল। অথবা আমারই দেখার ভুল। সে বলল—আমি যাব?

আমরা একবাক্যে বললুম—যাবি।

বিজয়েন্দু বলল—আসলে আমার একটা অসুবিধে, তোরা তো জানিস। চশমা খুললে আমি প্রায় অন্ধ।

বারীন বলল—তাতে কী? তোর চশমা কেউ চুরি করবে নাকি? তুই যদি বেশি হাঁটাচলা না করতে পারিস, বাংলোয় কিংবা কাছাকাছি কোথাও বসে থাকবি।

এতক্ষণে আমি বললুম—আচ্ছা বিজয়েন্দু?

বিজয়েন্দু যেন অন্যমনস্কভাবে বলল—উঁ ?

—তুই নিশ্চয় ওই বাংলোয় বউকে নিয়ে হনিমুনে গিয়েছিলি?

বিজয়েন্দু আমার কথার জবাব দিল না। বলল—আসলে বাংলোর পজিশনটা এমন যে, সেখানে বসে অনেকদূর দেখা যায়। আর আশ্চর্য সব কল্পনা এসে যায়। বিশেষ করে জ্যোৎস্নারাতে—

সে হঠাৎ চুপ করল এবং হুইস্কিতে চুমুক দিল। আবার হয়ত আমার দেখা ভুল, মনে হল বিজয়েন্দু অনেক দূরে বসে কথা বলছিল .....

এইভাবেই অক্টোবরে আমাদের রাজগড়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। না না করেও বিজয়েন্দু শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গী হয়েছিল। একরাত্রির ট্রেনজার্নি। স্টেশন থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য রামেশ্বর প্রসাদ—বিজয়েন্দুদের বাড়ি যিনি কিনেছেন, জিপগাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। প্রায় তিন কিলোমিটার চমৎকার পিচ রাস্তার চড়াই-উতরাই এবং কখনও তরঙ্গায়িত রুক্ষ মাঠ, কখনও নিবিড় জঙ্গল পেরিয়ে সকালের রোদে উজ্জ্বল শহর রাজগড়ের কাছে জিপগাড়ি ডান দিকে বাঁক নিয়েছিল। এরপর পথটা ছিল অমসৃণ। বড়-বড় পাথর ফেলে কোন যুগে স্টিমরোলার চালিয়ে সমতল করা হয়েছিল। এখন বর্ষার পর অবস্থা শোচনীয়। ঝাঁকুনিতে হাড়গোড় ভেঙে যাবে মনে হচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা টিলার গায়ে টালিচাপানো বিলিতি ধাঁচের বাংলোটা দেখা গিয়েছিল। টিলার গায়ে ঘোরালো রাস্তাটা অবশ্য সমতল এবং মোরামে ঢাকা।

রাস্তায় আসবার সময় মনে-মনে খাপ্পা হলেও প্রসাদজির সুব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত আমাদের খুশি করেছিল। কেয়ারটেকার সুরেশ সিংহ এবং চৌকিদার রামলালের জিম্মায় আমাদের রেখে তিনি বলেছিলেন—কোনও দরকার হলে সুরেশকে দিয়ে খবর পাঠাবেন। এরিয়ায় দেখার মত অনেক কিছু আছে। বাণেশ্বর শিবের মন্দির, গড়ের জঙ্গল—যেখানে রাজা সুরজনারায়ণের

সঙ্গে মোগলদের সাংঘাতিক যুদ্ধ হয়েছিল। তা ছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কিছুদূর গেলে চণ্ডী নদীর খাত দেখা যাবে।

প্রসাদজী বিজয়েন্দুর একটা হাত হাতে নিয়ে আরও বলেছিলেন—কৃপা করে একবেলা আপনার ঠাকুর্দার হাবেলিতে গিয়ে ভোজন করলে খুশি হব। যা কিছু ঘটেছিল, সবই শ্রীভগবানের লীলা। আপনি যে আবার এসেছেন, তা-ও তাঁরই লীলা। তিনি ডেকেছেন বলেই তো আপনি এসেছেন।

শ্রীভগবানের লীলামাহাত্ম্য কী ধরনের হবে, তখন যদি তার আভাস পেতুম! তবে সেসব কথা পরে।

ব্রিটিশ আমলের তৈরি বাংলো এবং পরিবেশ দেখে প্রবাল বিজয়েন্দুকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলল—ওরে রাজপুত্তুর! আমাদের তুই কোথায় পৌঁছে দিয়েছিস রে! এ যে স্বর্গ!

বাংলোর চারদিকে বারান্দা। মধ্যিখানে প্রশস্ত ঘরে ফায়ারপ্লেস আছে। সম্ভবত কোনও বেরসিক সরকারি অফিসার ফায়ারপ্লেসের মাথায় ফ্রেমে বাঁধা প্রকাণ্ড ছবি বসিয়ে রেখেছে এবং ছবিটা শিবলিঙ্গের। বুঝলুম, বাণেশ্বর শিবমন্দিরের ভিতরে তোলা রঙিন ফোটো। এই ঘরেই ডাইনিং চেয়ার-টেবিল। সুরেশ সিংহ আমাদের পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। এ ঘরটাও চওড়া। দুটো ডাবলবেড নিচু খাট আর একপাশে নতুন একটা ক্যাম্বিশ খাট। সেটার ওপর নতুন বিছানা। প্রসাদজি এই খাটটা নতুন কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সুরেশ সিংহ তা না জানালেও আমরা টের পেয়েছিলুম।

ব্রেকফাস্ট এবং এ দিনের লাঞ্চ-ডিনারের ব্যবস্থাও প্রসাদজির অতিথিসৎকার। বিজেয়েন্দু বলল—ভদ্রলোক সত্যিই অসাধারণ। আসলে খুব স্ট্রাগল করে মাথা তুলেছেন তো! তাই ভগবানে অগাধ বিশ্বাস।

বারীন বলল—ওঁর ভগবানের লীলা আমাদের বিনিপয়সায় আজ খাওয়াচ্ছে। চুপচাপ ভক্তিভরে খেয়ে নে। তারপর—

প্রবাল বলল—তারপর আমরা সোজা নিচে নেমে গ্র্যান্ডক্যানিয়ন দেখতে যাব।

সুনন্দ বলল—ঠিক বলেছিস! ওখান থেকে ফিরে স্নান করে খেয়ে নেব। তারপর অ্যাডভেঞ্চারের প্ল্যান করা যাবে।

প্রবাল আস্তে বলল—বারীন! সঙ্গে মালটা নিবি কিন্তু, আমি ব্যাগে বাকি সরঞ্জাম নেব।

আমি বললুম—বিজয়েন্দু আমাদের গাইড হবে।

বিজয়েন্দু ম্লান হেসে বলল—বড্ড রোদ। তা ছাড়া ওদিকে মাঠটা পাথরে ভরা। আমি বরং একটু ঘুমিয়ে নেব।....

ব্রেকফাস্টের পর আমরা চারজনে বাংলোর দক্ষিণে ঘাসে ঢাকা ঢাল বেয়ে নীচে গেলুম। কিন্তু উপর থেকে এই তরঙ্গায়িত মাঠটার স্বরূপ বুঝতে পারিনি। মাঝে মাঝে ঝোপ বা একলা কোনও গাছ এবং সবখানে ছড়ানো শুধু পাথর আর পাথর। কয়েক পা এগিয়েই ছোট-বড় নানা গড়নের পাথরে উঠতে হচ্ছিল এবং নামতে হচ্ছিল। ডানদিকে দেয়ালের মত খাড়া একটা বিশাল উঁচু পাথরের নগ্ন পাহাড়। কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে হয়ত ওই পাহাড়ের একটা

অংশ ধসে গিয়ে এই অসমতল মাঠে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। আধঘণ্টা এই দুর্গমতায় হাঁটাহাঁটির পর আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়লুম। আকাশে মেঘ নেই। খর রোদে দরদর করে সবাই ঘামছিলুম। মাঝে মাঝে পাথরের ফাঁকে যে গাছ আছে, তার ছায়া গাছটার পায়ের তলায় গুটিয়ে গেছে। ছায়ায় একটু বিশ্রাম নেওয়ারও সুযোগ নেই। শেষে প্রবাল বলল—এক কাজ করা যাক। এখানে একডোজ করে যে যার স্বাস্থ্য পান করে নিই। তা হলে স্পিরিট ফিরে পাব।

বারীন অগত্যা রাজি হল। ব্যাগ থেকে গেলাস আর জলের বোতল বের করে আমরা হুইস্কি পান করে নিলুম। প্রবালের কথা সত্য হল। 'স্পিরিট' ফিরে পেলুম। তারপর আরও আধঘণ্টা গরম পাথরে ওঠানামা করতে করতে অবশেষে রুক্ষ গেরুয়া মাটিতে পৌঁছলুম, যেখানে তত পাথর নেই। হাঁটতে হাঁটতে বারীন হেঁড়ে গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। কিছু দূরে ঘন নীল উঁচু পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। সুনন্দ ভাঙা গলায় বলল—বিজয়েন্দু বলছিল ছোটনাগপুর পাহাড়ের একটা রেঞ্জ এখানে দেখা যায়। ওই দ্যাখ।

বারীন বলল—ধুস শালা! সেই গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন কোথায়? কিছুতেই যে পৌঁছনো যাচ্ছে না।

আমি বললুম—শ্রীভগবানের লীলা বারীন! আমরা এবার বেঘোরে মারা পড়ব। তেষ্টায় গলা শুকনো।

ততক্ষণে দুটো জলের বোতলই শেষ। প্রবাল বলল—গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে পৌঁছতে পারলে আমি আড়াই হাজার ফুট নীচে থেকে জল এনে দিতুম! কিন্তু কোথায় সে ব্যাটাচ্ছেলে?

বারীন ঘুরে বাংলোটা দেখার চেষ্টা করে বলল—যা বাবা! বাংলোটা ভ্যানিশ!

সঙ্গে সঙ্গে প্রবাল সুনন্দ আর আমি ঘুরে দাঁড়ালুম। সত্যি বাংলোটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। বললুম, সম্ভবত আমরা সোজাসুজি আসিনি! ডানদিকে গিয়ে—

আমাকে থামিয়ে দিয়ে প্রবাল বলে উঠল—আ রে! একটা মেয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছে?

আমরা বাকি তিনজন একসঙ্গে বললুম—কই? কই? কোথায়?

প্রবাল বলল—ভ্যানিশ! এখনই তো ওই গাছটার পাশে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ছিল!

সুনন্দ তার চুল টেনে দিয়ে বলল—শালা মরীচিকা দেখছে!

প্রবাল ব্যস্তভাবে বলল—আপন গড। স্পষ্ট দেখলুম। খয়েরি রঙের শাড়িপরা মেয়ে!

বারীন বলল—কোনও আদিবাসী মেয়ে হতে পারে। যাক গে। ছেড়ে দে। আর কতদূর হাঁটতে হবে রে?

বললুম—আগে বাংলোটা কোথায়, তা খুঁজে দেখা উচিত। তা না হলে সেখানে ফিরব কেমন করে? আমার মনে হচ্ছে, আমরা বাঁদিকে চলে এসেছি! ডানদিকে এগিয়ে গেলে নিশ্চয় বাংলোটা দেখতে পাব।

আমার ধারণা ঠিক ছিল। ডাইনে কিছুদূর গিয়ে বাংলোটা সোজা উত্তরে চোখে পড়ল। প্রবাল ক্লান্তভাবে বলল—ভুল হয়ে গেছে। কেয়ারটেকার ভদ্রলোককে গাইড করে আনা

উচিত ছিল। প্রায় একটা বাজে। কী করবি বারীন? তুই আমাদের লিডার। ডিসিশন নে শিগগির!

বারীন শ্বাস ছেড়ে বলল—লেট্‌স গো ব্যাক। এবার কিন্তু প্রত্যেকে বাংলোটার দিকে লক্ষ রেখে হাঁটবি।

সুনন্দ বলল—প্রবালকে বলে দে বারীন! ও ব্যাটা যেন আর খয়েরি রঙের শাড়িপরা মেয়ে না দেখে!

প্রবাল হাঁটতে হাঁটতে বলল—আমি মিথ্যা বলিনি। বিশ্বাস করা-না-করা তোদের ইচ্ছে।

এবার ফেরার সময় আমি বললুম—সুনন্দ খালি অ্যাডভেঞ্চার-অ্যাডভেঞ্চার করে। তা হলে একটা সত্যিকার অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেল।

আমার কথার উত্তরে কেউ কোনও কথা বলল না। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত আমরা চারজন যুবক হেঁটে চললুম। সেই সাংঘাতিক দুর্গমতায় প্রত্যেকেই টলছিলুম। পাথর থেকে পাথরে, আবার পাথরের ফাঁকে সঙ্কীর্ণ রুক্ষ মাটিতে, তারপর আবার পাথর থেকে পাথরে এলোমেলো চারজোড়া জুতোর অদ্ভুত শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

বাংলোটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। হঠাৎ একখানে থেমে বারীন বলে উঠল—এ কী রে? ব্যাটা রাজপুত্তুর কি আমাদের খোঁজে বেরিয়েছে? দ্যাখ! দ্যাখ!

অবাক হয়ে দেখি, খানিকটা দূরে বিজয়েন্দু টলতে টলতে পূর্বদিকে হাঁটছে। তারপর সে একটা পাথর থেকে আছাড় খেয়ে নীচে পড়ে গেল। অমনই আমরা চলার গতি বাড়ালুম। বলছি বটে বাড়ালুম, বলা উচিত ছিল, গতি বাড়ানোর চেষ্টা করলুম। এই দুর্গম মাঠে আজ বাতাসও চুপ। কিছুক্ষণ পরে বারীন ডাকল—বিজয়েন্দু! বিজয়েন্দু!

কোনও সাড়া এল না। আমরা মরিয়া হয়ে তাকে যেখানে পড়ে যেতে দেখেছিলুম, সেখানে পৌঁছুতে চেষ্টা করলুম। চিহ্ন হিসেবে বাঁদিকে একটা ঝোপ ছিল। ঝোপের কাছাকাছি গিয়ে দেখি, বিজয়েন্দুর কপাল থেকে রক্ত ঝরছে। সে একটা পাথরে হেলান দিয়ে গেরুয়া মাটিতে বসে আছে। মাটিটুকুতে কোনও রকমে হাঁটু দুমড়ে বসা যায় মাত্র। বারীন আর প্রবাল তাকে পাঁজাকোলা করে তুলল। সুনন্দ ব্যাকুলভাবে বলল—তুই এখানে কেন এসেছিলি? কোনও মানে হয়?

কিন্তু তারপরই লক্ষ করলুম, বিজয়েন্দু মূর্ছিত। তাকে ধরাধরি করে আমরা চারজনে যখন বাংলোর নীচে পৌঁছলুম, তখন ওপর থেকে সুরেশ সিংহ জিজ্ঞেস করলেন—কী হয়েছে সার?

বারীন প্রায় গর্জন করে বলল—জল নিয়ে আসুন! জল! কুইক!

সুরেশ সিংহ একটা লোটায় জল নিয়ে নেমে এলেন। বারীন জলের ঝাপটায় বিজয়েন্দুর জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করল। একটু পরে বিজয়েন্দুর জ্ঞান ফিরল। সে বিড়বিড় করে বলল—আসলে আমারই ভুল। আমি ওকে—না, মানে অবিকল তারই মত—স্পষ্ট দেখলুম। আসলে আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ও—

বারীন বলল—চুপ! কোনও কথা নয়।

আবার তাকে ধরাধরি করে বাংলোর বারান্দায় নিয়ে গেলুম। আশ্চর্য! বারান্দায় বাতাস

বইছে। সুরেশ সিংহ একটা সতরঞ্জি আর বালিশ এনে দিলেন। সুনন্দ বলল—এখানে ফাস্ট এডের বাক্সো নেই সুরেশবাবু?

বারীন বলল—আমার ব্যাগে তুলো আর ডেটল আছে। প্রবাল! নিয়ে আয়।

প্রবাল তুলো আর ডেটল আনল। সুরেশ সিংহ বললেন—আমি বরং ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি। সুনন্দ বলল—হ্যাঁ। শিগগির যান!

সুরেশ সিংহ হন্তদন্ত হয়ে সাইকেলে চেপে চলে গেলেন। কপালের ক্ষত সামান্যই। পাথরে ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরিয়েছিল। ডেটলে ভিজিয়ে তুলো সেখানে আটকে বারীন বলল—তুই হঠাৎ অমন করে কোথায় যাচ্ছিলি?

বিজয়েন্দু তার চশমা ঠিক আছে কি না আঙুল বুলিয়ে দেখে আস্তে বলল—আসলে সেই আনক্যানি ফিলিংটা পেয়ে বসেছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ কেউ আমার কপালে শ্বাস ফেলল। ঘুম ভেঙে দেখি—আশ্চর্য। প্রতিমা! সেই শাড়ি পরনে। সেই ব্লাউজ। আসলে—

বারীন ধমক দিল—চুপ! স্বপ্ন দেখে তোর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

সুনন্দ বলল—হ্যালুসিনেশন!

আমি বললুম—কিন্তু প্রতিমা কে?

প্রবাল হঠাৎ খাপ্পা হয়ে বলল—এখনও বুঝতে পারছিস না কে প্রতিমা? কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! সুনন্দ বলছে হ্যালুসিনেশন। বারীন বলছে স্বপ্ন। কিন্তু আমিও তো তাকে—

বারীনের চিমটি খেয়ে সে থেমে গেল। বারীন প্রায়ই বলে, প্রবালের মধ্যে একটা ভূত আছে।

ডাক্তার এলেন সাইকেলে চেপে। তখন বিজয়েন্দুকে বেডরুমে তার ইচ্ছে মত সেই ক্যাম্বিশের খাটে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখে বললেন—জ্বর! এখন এলাকায় ঘরে-ঘরে ইনফ্লুয়েঞ্জা। এ কিছু না। এই ট্যাবলেটগুলো খাইয়ে দেবেন।.....

বিজয়েন্দুর জ্বর ছাড়েনি। সন্ধ্যায় আমরা সতেজ থাকার জন্য হুইস্কি খেয়েছিলুম। সুরেশ সিংহ চিনে লণ্ঠন জ্বেলে বিজয়েন্দুর কাছে চেয়ার পেতে বসেছিলেন। রাত নটায় চৌকিদার রামলাল আমাদের খাবার আনল। সুরেশ সিংহ উঠে এসে আমাদের খাওয়ার তদারক করছিলেন। খেতে খেতে হঠাৎ প্রবাল বেডরুমের দরজার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—কে? কে?

তারপর সে এঁটো হাতেই উঠে গেল বেডরুমে। তাকে আবার চেঁচিয়ে বলতে শুনলুম—কে? কে ওখানে?

প্রথমে বারীন, তারপর সুনন্দ উঠে গেল। বারীন বলল—তোর হয়েছেটা কী? ব্যাটা নিজেই আস্ত ভূত। বারবার ভূত দেখছে!

প্রবালকে বলতে শুনলুম—আপন গড! সেই মেয়েটা। খয়েরি শাড়ি—

তার কথা থেমে গেল বিজয়েন্দুর আর্তনাদে। —প্রতিমা! প্রতিমা! তুমি এমন কেন করছ? তারপর সে চশমা ছুঁড়ে ফেলে ওঠার চেষ্টা করল। সুরেশ সিংহ তাকে বিছানায় চেপে ধরলেন।

কিন্তু কী ভয়ঙ্কর চেহারা আমাদের প্রিয় রাজপুত্তুরের! ঠোঁট কামড়ে ধরে লাল চোখে সে বিড়বিড় করে কিছু বলছিল।

আমাদের আর খাওয়া হল না। খবর পেয়ে জিপ নিয়ে প্রসাদজি এলেন। তখন রাত এগারোটা।

বিজয়েন্দুকে বিছানাসুদ্ধ জিপগাড়ির পিছনে তুলে প্রসাদজি হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। বারীন, সুনন্দ আর প্রবাল বিজয়েন্দুর পাশে বসল। আমি বারান্দায় বসে কেয়ারটেকার সুরেশবাবুর সঙ্গে ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করছিলুম। তারপর কথায়-কথায় আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের কথা এসে গেল। সুরেশবাবু বললেন—আপনারা ভুল পথে গিয়েছিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলে দিতুম। বাংলোর নীচে বাঁদিকে একটু এগিয়ে গেলে সুন্দর একটা রাস্তা পেয়ে যেতেন। ওই রাস্তাটা ব্রিটিশ আমলে তৈরি। রাস্তাটা চণ্ডী নদীর ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে। এক সময় ওখানে রেলিং ঘেরা চত্বর ছিল। এখন নেই।

সপ্তমীর ম্লান জ্যোৎস্নায় নীচের সেই রহস্যময় প্রান্তরের দিকে তাকাতে গা ছমছম করছিল। চৌকিদার রামলাল দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে মেঝেয় বসে ছিল। হঠাৎ সে একটু কেসে হিন্দিতে বলল—বাবুজি! আপনারা কিছু বুঝতে পারেননি। আমি পেরেছি। ওই বাবুজিকে আমি চিনি। উনি দু'বছর আগে স্ত্রীর সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসেছিলেন। চণ্ডীনদীর ধারে ছবি তোলার সময় পা ফসকে ওঁর স্ত্রীর নীচে পড়ে যান। লাশ আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এবার বুঝে নিন।

অবাক হয়ে বসে রইলুম। রাত প্রায় সাড়ে বারোটায় প্রসাদজির জিপ এল। প্রসাদজি আসেননি। তাঁর ড্রাইভার আমাকে সেলাম দিয়ে বলল, বাবুজি মারা গেছেন। মালিক আপনাকে যেতে বললেন। এখনই আসুন।

তা হলে বিজয়েন্দু মারা গেল? দুর্ঘটনায় মৃতা প্রতিমা কি তাকে এতদিন পরে কাছাকাছি পেয়ে নিজের পৃথিবীতে ডেকে নিল? আমি জানি না, কিছু বুঝি না। বারীন বলে, প্রবালের মধ্যে একটা ভূত আছে। প্রবাল নাকি প্রতিমাকে দেখতে পেয়েছিল। প্রবাল কি মিথ্যাবাদী? নাকি প্রতিমা একজন জীবিত মানুষকে সাক্ষী রাখতে চেয়েছিল? কোনটা সত্যি?..

ছায়াসঙ্গিনী

চারতলা বাড়ির ছাদের ওপর এই ঘরটা পেয়ে গিয়ে খুব সুখী ভাবছিলাম নিজেকে। আঠারো ফুট লম্বা বারো ফুট চওড়া একটা ঘর মাত্র একশ টাকা ভাড়ায় পেয়ে যাওয়া সৌভাগ্যই বলতে হবে।

হুঁ, ছাদটা অ্যাসবেস্টসের এই যা। গরমে একটু কষ্ট হতে পারে। হোক না। রাত্তিরে বাইরে খোলামেলা ছাদে শুলেই হল। ছাদটাও প্রকাণ্ড। রীতিমত খেলাধুলো করা যায়।

পূর্ব কলকাতার এই তল্লাটে এমন পুরনো বাড়ি খুব কমই আছে। রেললাইন, গোরস্থান, কল-কারখানা আর এখানে-ওখানে প্রচুর গাছপালা রয়েছে। আশেপাশে নতুন কয়েকটা উঁচু বাড়িও হয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে ফাঁকা ফাঁকা নিঃঝুম লাগে—বিশেষ করে রাত বিরেতে।

বাড়ির মালিক এক অবাঙালী মুসলিম। চিৎপুরে সুতোর বড় কারবার আছে। আমার বন্ধু প্রদ্যোত আয়করের বড় অফিসার। তার তদ্বিরেই চারতলার ওপর এই ঘরটা পেয়ে গেছি। শুনেছি, এ ঘরে পুরনো ভাঙচুর আসবাব থাকত আগে। পরে মালিক ভদ্রলোক এটা ভেঙে আরও একতলা তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। কর্পোরেশনের বিদঘুটে কী আইনের বাধা থাকায় নাকি করেননি। যাই হোক, নিরিবিলি লেখাপড়ার পক্ষে এমন ঘর পাওয়া সহজ নয়।

থাকতাম মির্জাপুরে একটা মেসে। লেখকদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় ব্যবস্থা থাকার কথা না। প্রদ্যোত যেচে এই সুখের ঘর জুটিয়ে দিয়েছে। বলেছে, এবার বিশ্ব সাহিত্যের হাটে হাঁড়ি ভাঙার মত কিছু লিখবি যোগো। নইলে কেলেঙ্কারি করে ছাড়ব।

প্রদ্যোত বরাবর আমার শুভানুধ্যায়ী ও সমঝদার বন্ধু। লিখেটিখে আমি যে একদিন অন্তত জ্ঞানপীঠটা পাবই, এতে ওর দৃঢ় বিশ্বাস।

ঘরের রং ফেরাতে এবং আসবাব সাজাতে যত টাকা খরচ করলাম, সামনে পুজো সংখ্যা কাগজগুলো থেকে তা উসুলের মতলব নিয়ে টেবিলে বসেছিলাম। কিন্তু ও হরি! মাথায় কিচ্ছু নেই। ভোঁ ভোঁ অবস্থা। ভাবছিলাম, নতুন জায়গায় গিয়ে যেমন ঘুম হয় না, তেমনি লেখাও আসে না। কিছুদিন পরে এই শূন্যতা কাটিয়ে ওঠা যাবে।

দিনসাতেক পরে দুপুরবেলা সিঁড়ি দিয়ে নামছি, দোতলার একটা ঘরের সামনে দেখি এক যুবতী দাঁড়িয়ে আছে। আমার চোখে চোখ পড়তেই হেসে নমস্কার করে বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

কেন করবেন না?

আপনি কি লেখক যোগব্রত রায়?

এসব ক্ষেত্রে অহমিকাবোধে সুড়সুড়ি লাগা স্বাভাবিক। মুচকি হেসে বললাম, আপনি কীভাবে জানলেন?

যুবতী ঠোঁটের কোনায় হেসে বলল, আপনার ঘরের দরজায় নেমপ্লেট লাগানো আছে। তাছাড়া ....

তাছাড়া?

আপনার চেহারা আর ভাবভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়।

হাসতে হাসতে বললাম, তাই বুঝি ?

হুঁ! আপনি যখন রাস্তায় হেঁটে যান, মুখটা নিচু থাকে। সব সময় প্লট ভাবেন তো।

ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, যুবতীটি বিবাহিতা। বয়স বাইশ-চব্বিশের বেশি হতেই পারে না। কেমন একটা কচি খুকি-খুকি ভাবভঙ্গিও আছে মুখে। আমাকে ও লক্ষ্য করে। এতে স্বভাবত আমার অবাক লাগার কথা। বললাম, আপনি এই ফ্ল্যাটেই থাকেন?

সে হঠাৎ কেমন আনমনা হয়ে বলল, থাকতাম। এখন মাঝে মাঝে আসি। জানেন, এই ফ্ল্যাটটার ওপর কেমন একটা মায়া জন্মে গেছে।

বলেই দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল। আচ্ছা, একটা অনুরোধ করব?

নিশ্চয় করবেন।

আমি যদি আমার লাইফ হিস্ট্রি বলি, আপনি তা নিয়ে একটা উপন্যাস লিখবেন? খুব রোমাঞ্চকর।

মাথায় ছিট আছে নাকি রে বাবা। কথাবার্তা কেমন গোলমেলে ঠেকছে যে। অবশ্য সবাই ভাবে তার নিজের জীবনটা ভারি রোমাঞ্চকর এবং তা নিয়ে উপন্যাস লেখা যায়। কিন্তু এর চাউনিতে ক্রমশ একটা অপ্রকৃতিস্থ ভাব মাঝে মাঝে ফুটে উঠছে। গায়ের রং ঘোরালো সিঁড়ির হাল্কা অন্ধকারে কেমন পাণ্ডুর দেখাচ্ছে। পাতা চাপা ঘাসের মত। অথচ আপাতদৃষ্টে শারীরিক রুগ্ণতার ছাপ নেই। ছিপছিপে গড়ন হলেও নিটোল এবং মাংসাল। শুধু চাহনি ভাসা ভাসা, আর কপালে তিনটে স্পষ্ট ভাঁজ। এবং চোখের তলায় ঈষৎ বাদামী ছোপ। কেন? ভেতরে গভীর দুঃখ-টুঃখ আছে এবং অনিদ্রায় ভোগে? বললাম, আগে শুনব—তারপর সে কথা। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে তো শোনা যায় না।

আমি কি তাই বলেছি? একটু ক্ষুব্ধভাবে বলল সে। আপত্তি না থাকলে আপনার ঘরেই বরং যেতে পারি।

নির্ঘাত ছিটগ্রস্ত—হিস্টেরিক টাইপ। দ্বিধায় পড়ে বললাম, কিন্তু এখন তো আমি বেরোচ্ছি।

ও কী বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছে, সেই সময় পেছনের ফ্ল্যাটের দরজায় শব্দ হল। আমি ঘুরলাম। বাড়ির আর সব বাসিন্দাদের সঙ্গে এখনও পরিচয় হয়নি। একটু বিব্রতও বোধ করলাম। এভাবে এক যুবতীর সঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, এটা কে কীভাবে নেবেন বলা যায় না।

দরজা খুলে এক টাকওয়ালা বৃদ্ধ ভদ্রলোক বেরিয়ে আমার দিকে সন্দেহাকুল দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, কাকে খুঁজছেন?

কাকেও না। আমি চারতলার ওপরের ঘরে থাকি।

বৃদ্ধ নমস্কার করে হাসিমুখে বললেন, ও। আপনি তাহলে নতুন ভাড়াটে? কী যেন নাম আপনার ....

যোগব্রত রায়!

আচ্ছা। আমি হেরম্ব মৈত্র। .... বলে বৃদ্ধ ভদ্রলোক অন্যপাশের যে ফ্ল্যাটের দরজার সামনে যুবতীর সঙ্গে কথা বলছিলাম, চোখ নাচিয়ে সেদিকটা দেখিয়ে বললেন, মনোরঞ্জনবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে—নাকি আগে থেকেই ছিল?

এতক্ষণে আমি ঘুরে দেখলাম, যুবতী নেই। কখন নিশ্চয় দ্রুত নিঃশব্দে ও ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছে। বোঝা যাচ্ছে, ওই মনোরঞ্জনবাবুর ফ্ল্যাটে তার যাতায়াত আছে।

বললাম, না। আলাপ নেই।

হেরম্ববাবু চোখে ফের সন্দেহের ছায়া পড়ল। বললেন, কার সঙ্গে কথা বলছিলেন যেন? কথাবার্তা শুনেই তো দরজা খুললাম।

এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে। আগে ওরা মনোরঞ্জনবাবুর ফ্ল্যাটেই থাকতেন বলছিলেন। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসেন। তা ... আমি ঝটপট ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করলাম হেরম্ববাবুকে। পাছে ভদ্রলোক অন্য কিছু ভেবে না বসেন।

আমাকে থামতে দেখে ভুরু কুঁচকে হেরম্ববাবু বললেন, ভদ্রমহিলা? চার নম্বর ফ্ল্যাটে একসময় থাকতেন? কেমন চেহারা বলুন তো?

চেহারার একটা মোটামুটি বর্ণনা দিলাম। শুনতে শুনতে হেরম্ববাবুর মুখে কেমন একটা বিদঘুটে ভাব দেখা দিচ্ছিল। শোনার পর কোন কথা না বলে সোজা এগিয়ে চার নম্বরের দরজার কাছে গেলেন। তারপর চাপা ষড়যন্ত্রসঙ্কুল গলায় বললেন, দেখছেন ব্যাপারটা!

দেখামাত্র আমি হতবাক। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। দরজায় বাইরে থেকে তালা আটকানো!

পাশাপাশি দুটো মাত্র ফ্ল্যাট এই সিঁড়ির মুখে দোতলায়। তাহলে গেল কোথায় সে? নিচে নেমে গেছে নিঃশব্দে? তাই হতে পারে।

হেরম্ববাবু হঠাৎ খপ্ করে আমার একটা হাত ধরে ফিসফিস করে বললেন, আপনি নতুন এসেছেন মশাই। একটা কথা বলি শুনুন। এ বাড়িটা ভাল না। আমরা উঠে যাওয়ার তালে আছি। পারলে আপনিও চেষ্টা করুন। সবাই সেই চেষ্টা করছে। জানেন? এ বাড়িতে কেউ দু-তিন মাসের বেশি থাকে না? চারতলার আটটা ফ্ল্যাটে যাদের দেখবেন, সবাই কম বেশি দুই থেকে তিন মাসের বেশি আসেনি। এসেই পালাই পালাই করছে।

হাত ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধ দ্রুত নিজের তিন নম্বর ফ্ল্যাটে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম।

চাকরি বাকরি করি নে। দিনের অনেকটা সময় পত্র-পত্রিকাব অফিস আর প্রকাশকদের কাছে আড্ডা দিয়ে কাটাই। সন্ধ্যায় ফিরে লিখতে বসি। রাত ন'টা নাগাদ বেরিয়ে খেয়ে আসি খানিকটা দূরের একটা হোটেলে। সেদিন ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে হন্যে হলাম। হেরম্ব মৈত্রের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। একটা আস্ত জলজ্যান্ত স্ত্রীলোক—আমার সঙ্গে এতক্ষণ বাক্যালাপ হল, সে কিনা ভূত!

তাহলে মেয়েটি কোন কারণে হেরম্ববাবুর চোখ এড়িয়ে আমার অজান্তে নিচে নেমে গেছে। তবু কৌতূহল জেগেছিল তার সম্পর্কে। তাই সন্ধ্যা সাতটায় ফিরে দোতলায় চার নম্বর ফ্ল্যাটের দরজায় বোতাম টিপলাম। একটু পরে দরজা ফাঁক হল। ভারী গলায় আওয়াজ এল, কাকে চাই?

মনোরঞ্জনবাবু আছেন কি?

দরজা পুরো খুলে খালি গায়ে লুঙ্গিপরা আমার বয়সী এক স্বাস্থ্যবান পেটাই গড়নের ভদ্রলোক বললেন, আপনিই তো ছাদের ঘরে এসেছেন?

হ্যাঁ। আমার নাম যোগব্রত রায়।

পরস্পর নমস্কার বিনিময় হল। তারপর মনোরঞ্জনবাবু বললেন, আলাপ হয়ে খুশি হলাম। তা ইয়ে—বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে কি যোগব্রতবাবু? মানে—কিছু মনে করবেন না। আমার একটু এক্সারসাইজ করার অভ্যাস আছে সকাল-সন্ধ্যা। তাই—

এতক্ষণে দেখলাম, ভদ্রলোকের শরীর ঘেমে সপসপ করছে। লুঙ্গিটা জড়িয়ে রেখেছেন কোনমতে। বললাম, না, না। এখন তাহলে আপনাকে ডিসটার্ব করব না। পরে একসময় এসে বলব'খন।

মনোরঞ্জনবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, একটু আভাস দিতেও পারেন।

না, না। আপনি ব্যায়াম সেরে নিন।

বলে আমি হনহন করে ওপরে চলে গেলুম। খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে আমার ঘরটার দিকে তাকালাম। অন্ধকার ছাদে ঘরটা ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। আজ গা ছমছম করছিল। ভাবলাম, কাল থেকে বরং বাইরে দেয়ালে একটা বাতি আটকাব। বেরিয়ে যাওয়ার সময় জ্বালিয়ে রেখে যাব। ইলেকট্রিক খরচ বাড়বে। বাড়ুক। সন্ধ্যায় অন্ধকার ছাদে চোর-ডাকাত এসে লুকিয়ে থাকতে পারে। এলাকার বদনামও আছে এ ব্যাপারে।

এতক্ষণে একটা ব্যাপার মনে পড়ল। একটু অস্বস্তি জেগে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। মনোরঞ্জনবাবু শরীর-চর্চা করেন। ছাদের দরজা তো ভাঙা। বাড়িওলা নতুন দরজা বানিয়ে দিতে চেয়েছেন অবশ্য। কিন্তু মনোরঞ্জনবাবু তো ছাদে এসে কাজটা করতে পারেন। কেন আসেন না? সচরাচর ব্যায়ামবিদরা তাই করে দেখেছি।

সাতদিন এসেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত বাড়ির লোকেদের কাউকেই ছাদে আসতে দেখিনি। কাপড় শুকোতে আসা উচিত অন্তত।

কেন আসে না কেউ ছাদে? যত ভাবলাম, আমার গা ছমছম ভাবটা বেড়ে গেল। তখন অন্ধকার ছাদে ভয়ে-ভয়ে তাকিয়ে ভূত খুঁজতে খুঁজতে ঝটপট দরজার তালা খুলে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিলাম। ভয়টা অনেক কেটে গেল।

বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে দুপুরবেলায় দেখা যুবতীটির কথা খুঁটিয়ে ভাবতে লাগলাম। ওর মধ্যে ভৌতিক কোন ভাবভঙ্গি দেখেছি বলে মনে পড়ল না। অবশ্য একটু পাগলাটে ভাব তো ছিলই।

আর একটা কথা। আমাকে রাস্তায় হেঁটে যেতেই বা কখন দেখল ও?

পরপর দুটো সিগারেট শেষ করেছি, ওপাশে ভারি গলায় কেউ আমার নাম ধরে ডাকতেই প্রায় আঁতকে উঠেছিলাম। সাড়া দিয়ে বললাম, কে ?

আমি মনোরঞ্জন।

বেরিয়ে গিয়ে বললাম, আসুন, আসুন। কী সৌভাগ্য।

ভূতপ্রেতসঙ্কুল ছাদের ঘরে একজন বলিষ্ঠদেহী ব্যায়ামবিদের উপস্থিতি এ মুহূর্তে আমাকে হাস্যকরভাবে সাহস যোগাচ্ছিল। মনোরঞ্জনবাবু বললেন, অন্ধকার যে! এক কাজ করবেন, বুঝলেন? একটা আলোর ব্যবস্থা রাখবেন। না—একটা নয়। দুটো। একটা আপনার দরজার মাথায়, আরেকটা ওই সিঁড়ির দরজার মাথায়। বাড়িওলা লোকটা বড্ড কঞ্জুস।

মনোরঞ্জন ঘরে ঢুকে প্রশংসার চোখে সব দেখে নিয়ে বললেন, বাঃ। ভোল বদলে দিয়েছেন দেখছি। যাকগে, আপনার কথা জিজ্ঞেস করি। কী করেন?

লোকটা কেমন যেন পুলিশ-পুলিশ। একটু হামবড়াই ভাব আছে। বললাম, তেমন কিছু করি না। একটু লিখি-টিখি। মানে ....

অমনি কথা কেড়ে মনোরঞ্জন বলে উঠলেন, কী কাণ্ড! যোগব্রত রায় নামটা তাই কত চেনা মনে হচ্ছিল। আপনিই তাহলে তিনি? ও মশাই, এই তো সেদিন 'রূপালী' পত্রিকায় 'প্রেম প্রেম খেলা' পড়ে চার্মড হয়ে গেলাম। কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য!

চায়ের আয়োজন আছে। হিটার জ্বেলে কেটলি চড়িয়ে বললাম, আপনি কী করেন?

দারোয়ানী বলতে পারেন। একটা ফার্মের সিকিউরিটি অফিসার।

ফ্যামিলি নিয়ে আছেন, না একা?

মনোরঞ্জন খিক্ খিক্ করে হাসলেন, আপনার মতই। একেবারে একা।

ফ্যামিলি পরে আনবেন বুঝি ?

না, না। ও বালাই নেই। বাবা বেঁচে আছেন। থাকেন দাদার কাছে দিল্লিতে। আমি মশাই কোম্পানির পয়সায় এতবড় ফ্ল্যাটে থাকি। তবে যা মনে হচ্ছে, বেশিদিন থাকা যাবে না।

কেন বলুন তো? বাড়িটা তো ভালই।

ভাল? মনোরঞ্জন গম্ভীর হয়ে গেলেন। কত ভাল, আপনিও টের পাবেন। থাকুন না!

হাসতে হাসতে বললাম, কেন? ভূত-প্রেত আছে নাকি ?

মনোরঞ্জন একটু হাসলেন। বললে কি বিশ্বাস করবেন? এ বাড়িতে অনেকেই একটা মেয়েকে দেখতে পায়। প্রথমবার আলাপের সময় বোঝাই যায় না, সে আসলে কে। পরে বোঝা যায়। আমি মশাই প্রথমে শুনে বিশ্বাস করিনি। তারপর দিনকতক পরে এক ছুটির দিন দুপুরে হঠাৎ দরজার ঘণ্টার বোতাম টিপল কেউ। খুলে দেখি, বছর বাইশ-তেইশের একটি মেয়ে। সিঁথিতে সিঁদুর আছে। হাতে শাঁখা-ফাঁখাও আছে। আমাকে অবাক করে না-বলা না-কওয়া ঘরে ঢুকতে আসছে দেখে সরে দাঁড়ালাম। ঢুকে এঘর ওঘর বাথরুম কিচেন, ব্যালকনি ঘোরাঘুরি শুরু করল। আমি হতবাক। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, কে আপনি? কী ব্যাপার? বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই...

বললাম, করব। বলুন।

মনোরঞ্জন চোখ বড় করে বললেন, প্রশ্ন শুনে কেমন ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে হাসল। হাসি দেখেই গা বাজছিল। তারপর বলল কী জানেন? বলল, আমি তো এই ফ্ল্যাটেই থাকতম। খুব মায়া পড়ে গেছে। তাই দেখতে আসি। যাই হোক, তখনও কিছু টের পাইনি। নাম জিজ্ঞেস করলাম। বলল, সুমতি। ওর স্বামীর কী একটা ট্রেডিং কনসার্ন আছে। এখন থাকে বেলেঘাটায়। তারপর সে ফের বাথরুমে ঢুকল। ঢুকল তো ঢুকল—আর বেরুচ্ছে না। একটা ঘণ্টা কেটে গেল। তখন ভাবলাম, ফিট হয়ে পড়ে রইল নাকি? বাথরুমের দরজায় টোকা দিতে গিয়ে টের পেলাম দরজা আটকানো নেই। ঠেলতেই খুলে গেল। তারপর .... ওঃ!

মনোরঞ্জন চোখ বুজে কাঁধ নাড়া দিলেন। বললাম, কী দেখলেন?

একটা ডেডবডি।

অ্যাঁ। বলেন কী!

সম্পূর্ণ উলঙ্গ ডেডবডি। সেই মেয়েটিই। গলাটা ফাঁক হয়ে আছে। তখনও রক্ত বেরোচ্ছে। সারা বাথরুমের মেঝে রক্তে লাল। .... মনোরঞ্জন ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফের বললেন। .... তো আমি মশাই, দেখতেই পাচ্ছেন—মোটামুটি সাহসী মানুষ। নার্ভও শক্ত। চোখ বুজে ফেলেছিলাম। খুলে দেখি, বাথরুমে কিচ্ছু নেই। মনে হল, যা দেখেছি, ভুল। হ্যালুসিনেশান ছাড়া কিছু নয়।

মনোরঞ্জন চুপ করে রইলেন। একটু পরে বললাম, তারপর?

হ্যাঁ, তারপর টলতে টলতে ফিরে এলাম বেডরুমে। এসে দেখি, আবার বুঝি হ্যালুসিনেশান! সুমতি আমার বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে আর মিটিমিটি হাসছে। অমনি আমি খাপ্পা হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, তবে রে হারামজাদী ভূতনী কাঁহেকা!

মনোরঞ্জন এবার হা-হা করে বিকট হেসে উঠলেন। বললাম, তারপর?

তারপর আর কী? ঘুষি বাগিয়ে এগিয়ে যেতেই বিছানা থেকে উঠে ছিটকে সরে গেল। তারপর শুরু হল আমার সঙ্গে চোর-পুলিশ খেলা। কিছুতেই ধরতে পারি নে। ভূতনীর নিকুচি করেছে! এঘর ওঘর করে শেষ অব্দি মেয়েটা সুড়ুৎ করে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তখন দরজা আটকে দিলাম।

মনোরঞ্জন চুপ করল। কেটলির জল শোঁ-শোঁ করছিল। বাইরে হেমন্তের রাত একটু শীতল হয়ে উঠেছে। রেললাইনে ইঞ্জিন তীব্র শিস দিচ্ছিল। মনোরঞ্জনের কথা বিশ্বাসযোগ্য কি না ভেবে পাচ্ছিলাম না। দুজনেই চুপ করে গেছি তো গেছি।

কিছুক্ষণ পরে চা খেতে খেতে বললাম, আর কোনোদিন কিছু দেখেননি?

মনোরঞ্জন চায়ের ঢোক গিলে মাথাটা দোলালেন। সেটা হ্যাঁ বা না বুঝলাম না। সিগারেট দিয়ে এবং নিজেও ধরিয়ে বললাম, আপনার সাহস আছে মশাই। বাথরুমে ঢুকতে ভয় করে না?

মনোরঞ্জন হাসলেন। একটা ব্যাপার কী জানেন? ভূত যদি অতটা স্পষ্ট হয়ে মানুষের গা ঘেঁষে আসে, কথাবার্তা বলে, তাহলে তার আর ভূতত্ব থাকে না। মানুষও তাকে আর অতটা ভয় পায় না। সয়ে যায়। আমারও তাই হয়েছে। বরং এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, কেন সে অমন স্পষ্ট হয়ে আর দেখা দিচ্ছে না?

তাহলে বাসা বদলানোর কথা ভাবছেন কেন?

মনোরঞ্জন আস্তে বললেন, জানেন, রাত্তিরটা বড্ড গণ্ডগোলে ভুগি। যতবার ঘুম ভাঙে, মনে হয় পাশে বউয়ের মতো কেউ শুয়ে আছে। বেশ টের পাচ্ছি, বুঝলেন? এমন কী সে আমার গা ঘেঁষে আসছে। কিন্তু সত্যি কেউ নেই। এ এক অদ্ভুত সমস্যা। আমি তো মশাই পুরুষমানুষ। ব্যাচেলার। আমি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠি তখন। একটা মেয়ে দিব্যি পাশেই শুয়ে আছে। অথচ হ্যালুসিনেশান আর কী! আচ্ছা, এবার উঠব। আপনি কি যেন বলবেন বলছিলেন?

আর কিছু না। এই ব্যাপারটাই।

কীভাবে জানলেন বলুন তো? হেরম্বদা কিছু বলেছে নাকি?

না। সুমতির সঙ্গে আজ দুপুরে আপনার ঘরের দরজায় ....

এ পর্যন্ত শুনেই মনোরঞ্জন হাসতে হাসতে বলে উঠলেন ..... বুঝেছি। তবে আমার ধারণা, সুমতি কোন ক্ষতি করবে না। মনের ভয়টা কাটিয়ে উঠতে পারলেই ও কোন প্রবলেমই নয়।

মনোরঞ্জন চলে গেলেন। এবার যেন নিজের সাহস প্রতিপন্ন করতেই গটগট করে হেঁটে ছাদ পেরোলেন। সিঁড়িতে ওঁর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে ঘরের দিকে ঘুরলাম।

ঘুরেই আঁতকে উঠলাম। আমার বিছানায় সুমতি পা ঝুলিয়ে বসে আছে। পরনে বেগুনী জমিনের ওপর সোনালী ফুলওলা বেনাবসী। গা ভরা গয়না। খোঁপায় ফুল জড়ানো। একেবারে নববধূ। আমি পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। গলার স্বর ফুটল না। তারপর মাথা ঘুরে উঠল।

জ্ঞান হলে দেখি দরজার চৌকাঠের কাছে শুয়ে আছি। প্রথম কয়েক সেকেন্ড ব্যাপারটা কিছু বুঝলাম না। তারপর উঠে বসলাম। বাঁ হাঁটুর কাছে ব্যথা করছিল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠে দাঁড়ালাম। ঘরে তেমনি আলো জ্বলছে। কিন্তু সুমতির ভূতটা আর নেই।

মানুষের এই এক অদ্ভুত স্বভাব। ভূতের ভয়ের চেয়ে এখন হাঁটুর ব্যথাটা বেশি জোরালো হয়ে ওঠার ফলে ভূতের ওপর ভীষণ খাপ্পা হয়ে গেছি। এ মুহূর্তে সুমতির ফের আবির্ভাব ঘটলে, আমি তাকে বেদম প্রহার দিতাম নিঃসন্দেহে। হুঁ, মনোরঞ্জনেরও ঠিক এমনি রাগ হয়েছিল এবং সুমতির ওপর হামলার চেষ্টায় ঘরময় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছিল।

আমি নিষ্ফল ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে মুঠো পাকিয়ে যাচ্ছেতাই গাল দিতে থাকলাম। কতবার যে হারামজাদী বললাম, তার সংখ্যা নেই। তারপর তার উদ্দেশে শেষবারের মত শাসালাম—ফের যদি কখনো ত্রিসীমানায় তোমায় দেখেছি তো ঠ্যাং ভেঙে দেব বাঁদর মেয়ে।

একলা ঘরের মধ্যে এমনি করে মুঠো তুলে শাসাচ্ছি দেখলে কেউ আমাকে নির্ঘাত পাগল ঠাউরাত। কিন্তু সেই মুহূর্তে কোথায় খিলখিল করে কে যেন হেসে উঠল। অমনি সংযত হলাম। সব সাহস উবে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মরিয়া হয়ে দরজা বন্ধ করে বিছানায় বসে পড়লাম।

রাতটা না খেয়েই কাটাতে হল। আর বাইরে যাবার সাহস ছিল না। তবে এ রাতে আর কিছু ঘটল না। একটা পেনকিলার বড়ি খাওয়ায় মড়ার মত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

সকালে সোজা হাজির হলাম বাড়িওলা মনসুর হোসেনের কাছে। ভদ্রলোক থাকেন

পার্কসার্কাস এলাকায়। আমার মূর্তি দেখে একটু বিচলিত হয়ে মনসুরসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, বিমার হয়েছে নাকি রাইটারবাবু? তশরিফ ফরমাইয়ে।

সটান প্রশ্ন করলুম, দোতলার চার নম্বর ফ্ল্যাটে এক ভদ্রমহিলা খুন হয়েছিলেন, তাই না মনসুরসাহেব? ব্যাপারটা কী, একটু খুলে বলুন তো!

মনসুবসাহেব আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর একটু হেসে বললেন, হাঁ। লেকিন সে তো এক বরষ আগের কথা আছে। পুলিশ পাত্তা করতে পারেনি। কেস খারিজ হয়ে গিয়েছিল। কেন এ বাত পুছছেন রাইটারবাবু?

ভদ্রমহিলার নাম সুমতি দেবী ছিল, তাই না?

হাঁ, হাঁ। ঔর উনহির খসমের নাম ছিল মাখনবাবু। .... বলে মনসুরসাহেব গলার স্বর চাপলেন। মাখনবাবুই জরুকে কোতল করেছিল, বুঝলেন রাইটারবাবু? পুলিশকে টাকা দিয়ে সামাল দিয়েছিল মামলা।

কেন খুন করেছিল, জানেন?

সন্দ হযেছিল, ভিন আদমিকা সাথ মুহব্বত করছে।

কে সেই ভিন আদমি?

হাম সিরফ্ কানসে শুনা—কৈ গৌতমবাবুকা সাথ মুহব্বত ছিল। যানা-আনা করত। এক রোজ মাখনবাবু উসকো পাকাড় লিয়া। ঝামেলা ভি হুয়া বহুৎ। ... তো হুয়া কেয়া রাইটারবাবু?

কুছ নেহি। সিরিফ জাননেকো ইরাদা থা। বলে উঠে দাঁড়ালাম।

মনসুরসাহেব হাসতে হাসতে বললেন, সমঝ লিয়া। আপ তো কিতাব লিখনেওয়ালা। কিতাব লিখবেন। বসুন, বসুন। জেরাসে চা-উ পিয়ে যান।

অগত্যা বসতে হল। বাড়িতে সুমতির ভূতের উপদ্রবের কথাও তুললাম। মনসুরসাহেব পাত্তাই দিলেন না। দেবেন না, সে তো জানা কথাই। ওঁর বক্তব্য, সারাক্ষণ রেলগাড়ি আর কলকারখানার ভোঁ-ভোঁ ছককড় মককড় আওয়াজে অতিষ্ঠ হয়েই ভাড়াটেরা চলে যায়। তবে হ্যাঁ, ভূতের ভয়েও পালায়। ভূত থাক আর নাই থাক। পাশেই গোরস্থান কিনা। হর্দম মুসলিমদের লাশ যাচ্ছে নিচের রাস্তায়। বাড়ি থেকে দেখা যায় সেই সব লাশ কবর দিচ্ছে। এইসব দৃশ্য দেখে ঘাবড়ে যায় ভাড়াটেরা।

এক ফাঁকে মাখনবাবু কোথায় থাকেন, জানতে চাইলাম। মনসুরসাহেব বললেন, শুনেছিলাম কাছাকাছি কোথায় যেন থাকেন। ঠিক বলতে পারব না। বরং আপনি দরোয়ানকে পুছবেন। সে জানতেও পারে। কারণ, বাড়ি ছাড়ার পর মাখনবাবুর নামে যত চিঠি-উঠি আসত, সে নাকি মাখনবাবুকে পৌঁছে দিয়ে আসত।

দারোয়ানের কথামত খোঁজ-খবর নিয়ে মাখনবাবুর পাত্তা পাইনি। সেখান থেকেও চলে গেছেন কোথায়। ভদ্রলোকের নাকি রফতানির কারবার আছে ডালহৌসি পাড়ায়। কিন্তু সে তো খড়ের গাদায় সুঁচ খোঁজার ব্যাপার। হাল ছেড়ে দিলাম।

পরের দুটো দিন সুমতির উপদ্রব আর ঘটল না। অথচ আমি মনে মনে তার আবির্ভাব কামনা করছিলাম। তার হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটা তার মুখেই শুনতে চাইতাম তাহলে। এ দুদিনে

মনোরঞ্জন আমার ঘরে এসে গল্প করেছেন। সুমতির প্রসঙ্গও উঠেছে। কিন্তু তিনি সুমতির স্বামী বা প্রণয়ী—কাকেও চেনেন না। কস্মিনকালেও না।

মনোরঞ্জনের বিছানায় সুমতির ভূতের শুয়ে থাকার ব্যাপারটাও উঠেছিল। হ্যাঁ, মনোরঞ্জন হাসতে হাসতে বলেছেন, সুমতির ভূতটা আমার পাশে রোজ রাতেই শুতে আসে। ক্রমশ সয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। আর অতটা উত্তেজিত হই না।

ভদ্রলোক শরীর নিয়েই বেঁচে আছেন। তাই উত্তেজনা ছাড়া আর কিছু ভাবেন না। বিরক্তি লাগে আমার। মনে হয়, শরীর চর্চাকারী ব্যায়ামবিদ লোকটি যেন আমাকে বোঝাতে চাইছেন, স্বাস্থ্যবান তাগড়াই লোকরাই মেয়েদের একান্ত কাম্য। সুমতি মরে গিয়েও তাই তাঁর প্রতি আসক্ত হয়েছে। ওঁর পাশে তাই রোজ রাতে শুয়ে থাকে সুমতি। কী ভাবেন নিজেকে মনোরঞ্জন? আহাম্মক গাড়োল আর বলে কাকে?

রাতে শুয়ে মনে মনে বলছি, সুমতি। লক্ষ্মী বোনটি। গালমন্দ করব না। ভয় পাব না। তুমি একবারটি এস। তোমার লাইফ-হিস্ট্রি শোনাবে বলেছিলে না?

রেল ইয়ার্ডে শিস দিয়ে চলে গেছে রাতের ট্রেন। কতক্ষণ তার শব্দ। তারপর হয়তো গোরস্থানের দিক থেকে একটা হাওয়া উঠেছে। হওয়াটা এই বাড়ির ওপর দিয়ে শনশন করে চলে গেছে দূরে। হেমন্তরাতের নক্ষত্রপুঞ্জে কি এখন সুমতির আত্মা দীর্ঘ সূক্ষ্ম বর্ণময় রশ্মিরেখার মত আনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক মহাকাশ থেকে আরেক মহাকাশে? সে কি আমার কাছে অপমানিতা হয়েই মানুষের প্রতি গভীর দুঃখ ও ঘৃণায় অমর্ত্যগামিনী হয়ে গেল? আর কি আসবে না পৃথিবীতে, তার ফেলে যাওয়া চার নম্বর ফ্ল্যাটের সংসার-স্মৃতিতে ফিরে?

নিজের প্রতি রাগে ক্ষোভে ছটফট করেছি দুটো রাত। সুমতি নববধূর বেশে আমাকে তার জীবনকাহিনী শোনাতে এসেছিল। আমি মূর্খের মত আচরণ করেছি। তাকে দেখে আমার ভয় পাওয়া উচিত হয়নি। মৃতেরা যখন জীবিতের রূপ নিয়ে আসে, তখন বোঝাই যায়, তারা ভয় দেখাতে আসে না। ভয় দেখাবার ইচ্ছা থাকলে তারা বিকৃত চেহারায় আসতে পারে। সুমতি এসেছিল মানুষের অস্তিত্ব ও চেহারা নিয়ে, যে চেহারা এবং অস্তিত্বে একদা সে বেঁচেছিল তার ছোট্ট সংসারে। কী ভুল না করেছি এই সরল সত্য না বুঝে!

সুমতি এল না। নিশ্চয় অভিমান হয়েছে মেয়ের। বারবার তার উদ্দেশে বললাম, ক্ষমা করো লক্ষ্মী মেয়ে। আর কক্ষণো তোমাকে অপমান করব না। ভয় পাব না। তুমি এসো, তুমি এসো।

এলেন মনোরঞ্জন। পরের রাতে। বারবার দরজায় ধাক্কা দিতেই চমকে উঠেছিলাম, সুমতি নাকি? পরক্ষণে মনে হল, ও তো আত্মা-অশরীরী। সর্বগামিনী। কপাট বা দেয়াল কোন জড়বস্তু ওর কাছে বাধা নয়। জড়বস্তু ওর কাছে বাতাসের মতো লঘু এবং ভেদ্য।

মনোরঞ্জন হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলেন। হাঁফাচ্ছিলেন তিনি। ব্যস্ত হয়ে বললাম, কী হয়েছে! কী হয়েছে মনোরঞ্জনবাবু?

মনোরঞ্জনের চেহারা উদ্‌ভ্রান্তের মত। চোখ দুটো লাল। ইশারায় জল খেতে চাইলেন। জল খাওয়ার পর বললেন, সুমতি .... সুমতি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। ঘুম ভেঙেই টের পেলাম, জানেন? সে আমাকে প্রচণ্ড জোরে জড়িয়ে ধরে আছে। তারপর ....

তিনি হাঁ করে নিশ্বাস নিলেন।

বললাম, তারপর?

তারপর টের পেলাম, ওর শরীর অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। আমার অসহ্য লাগছিল। আজ টুকু উত্তেজনা জাগতে পারছিল না। তারপর .....

তারপর মনে হল ও আমার গলা টিপে ধরেছে। দম আটকে যাচ্ছিল। ধ্বস্তাধ্বস্তি করে াতে চেষ্টা করলাম নিজেকে। তারপর ....

হঠাৎ থেমে তিনি দরজার দিকে তাকিয়ে গর্জন করে উঠলেন জন্তুর মত। তবে রে ামজাদী। আজ তোমার একদিন না আমার একদিন।

আমি কিছু দেখতে পেলাম না। মনোরঞ্জন জন্তুর মত গজরাতে গজরাতে একলাফে জার কাছে চলে গেলেন। তারপর ছাদে ওঁর দাপাদাপি শুনলাম। তখন বেরিয়ে গিয়ে কলাম, মনোরঞ্জনবাবু। মনোরঞ্জনবাবু। আহা, কি করছেন! চলে আসুন।

মনোরঞ্জন সিঁড়িতে নেমে গেছেন। জান্তব গর্জন শুনতে পাচ্ছিলাম। ওঁর গলায়। কোন ুষ এমন বিদঘুটে আওয়াজ করে ভাবা যায় না। সিঁড়িতে গিয়ে ফের ওঁকে ডাকলাম। কানে লন না।

ব্যাপারটা দেখার জন্যে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকলাম।

মনোরঞ্জন নিচের তলায় গর্জাচ্ছেন তখনও। তারপর তিনি রাস্তায় চলে গেলেন। পেছনে ছনে দৌড়ে গিয়ে ডাকাডাকি করছিলাম, মনোরঞ্জনবাবু, মনোরঞ্জনবাবু।

এই রাস্তার আলো এপাড়ায় আসা অবধি দেখিনি। রাস্তাটা অন্ধকারে এগিয়ে গেছে রেল জের তলা দিয়ে। একটা সিঁড়ি নেমে দেখি, মনোরঞ্জন রেলব্রিজের ওপরে উঠে পড়েছেন শের সিঁড়ি বেয়ে। ওপরে রেল ইয়ার্ডের আলোর ছটা পড়েছে। মনোরঞ্জনের পরনে শুধু ডারওয়্যার। এতক্ষণে সেটা আমার চোখে পড়ল। ফের চেঁচিয়ে উঠলাম, মনোরঞ্জনবাবু।

তারপর হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখলাম সুমতিকে। কিন্তু এখন তাঁর মূর্তিটি ছায়াময়ী। সিল্যুট ওই মূর্তি টু তফাতে চলেছে। মনোরঞ্জনবাবুকেও ছায়ামানুষ দেখাচ্ছে। তিনি দুহাত তুলে রেল নে টলতে টলতে চলেছেন। ঘড়ঘড় করে একটা আওয়াজ হচ্ছে ওঁর গলার ভেতর।

আমি রেলব্রিজে উঠে গেলাম। ওপাশে নিচে গোরস্থান। গাছপালায় ঢাকা গোরস্থান ছমছম ছে। ভেতরে ঘুরঘুট্টে অন্ধকার, ওপরে আবছা আলোর ছটা। এই সময় একটা বাতাস উঠল ন করে। বাতাসটা বেড়ে গেল। গোরস্থানের গাছপালায় আলোড়ন শুরু হল। তারপর মকা সারা এলাকার আলো নিভে গেল। নিশ্চয় লোডশেডিং।

অন্ধকারে রেল লাইনের পাশে হাঁটতে হাঁটতে চেঁচিয়ে ফের ডাকলাম, মনোরঞ্জনবা-বু-উ-উ।

কোন সাড়া পেলাম না। আকাশে নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। একফোঁটা মেঘ থাকার কথা নয়। চ বাতাসটা বেড়ে গিয়ে ঝড় হয়ে উঠেছে ক্রমশ। চারদিকে সেই শনশন তুমুল আওয়াজ। দ্রর মত। মধ্যরাতের এই অলৌকিক ঝড়ের মধ্যে থমকে দাঁড়াতেই হল। নয়ত নিচে য়ে পড়তাম।

দূরে রেলের ইঞ্জিনের আলো দেখা দিল এই সময়। তারপর দেখলাম, মনোরঞ্জন লাইনের মধ্যিখানে তক্তায় পা ফেলে ফেলে তখনও টলতে টলতে এগোচ্ছেন। কিন্তু সুমতি আর দেখতে পাচ্ছি না।

অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, আলোটা উজ্জ্বল হচ্ছে। তীক্ষ্ণ হুইসল দিয়ে এগিয়ে আসা মধ্যরাতের ডাউন ট্রেন। এদিকে প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস বইছে সমানে।

এক মিনিট পরে জোরালো আলোর ঝাঁটায় মনোরঞ্জনকে আটকে যেতে দেখলাম। তার মাটি কাঁপিয়ে ট্রেনটা আমার পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকল।

ট্রেন চলে গেলে আমি কাঁপতে কাঁপতে সেখানেই বসে পড়লাম। জানি, মনোরঞ্জনের ঘটেছে।

কতক্ষণ আচ্ছন্ন অবস্থায় বসে থাকার পর একসময় মনে হল, ঝড়টা থেমেছে। তখন ও চেষ্টা করলাম। সেই সময় কেউ খুব কাছ থেকে আস্তে বলে উঠল, দাদা।

কে ? দ্রুত সাড়া দিলাম। অন্ধকারে কেউ দাঁড়িয়ে আছে রেল লাইনের মধ্যিখানে।

সুমতি বলল, আমি সুমতি। দাদা বলে ডাকলাম কিন্তু।

হ্যাঁ বোন। শুনেছি।

আমার ওপর রাগ করে আছেন। তাই না, দাদা?

না, বোন। তা কি পারি? এসো, বসো এখানে।

আর ভয় করছে না তো?

না। তুমি বসো, সুমতি। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

সুমতি ছায়াময়ী হয়ে দাঁড়িয়েই রইল। বলল, কথা আমারও আছে। আমাকে নি আপনাকে উপন্যাস লিখতে হবে, দাদা।

বেশ তো। লিখব।.... কিন্তু মনোরঞ্জনের ব্যাপারটা কী সুমতি ?

সুমতি হাসল। .... স্বচক্ষেই তো দেখলেন, ওকে কী শাস্তি দিলাম।

কেন, সুমতি ?

এখনও বুঝতে পারছেন না?

হুঁ, পেরেছি। ... বলেই চমকে উঠলাম। সুমতি। তোমাকে কি মনোরঞ্জনই খুন

হ্যাঁ। ওর আসল নাম গৌতম। ও ছিল আমার স্বামীর বন্ধু। একদিন দুপুরে ও এল। দরজা খুলে দিলাম। আমি কিছু ভাবিনি। আমাকে একা পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ও তারপর .....

সুমতি ! কাঁদে না। বুঝতে পারছি, কী ঘটেছিল। তোমার নারীত্বের অপমান করেও হয়নি শয়তানটা। পাছে তুমি স্বামীর কাছে সব বলে দাও তাই ও তোমাকে খুন করেছি তারপরও ও তোমাকে ভুলতে পারেনি। পরে সেই ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। তোমাকে কা করার হাত থেকে রেহাই পায়নি। রোজ রাতে .....

হঠাৎ একঝলক টর্চের আলো পড়ল আমার ওপর। কেউ চিৎকার করে বলল, হুকুমদার।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো দুহাত তুলে চেঁচিয়ে বললাম, দোস্ত।

রেল ইয়ার্ডে অন্ধকারে বসে আছি, মুহূর্তেই এই চেতনা না জেগে উঠলে হতচ্ছাড়া বাহিনী আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ত।

আড়চোখে দেখলাম, সুমতির ছায়ামূর্তি দূরে সরে যাচ্ছে।

বন্দুকধারীরা এসে তামাসা করে বলল, প্যার করতা থা বাবুলোক। ইয়ে প্যারকা জায়গা। জী। যাও, চলা যাও হেঁয়াসে। জলদি ভাগ যাও। নেহি তো পাকড়া জায়েগা।

তারপর তারা আলো ফেলে সুমতিকে খুঁজতে থাকল। না পেয়ে হতাশ ভঙ্গিতে একজন ন, ভাগ গেয়ী শরমসে। তারপর হা হা হো হো করে হাসতে থাকল। আমি আস্তে আস্তে এলাম। রেল ব্রিজের কাছে এসে লোহার সিঁড়ি বেয়ে যখন নামছি, তখন আলো জ্বলল। ডশেডিং ফুরোল।

গৌতম ওরফে মনোরঞ্জনের লাশটা সকালে বরং দেখে আসব।

থেরপুরার বনবাংলো

রাতদুপুরে হঠাৎ ঝমঝম শব্দে ঘুমের রেশ ছিঁড়ে গেল। পাশের ঘরে কেউ কিছু ভাঙা
করছে। শব্দটা কাচের জিনিস ভাঙার মত।

প্রথমে ভাবলাম কেউ বা কারা মাতলামি করছে। বাংলোয় এমনটা ঘটতেই পারে। কি
তারপর মনে পড়ে গেল পাশের ঘর থেকেই শব্দটা আসছে এবং সেটা বাতিল আসবাবপত্রে
ঘর। চৌকিদার বলেছিল, শিগগির ওগুলো নিলামে বেচে ঘরটা খালি করা হবে।

টিলার গায়ে এই একতলা বাড়িটা আগে ছিল কোনও এক প্রাক্তন রাজা-জমিদারে
রেস্টহাউস। তাঁর বংশধর সরকারকে বেচে দিয়েছিলেন। বনদফতর একে বাংলো করেছে
মেরামতের চিহ্ন এখনও গা থেকে মুছে যায়নি। দরজা-জানালায় বার্নিশের গন্ধ এখনও না
আসে।

নতুন জায়গায় গেলে আমার ঘুম আসতে চায় না। টেবিলবাতি নিভিয়ে ঘুমোই-ঘুমো
চেষ্টার পর পর একটুখানি ঘুমের টান এসেছে, এমন সময় এই বিরক্তিকর তীব্র শব্দ। কা
ভাঙার শব্দ। শব্দটা থামছে না।

চোর-ডাকাত ভেবে এবার বুক কেঁপে উঠল। তারপরই একটা জান্তব গরগর গর্জন এ
তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভেসে এল। আতঙ্কে গলা শুকিয়ে গেল। এই নিরিবিলি বাংলো থেকে এ
রাতে সাহায্যের জন্য চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করলেও শোনার মত কাছাকাছি মানুষজন নে
আদিবাসীদের একটা বস্তি আছে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। জঙ্গল থেকে মানুষখেকো ব
হানা দিলে তারাই বা কী করবে?

কী করব ভাবছি, সেই সময় আমাকে ভীষণ অবাক করে কাকে কেউ ধমক দিল, 'যা
ভাগ ভাগ!'

তারপর আমার ঘরের সামনে বারান্দায় চৌকিদারের সাড়া পেলাম। 'বাবুজি কি ঘুমি
পড়েছেন?' কাঁপা-কাঁপা হাতে টেবিলবাতির সুইচ অন করে সাড়া দিলাম। 'ঘুমোইনি।
ব্যাপার গুণধর?'

চৌকিদার গুণধর বলল, 'কিছু না। ঘুমোন বাবুজি।'

'গুণধর! পাশের ঘরে ও কিসের শব্দ?'

'ও কিছু না। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোন।' বলে গুণধর আবার কাকে ধমক দিল, 'বে
বদমাইসি করলে ঝাব্বুকে ডেকে নিয়ে আসব বলে দিচ্ছি। ভাগ বলছি!'

'কার সঙ্গে কথা বলছ গুণধর।'

'আপনি শুয়ে পড়ুন বাবুজি।' বলে চৌকিদার বারান্দায় চপ্পলের শব্দ করতে করতে চ
গেল।

তাহলে মানুষখেকো বাঘ নয়। কোনও পাগল-টাগল হবে। এই ভেবে বাতি নিভিয়ে পাশ ফিরে শুলাম। মার্চের রাতে এখনও কনকনে শীত। জানলাগুলো বন্ধ রাখতে হয়েছে। আবছা কানে আসছে গাছপালার শনশন শব্দ। শব্দটা অস্বস্তিকর।

ভোর ছ'টায় বেড-টি দিতে বলেছিলাম গুণধরকে। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কম্বল মশারি থেকে বেরুতে হল। দরজা খুলে দেখি বাইরে গাঢ় কুয়াশা। গুণধর কম্বল মুড়ি দিয়েছে। সে ঘরে ঢুকে টেবিলে চায়ের ট্রে রেখে চলে যাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, 'রাতে কোনও পাগল এসে পাশের ঘরে ভাঙচুর করছিল নাকি? ওঘরে তো তালা দেওয়া থাকে দেখেছি।'

'ও কিছু না।' বলে গুণধর গম্ভীর মুখে পর্দা তুলে বেরিয়ে গেল।

লোকটা তো ভারি অদ্ভুত! কিছুক্ষণ পরে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম! যাবার সময় পাশের ঘরের দরজায় তেমনই তালা আটকানো দেখলাম। বারান্দা কিংবা লনে কোথাও ভাঙা কাচের টুকরো পড়ে নেই। নুড়ি-বিছানা পথ এবং লনের ঘাসে শুকনো পাতা ছড়িয়ে আছে। গুণধরের বউকে দেখলাম ঝাঁটা হাতে বেরুচ্ছে তাদের ঘর থেকে।

টিলার নীচে সংকীর্ণ পিচ-রাস্তায় কিছুদূর চলার পর সামনে কুয়াশায় একটা ছায়ামূর্তি চোখে পড়ল। নদীর ব্রিজের কাছে লোকটা কুয়াশার সঙ্গে মুছে গেল হঠাৎ। তবে এটা এমন কিছু অদ্ভুত ঘটনা নয় যে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। ব্রিজে দাঁড়িয়ে নীচের উপত্যকায় সূর্য ওঠা দেখছিলাম। সেই সময় লাঠি ঠুকঠুক করে একজন আদিবাসী বুড়োমানুষ এসে সেলাম দিল। তাকে একটা সিগারেট দিলাম না চাইতে। রাতের বাংলোর রহস্য এবং 'ঝাব্বু' সম্পর্কে যদি কোনও খবর তার কাছে মেলে!

সিগারেটে টান দিয়ে বুড়ো একচোট কাশল। তারপর ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে জানতে চাইল আমি তল্লাটে কেন এসেছি, কাঠের ব্যবসা নাকি শিকারের উদ্দেশ্যে এবং কোথায় উঠেছি। আমি যখন বললাম, নিছক বেড়াতে এসেছি এবং ওই বনবাংলোয় উঠেছি, তখন সে খুব গম্ভীর হয়ে পরামর্শ দিল, যত শিগগির পারি, আমি যেন ওই বাংলো ছেড়ে অন্য কোথাও উঠি। ওই বাংলোয় কেউ এক রাতের বেশি থেকেছে বলে তার জানা নেই। হ্যাঁ গুণধর আর তার বউ আছে। তবে ওদের কোনও বিপদ হবে না। কারণ ঝাব্বু ওদের ছেলে। ঝাব্বু ওদের কোনো ক্ষতি হতে দেবে না।

ঝাব্বু কোথায় থাকে?

বুড়ো কাশতে কাশতে বলল, কাছাকাছি থাকে সে।

কী করে সে?

কী করবে আর? বেঁচে থাকতে যা করত তা-ই। গাছে-গাছে হাওয়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

বুড়োর কথায় অবাক হয়ে বললাম ঝাব্বু বেঁচে নেই অথচ কাছাকাছি থাকে এর মানে কী?

বুড়ো হাসবার চেষ্টা করে বলল, থাকবে না তো কোথায় যাবে? যে গাছের ডগায় সে খির বাচ্চা পাড়তে উঠে ডাল ভেঙে পড়ে মারা যায়, সেই গাছটা তো বাংলোর নীচেই। বাবুজি কি দেখেননি সেই বিশাল আমলকী গাছটা? তবে ঝাব্বু আছড়ে পড়ার পর একটা কালো কুকুর এসে তার রক্ত চাটছিল। কুকুরটা প্রায়ই দেখা যায় এখনও।

রাত্রে হলে এ ধরনের কথাবার্তা গা ছমছম করা একটা অদ্ভুত গল্পের স্বাদ দিত। কিন্তু দিনের বেলায় কথাগুলো আমাকে হাসিয়ে ছাড়ল। কিন্তু বুড়ো বলল, সে মোটেও তামাশা করছে না। তাদের বস্তিতে সবাই জানে এসব কথা। এলাকার কাঠের ব্যবসায়ীরা জানেন। সরকারি লোকেরাও জানেন। ওটা ছিল পাগলাবাবুর কোঠি।

কে পাগলাবাবু?

এলাকার এক নামী লোক ছিল সে। কেন সে হঠাৎ পাগল হয়েছিল এবং কেমন করেই বা মারা পড়েছিল, কেউ জানে না। তবে বুড়োর নিজের ধারণা, সম্পত্তির লোভে তাকে ওষুধ খাইয়ে তার ভাইপোই পাগল করেছিল। ভাইপো তো আর এ তল্লাটে ভয়ে পা বাড়াতেই পারে না। তাই কোঠি বেচে দিল সরকারকে। ....

* * * * *

বনজঙ্গল এলাকায় যারা বসবাস করে, তাদের মধ্যে অনেক আজগুবি কুসংস্কার থাকতেই পারে। কিন্তু থেরপুরায় এসে একটি রাতের ঘটনা আমার যুক্তিবাদী মনকে বিব্রত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আদিবাসী বুড়ো লোকটি যা-ই বলুক, পাশের ঘরে কাঁচ ভাঙার ক্রমাগত শব্দ আর একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ আমি তো নিজের কানেই শুনেছি।

পরে মনে হল, রাত্রে সাহস করে বেরিয়ে আমারই দেখা উচিত ছিল সত্যি কী সব ঘটছে। গুণধরকে অনেক প্রশ্ন করেও কোনও সদুত্তর পেলাম না। 'ও কিছু না' বলে সে আমার প্রশ্নগুলো এড়িয়ে গেল। সমস্যা হল, লোকটা যত ভদ্র আর বিনয়ী হোক, সে খুব কম কথা বলে। সব সময় কেমন গম্ভীর হাবভাব আর কাজ খুঁজে বেড়ানোর ভঙ্গি।

আদিবাসী বুড়োর কাছে যে ভুতুড়ে গল্প শুনেছি, গুণধর তাতে কান দিল না। শুধু বলল, 'মানকু হাড়াম নিজেই একটা ভূত।'

গুণধরের ওপর মনে মনে খুব খাপ্পা হয়েছিলাম। কিন্তু আমি তো পুলিশ নই যে ওর পেটে রুলের গুঁতো মেরে কথা আদায় করতে পারব। ওর বউকে যে কোনও প্রশ্ন করব, তার সুযোগও পাচ্ছিলাম না। সেই ভোরবেলা ওকে লনে শুকনো পাতা ঝাঁট দিতে দেখেছিলাম তারপর থেকে সে নিজের ঘরের আনাচে-কানাচে ঘুরছে। একবারও এদিকে কাছাকাছি আসছে না। মেয়েটি গুণধরের মতই চুপচাপ আর গম্ভীর। তা ছাড়া দেখতে মোটামুটি সুন্দরী এবং যুবতী সে। বাংলোর চৌকিদারের এমন বউয়ের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা ঠিক কাজ হবে না।

সেই আদিবাসী বড়ো মানকু হাড়াম বলেছিল, আমলকী গাছ থেকে পড়ে গুণধরের ছেলে ঝাব্বু মারা যায়। গুণধর এটা অবশ্য স্বীকার করেছে। এই পর্যন্তই।

দুপুরের খাওয়ার পর বিছানায় গড়াচ্ছিলাম। সিগারেট টানতে টানতে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চাইছিলাম, এখানে থাকব, না চলে যাব? বেড়াতে এসে ভূতের উপদ্রবে জড়িয়ে পড়ার মানে হয় না। ক্রমশ একটা অস্বস্তি আমাকে পেয়ে বসছে। এই বসন্তে বনভূমির সৌন্দর্যের দিকে মন টানছে না। বারবার রাতের সেই বিভীষিকার স্মৃতি এসে মনকে অস্থির করে দিচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত জেদ চেপে গেল বরাতে যা ঘটে ঘটুক, এখানে থাকব। যদি সত্যিই ভূতপ্রেত বলে কিছু থাকে ত জানতে পারাও তো একটা অমূল্য অভিজ্ঞতা।

বাইরে জিপের শব্দ শুনে উঠে গেলাম। জানালার পর্দা ফাঁক করে দেখলাম, বনদফতরের সেই জিপটা এসে সদ্য থামল। একই ড্রাইভার আমাকে এই বাংলোয় পৌঁছে দিয়েছিল রেলস্টেশন থেকে।

জিপ থেকে এক যুবক আর এক যুবতী নামল। দুজনেরই ঝকঝকে স্মার্ট চেহারা। দেখামাত্র মনে হল হনিমুনে আসা সদ্যবিবাহিত এক দম্পতি। গুণধর দৌড়ে এসে সেলাম দিল। ড্রাইভার তাকে কিছু বলল। তখন গুণধর তাদের লগেজ বয়ে নিয়ে বারান্দায় উঠল। জিপের ড্রাইভার যথারীতি বখশিস নিয়ে চলে গেল।

দরজা খুলে বারান্দায় আমার ঘরের সামনে বেতের চেয়ারে বসে পড়লাম। যুবক-যুবতী আমাকে একবার দেখে নিয়ে অন্যদিকের একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল। তাদের দৃষ্টিতে একটু বিস্ময় কিংবা বিরক্তি ছিল—অথবা আমারই দেখার ভুল।

হনিমুনে নিরিবিলি কোনও বাংলোয় আশা অবশ্য স্বাভাবিক। বিশেষ করে এই থেরপুরের বনবাংলো ততকিছু নামী পর্যটন কেন্দ্র নয়। পর্যটন দফতরের তালিকায় এর নামও নেই। তাই হয়তো তারা এখানে কারুর উপস্থিতি আশা করেনি।

কিন্তু প্রশ্ন হল, আজ রাতেও যদি কোনও এক 'পাগলাবাবু'-র ভূত এসে হানা দেয়, ওরা কী করবে? মনে মনে হাসলাম। ভূতের বাংলো থেকে তারা যে সক্কালবেলায় কেটে পড়তে দেরি করবে না এটা নিশ্চিতভাবে বলা চলে।

কিছুক্ষণ পরে দেখলাম, গুণধর সাইকেল নিয়ে বেরুচ্ছে। বারান্দার নীচে এসে সে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল, 'স্টেশন বাজারে যাচ্ছি বাবুজি! সিগারেট আনতে হলে টাকা।'

বললাম, 'সিগারেট আছে। তো তোমার নতুন গেস্ট এল দেখছি।'

'আজ্ঞে। ওঁদের জন্যই বাজার যেতে হচ্ছে।'

'কলকাতা থেকে এল নাকি?'

'হ্যাঁ বাবুজি! ড্রাইভারজি বলল, রেঞ্জার সাহেবের সঙ্গে চেনাজানা আছে তো—'

কথা শেষ না করেই গুণধর সাইকেল চেপে চলে গেল। টিলার নীচে কোথাও একটা পাখি ডেকে উঠল। একটা আনমনা হাওয়া এল শনশনিয়ে। গাছপালা থেকে শুকনো পাতা ঝরে পড়ল। তারপর আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তরুণ দম্পতির ঘরের দরজা বন্ধ। হঠাৎ নিজেকে ভীষণ একলা মনে হল।

উঠে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। সবে তিনটে বাজে। ঘণ্টাটাক পরে বেড়াতে বেরুব।....

* * * * *

রাতে ভাল ঘুম হয়নি। দিনেরবেলা ঘুমটা তাই আমাকে বাগে পেয়েছিল। গুণধর এসে জাগিয়ে দিল। তার হাতে চায়ের কাপ। বাইরে প্রাকসন্ধ্যার ধূসরতা। গুণধর চুপচাপ চা রেখে চলে গেল। বারান্দায় গিয়ে চা খেতে খেতে তরুণ দম্পতির ঘরের দিকে তাকালাম। হনিমুনে এখন ওদের ঘরবন্দি থাকার কথা নয়। এতক্ষণ নিশ্চয় উপত্যকার নির্জন নদীর ধারে গিয়ে বসে প্রেম করছে।

স্বীকার করছি, আমার এই কৌতূহলটা ছিল অশালীন। তা না হলে বিরক্তিকর আর ম্যাজ ম্যাজ করা এই শরীরটা প্রায় টানতে টানতে বেরিয়ে পড়তাম না। আসন্ন সন্ধ্যার মুখে বনজঙ্গলের রাস্তায় একলা হাঁটার কোনও মানে হয় না। ফিরে আসতে অন্ধকার হবে ভেবে টর্চটা হাতে নিয়েছিলাম।

নদীর ব্রিজে পৌঁছুনোর আগেই লক্ষ্য করলাম ওরা হন্তদন্ত হয়ে ফিরে আসছে। থমকে দাঁড়িয়ে প্রকৃতিদর্শনের ভান করলাম। আমাকে দেখে ওরাও দাঁড়িয়ে গেল। দুজনের মুখে কেমন অস্বাভাবিক ভাব। কোনও জন্তুজানোয়ার দেখে কি ভয় পেয়ে পালিয়ে আসছে?

যুবকটি ইংরিজেতে প্রশ্ন করল, 'আপনাকে ফরেস্ট বাংলোয় দেখেছি মনে হচ্ছে?'

মৃদু হেসে বাংলায় জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ। আমি ওই বাংলোতেই উঠেছি। আমিও আমাদের দেখেছি।'

'আপনি কি কলকাতা থেকে এসেছেন?' এবার সে বাঙালি হয়ে গেল।

'হ্যাঁ। আপনারা?'

'কলকাতা থেকে।'

এরপর যা হয়। সে নিজের পরিচয় দিল। সুনন্দ রায়। একটা নামী ফার্মের একজিকিউটিভ। তার স্ত্রীর নাম অনামিকা। একই ফার্মের ডেটা রিসার্চ সেকশনে কাজ করে। থেরপুরা ফরেস্টের রেঞ্জার অনামিকার দাদার বন্ধু। সেই সূত্রে তারা এখানে বেড়াতে এসেছে। আমি যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই-ই। বিয়ের পর এটা তাদের মধুচন্দ্রিমা যাপনে আসা। আমি তখন রসিকতা করে বললাম, মধুচন্দ্রিমার পক্ষে এটা অসময়, কারণ এখন কৃষ্ণপক্ষ চলেছে, তখন সুনন্দ ছুটি পাওয়ার অসুবিধার কথা জানাল। রসিকতা তাকে ছুঁল না। আমার পরিচয় নিল, কবে এসেছি, তা-ও জেনে নিল। আমি সাংবাদিক জেনে খুশিও হল। কথা বলতে বলতে লক্ষ করছিলাম অনামিকার সেই স্মার্টনেস আর নেই। তাকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। কাজেই আমাকে প্রশ্ন করতে হল, তারা কিছু দেখে ভয় পেয়েছে কি না।

সুনন্দ পা বাড়িয়ে বলল, 'ব্রিজের ওখানে একটা লোক—'

তার কথার ওপর বললাম, 'কোনও আদিবাসী বুড়ো?'

'হ্যাঁ। লোকটা বাংলো সম্পর্কে একটা অদ্ভুত গল্প বলল। তাছাড়া বাংলোয় নাকি এক রাত্রির বেশি কেউ থাকতে পারে না।' সুনন্দ একটু নার্ভাস হাসল। 'ভূতপ্রেতে আমার বিশ্বাস নেই। তাছাড়া আপনি তো আছেন বাংলোয়। রাত কাটিয়েছেন। আপনি কি ভুতুড়ে কিছু দেখেছেন?'

আমি কিছু বলার আগেই অনামিকা বলল, 'তুমি ওঁকে কুকুরটার কথা বল।'

সুনন্দ বলল, 'হ্যাঁ। ভারি অদ্ভুত ব্যাপার, জানেন? বুড়ো লোকটা আমাদের সাবধান করে দিয়ে চলে যাওয়ার একটু পরে হঠাৎ দেখি, নদীর ধারে দুটো পাথরের মাঝখানে একটা কালো কুকুরের মুখ। অ্যালসেসিয়ান বলেই মনে হল। পাথরগুলো ঝোপঝাড়ে ঢাকা। ওখানে অ্যালসেসিয়ানটা কী করছে? কার অ্যালসেসিয়ান?'

অনামিকা বলল, 'কুকুরের জিভ অত লাল কেন? আমাদের বাড়িতে অ্যালসেসিয়ান আছে।'

সুনন্দ বলল, 'হ্যাঁ। রক্ত খেলে যেমন দেখায়, ঠিক তেমনি। আমি ঢিল ছুঁড়তেই কুকুরটা নিপাত্তা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে আমরা ফিরে আসছি, হঠাৎ রাস্তার ডানদিকে ঝোপের ভেতর থেকে আবার সেই কালো কুকুরটা দেখতে পেলাম। একই ভাবে মুখ বের করে আছে। চোখ দুটো যেন জ্বলছে। আবার ঢিল ছুলাম। আবার নিপাত্তা হয়ে গেল।'

বললাম, 'আদিবাসীদের পোষা কুকুর হতে পারে। হয়ত ওরা কুকুর নিয়ে জঙ্গলে শিকারে বেরিয়েছিল।'

সুনন্দ বলল, 'কথাটা আমিও ভেবেছি। কিন্তু অনামিকা জোর দিয়ে বলছে, ওটা অ্যালসেসিয়ান। আদিবাসীরা কি অ্যালসেসিয়ান পোষে? তাছাড়া ওরা শিকারে বেরুলে সাড়া-শব্দ পাওয়ার কথা। ওই বুড়ো লোকটা কিন্তু শিকারে বেরোয়নি। সে যাচ্ছিল তার জামাইয়ের বস্তিতে। সেটা নাকি নদীর ওপারে অনেকটা দূরে।'

এরপর গতরাতের সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার কথা বলে ওদের আরও ভয় পাইয়ে দিতে চাইলাম না। শুধু বললাম, 'রাত্রে বাংলোয় যা কিছু ঘটুক, আপনারা যেন বাইরে বেরোবেন না কিংবা হইচই করবেন না।'

*   *   *   *   *

বাংলোর বারান্দায় বসে সুনন্দ এবং অনামিকার সঙ্গে রাত ন'টা অব্দি গল্পগুজব করলাম। গুণধর কয়েকদফা চা দিয়ে গেল। জলবিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে এই বাংলোয় সরাসরি লাইন টানা হয়েছে বলে লোডশেডিংয়ের উৎপাত নেই। টিলার ঢালে বাংলোয় ওঠার গেট। সেখানে আলো আছে। গল্প শেষ করে যখন উঠেছি, সেই গেটের কাছে আবছা আলোয় যেন সত্যিই একটা কালো কুকুরের জিভ বের করা মুখ দেখতে পেলাম।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডের দেখা। চমকে উঠেছিলাম। তারপর মনে হল চোখের ভুল। সুনন্দদের গল্পটা আমাকে হয়ত পেয়ে বসেছে। গতকাল এখানে আসার পর আমি কিন্তু কোনও কালো কুকুর কোথাও দেখিনি।

গুণধর খাবার দিতে এল। তখন তাকে বললাম, 'এলাকায় কি কারও কালো অ্যালসেসিয়ান কুকুর আছে?'

শোনামাত্র গুণধরের চোখ দুটো নিষ্পলক হয়ে গেল। 'কালো কুকুর, বাবুজি?'

'হ্যাঁ' কালো কুকুর।'

ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে সে বলল, 'হুঁ। ছিল। তবে—'

একটু চটে গিয়ে বললাম, 'গুণধর! তুমি কাল রাত থেকে বড্ড হেঁয়ালি করছ। কিছু খুলে বলছ না কেন?'

গুণধর আস্তে বলল, 'আপনি পাগলাবাবুর কথা শুনেছেন মানকু হাড়ামের কাছে। পাগলাবাবুর একটা কালো কুকুর ছিল। ওঁর ভাইপো কুকুরটাকে গুলি করে মেরেছিল।'

'কেন?'

'পাগলাবাবু এই কোঠির মালিক ছিলেন। আমার বাবা ওঁর নোকর ছিল। সে অনেক বছর

আগের কথা বাবুজি। তো শুনেছি, কুকুরটাও ওঁর মত হঠাৎ পাগলা হয়ে যায়। ওঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওঁকে মেরে ফেলে। নাড়িভুঁড়ি খেয়ে ফেলেছিল বাবুজি।'

'কী নাম ছিল পাগলাবাবুর?'

'দয়ারাম সিং। নামকরা লোক ছিলেন উনি। বাবার কাছে শুনেছি, বিদেশ থেকে সাহেবরা আসতেন ওঁর কাছে। কেন উনি হঠাৎ পাগল হয়ে যান কেউ জানে না।' গুণধরের চোখে জল এসে গেল। 'দুঃখের কথা কী বলব বাবুজি, আমার ছেলে ঝাব্বুকে উনিই আমলকী গাছ থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলেন। ছেলেটা মুখে রক্ত উঠে মারা পড়ল। ঝাব্বুর মা তখন লকড়ি কুড়িয়ে জড়ো করছিল। সে ছুটে এসে দেখল, একটা কালো ককুর ঝাব্বুর মুখ থেকে রক্ত চেটে খাচ্ছে।'

বলে কান্না সামলে গুণধর দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি চমকে উঠেছিলাম। এই গল্প শুনে নয়, পাগলাবাবুর নাম শুনে। ডঃ দয়ারাম সিং! আণবিক জীববিজ্ঞানী ডঃ দয়ারাম সিংয়ের কথা সাংবাদিক পেশার সূত্রে আমার জানা। গত জানুয়ারিতে কলকাতায় জীববিজ্ঞানীদের এক সেমিনারে তাঁর কথা শুনেছিলাম। আদিবাসীরা তাঁর নিষ্ঠুর মৃত্যুর গল্পটা নিজের মতো করে বানিয়ে নিয়েছে।

খাওয়ার পর সুনন্দদের ঘরে নক করে সাড়া দিলাম। সুনন্দ ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'কী হয়েছে দাদা?'

'কিছু না। একটা জরুরি কথা আছে।'

দুজনেই বেরুল। মুখে অস্বস্তির স্পষ্ট ছাপ। হাসবার চেষ্টা করে বললাম, 'ওই বন্ধ ঘরটা আমি খুলতে চাই। আপনারা দুজনে আমার পাশে থাকবেন। আসলে একা আমি সাহস পাচ্ছি না।'

সুনন্দ অবাক হয়ে বলল, 'কী আছে ও ঘরে? অ্যালসেসিয়ানটা ঢুকেছে নাকি?'

'হ্যাঁ।' বলে ডাকলাম, 'গুণধর! গুণধর!'

গুণধর দৌড়ে এল। বললাম, 'ওই বাতিল ঘরটার চাবি নিয়ে এস।'

'কেন বাবুজি?'

'দরকার আছে।'

'কিন্তু বাবুজী ওঘরের চাবি তো আমার কাছে থাকে না। কোথায় আছে, তা-ও আমি জানি না।'

'সুনন্দবাবু! আমার সঙ্গে আসুন। গুণধর, তুমি তালা খোলা যায়, এমন কিছু নিয়ে এস। মোটা ছুঁচ, কিংবা শক্ত একটুকরো পেরেক, বা অন্য কিছু।'

গুণধর গম্ভীর মুখে তার ঘরের দিকে কয়েক পা এগিয়েছে, হঠাৎ বাংলোর সব আলো নিভে গেল। তারপরই বন্ধ ঘরের ভেতর কাল রাতের মতোই ঝনঝন কাচ ভাঙ্গার শব্দ শুরু হল। একটু পরে জান্তব গরগর গর্জন এবং তীক্ষ্ণ আর্তনাদ।

টর্চ নিয়ে বেরোইনি। চেঁচিয়ে বললাম, 'সুনন্দবাবু! গুণধর! টর্চ! টর্চ!'

কোনও সাড়া পেলাম না।. গাঢ় .অন্ধকারে প্রতিমুহূর্তেই আশঙ্কা করছি, শয়তান

অ্যালসেসিয়ানটা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ততক্ষণে আবার স্তব্ধতা ফিরে এসেছে। আবার ভাঙা গলায় ডাকলাম, 'গুণধর! গুণধর!'

এবার গুণধরের সাড়া পাওয়া গেল। সে অন্ধকারে কাল রাতের মতোই ধমক দিল, 'যা! যা! ভাগ! ঝাব্বুকে ডাকব! এ ঝাব্বুয়া!'

'গুণধর! আলো জ্বালছ না কেন?

'এক মিনিট বাবুজি! টর্চ বিগড়ে গেছে। লণ্ঠন জ্বালছি।'

একটু পরে লণ্ঠনের আলো দেখা গেল। গুণধর কাছে এসে বলল, 'আপনাকে বলেছিলাম বাবুজি, ও কিছু না। আপনি আমার কথা শুনলেন না। তাই ঝামেলা হল।'

লণ্ঠনের অলোয় দেখলাম, সুনন্দদের ঘরের দরজা বন্ধ। পর্দাটা ফাঁক হয়ে আছে। এমন ভিতু যুবক-যুবতী নির্জন বনে-জঙ্গলে হানিমুনে আসে কেন?

গুণধর বলল, 'চুপচাপ ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন বাবুজি।'

সেই সময় আলো ফিরে এল। আমার ঘরের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। সেই বাতিল বন্ধ ঘরের দরজা হাট করে খোলা। বাইরের আলো ঘরের ভেতরটা কিছু স্পষ্ট করেছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য একটা কালো অ্যালসেসিয়ানের লাল জিভ বের করা মুখও যেন দেখতে পেলাম।

গুণধর দরজাটা টেনে আটকে দিল। জীর্ণ তালাটা ভেঙে নীচে পড়ে ছিল। সে নির্ভয়ে কুড়িয়ে সেটা আটকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু সেটা আটকাল না। সে বলল, 'যান বাবুজি। শুয়ে পড়ুন।'

নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সিগারেট ধরালাম।

*　　*　　*　　*　　*

হনিমুনে আসা দম্পতিকে ভোরে উঠে আর দেখতে পাইনি। গুণধরের কাছে শুনেছিলাম, তারা জিনিসপত্র নিয়ে পায়ে হেঁটেই চলে গেছে। তিন কিমি দূরে বড় রাস্তার মোড়ে পৌঁছে তারা স্টেশনের বাস পেয়ে যাবে।

আমিও গোছগাছ করে ফেললাম। আণবিক জীববিজ্ঞানীর অতৃপ্ত আত্মার সাহচর্য আমার মত নগরবাসীর পক্ষে আনন্দদায়ক নয়। গুণধর জঙ্গলবাসী মানুষ। তা ছাড়া পেটের দায়ে তাকে চাকরি করার জন্য এখানে থাকতেই হবে।

চলে আসার আগে তালা ভাঙা দরজা ফাঁক করে ভেতরটা দেখার ইচ্ছা ছিল। নিশ্চয়ই ওটা ডঃ দয়ারাম সিংয়ের ল্যাবরেটরি ছিল। কিন্তু সেই ভয়াল অ্যালসেসিয়ানটার মুখব্যাদান দিনদুপুরেও আমার সুস্থ নার্ভকে অসুস্থ করে ফেলবে ভেবেই বাংলো থেকে কেটে পড়লাম। গুণধর বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে রইল। তার বউ রোজকার মত শুকনো পাতা ঝেঁটিয়ে জড়ো করছিল। একবার মুখ তুলে আমাকে দেখল। তারপর আবার নিজের কাজে ব্যস্ত হল।

বারো ভূতের আড্ডায়

গয়লাবাড়ি লেনের নাম বদলে কী যেন একটা হয়েছে। মধ্য কলকাতার এই গলিতে ঢুকে খানিকটা এগোলে এক সময় মনেই হত না যে জায়গাটা কলকাতার মত শহরের বুকের মধ্যিখানে রয়েছে। বছর বিশেক আগের কথা বলছি। তখন এপাড়ায় আমরা থাকতুম। পাড়াটা ছিল রাজ্যের ঠেলাওয়ালা রিকশাওয়ালা আর বাতিল ঘোড়াগাড়ির ক্লান্ত হাভাতে বুড়ো কোচোয়ানদের আড্ডা। একখানে অনেকটা পোড়ো জমি জুড়ে ভাঙাচোরা ঘোড়ারগাড়ির ভাগাড়ও ছিল।

প্রচুর গাছপালা, পুকুর, খাপরুলের বস্তি আর মাঝেমাঝে একটা করে ঝকমকে চেহারার উঠতি বড়লোকের দোতালা বা তেতালা বাড়ি ছিল। বাংলো ধাঁচের একতলা কিছু বাড়িও ছিল—দৈবাৎ এমন কোনো একটা বাড়িতে বাস করতেন সেকালের কোনো প্রখ্যাত খেলোয়াড় বা গাইয়ে। বড়ুয়া যুগের একজন নামকরা অভিনেত্রীও ছিলেন। বাড়িওয়ালা তাঁর মৃত্যুর পর কোনো কারণে বাড়িটা অনেকদিন ফেলে রাখেন। বাড়ি খালি পড়ে থাকলে ভূতেরা দখল করে নিতে দেরি করে না। বাড়িটার ভুতুড়ে বলে এমন বদনাম রটতে থাকে যে শেষ পর্যন্ত ভাড়াটে পাওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশ বছর আগে কলকাতায় এমন প্রচণ্ড গৃহসমস্যা দেখা দেয়নি। বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক ছিলেন মুসলমান। তাঁর পূর্বপুরুষ নাকি মোগল দরবারের আমির ছিলেন। এই খান্দানী বংশজাত ঢ্যাঙা শুঁটকো চেহারার মানুষটিকে আমরা পাড়ার যুবকরা যখন গিয়ে ধরলাম, আমরা বাড়িটাতে একটা ক্লাব করতে চাই এবং মাসে মাসে ভাড়া দিতেও রাজি, উনি তক্ষুনি রাজি হয়ে গেলেন। সম্ভবত ওঁর ধারণা ছিল, সচরাচর এমন ক্লাব বেশিদিন টেকে না। দলাদলি ঝগড়া-ঝাঁটিতে বাঙালিরা বড় পটু। তাই অন্তত ভুতুড়ে বদনামটা ঘোচানোর এই এক সুযোগ এসে গেছে।

তাছাড়া 'পাড়ার যুবকরা' বস্তুটি এমন সাংঘাতিক এক উপাদান, যা ভূত কেন—অনেক কিছু অভূত এবং মজবুত জিনিসকে ধসিয়ে দিতে পটু।

আমাদের ক্লাবের নাম হল বারোভূতে। মূল সদস্য সবসময় থাকবে বারোজন। তবে প্যাট্রনের সংখ্যা অগুনতি। তাস, দাবা, ক্যারাম এবং নিষ্কলুষ আড্ডা আমাদের অলিখিত কন্সটিটিউশনের প্রি এম্বল্। আমাদের মধ্যে কয়েকজন বেকারও ছিল। বাকিরা সবাই চাকুরে। বেকার সদস্যরা ক্লাবে সারাক্ষণের আড্ডাধারী। চাকুরেরা জুটত সন্ধ্যার পর। বিশেষ করে শনিবারে রাতের আড্ডাটা দারুণ জমে যেত।

কিন্তু কোথায় ভূত ? বাড়ির যে এত বদনাম রটেছিল, তার ছিটেফোঁটা কারণও আমরা খুঁজে পেলুম না। অন্তত মাসখানেক হইহুল্লোড় করে আড্ডা দিয়ে তাস-দাবা পিটিয়ে বেশ কাটিয়ে দিলুম—তারপর ভূতের কথা ভুলে গেলুম।

মাসখানেক পরে এক শনিবারের রাতের আড্ডা যখন খুব জমজমাট, তারাপদ বাথরু

সরে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল, "ভারি অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল জানিস? মাথামুণ্ডু কিছু খুঁজে পেলুম না।"

তারাপদ কিছুদিন আগে বিয়ে করেছে। মোটামুটি ভাল একটা চাকরি করে। বেশ হাসিখুশি চেহারার যুবক। স্বাস্থ্যও ভাল। তাছাড়া কথা খুব কম বলে বলেই ওর দিকে সবাই তাকাল। জিগ্যেস করলুম, কী রে? ভূতের দর্শন মিলল? তারাপদ ধপ করে বসে বলল, "বাথরুমে ঢুকতে যাচ্ছি, একটা রোগা ফর্সা মত লোক কোত্থেকে এসে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল, বাপের বাথরুম পেয়েছ শালা? আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেছি। তারপর লোকটা হঠাৎ ননী, ননী বলে ডাকতে ডাকতে ওপাশের ঘরের দিকে চলে গেল। তখন আমার খেয়াল হল, গালাগালির একটা জবাব দেওয়া দরকার। কিন্তু আশ্চর্য, তাকে আর দেখতেই পেলুম না। ওপাশের ঘরটা তেমনি তালা আটকানো রয়েছে।"

এবার সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। অরণি বলল, কোন পাগল ঢুকে পড়েছিল। পাঁচিল ডিঙিয়ে পালিয়েছে।

আমি বললুম, "ননী বলে ডাকছিল। হ্যাঁরে গৌতম, সেই ফিল্ম অ্যাকট্রেসের নাম ননীবালা না?" গৌতম মুচকি হেসে বলল, "হুঁ। বোঝা যাচ্ছে শ্রীমতী ননীবালার কোনো পুরনো প্রেমিক এসেছিল।"

তারাপদ কিন্তু মনমরা হয়ে বসে রইল। আমাদের হাসিপরিহাসে যোগ দিল না। রাত দশটার মধ্যে আমরা একে একে যে যার বাড়ি ফিরে গেলুম। কিন্তু সত্যি বলতে কী, তার মধ্যে আর কেউ বাথরুমে যাবার নাম করেনি। বাড়িটার পাশাপাশি দুটো মোটে ঘর। বড়টা আমাদের দখলে। অন্যটার দরজায় তালা আটকানো। পাঁচিলও বেশ উঁচু। ছোট্ট উঠোন মতো রয়েছে। তার কোনায় একটা ঝাঁকড়া মস্তো আমগাছ। বাথরুম তার পাশে কিচেনের লাগোয়া। দুটোরই টালির চাল। ভাঙাচোরা অবস্থা।

পরের শনিবার ছিল মেঘলা দিন। সন্ধ্যায় টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হল। রাত আটটা নাগাদ বৃষ্টিটা বেশ বেড়ে গেল। তখন অবশ্য লোড্‌শেডিংয়ের বালাই ছিল না। বৃষ্টির রাতে আড্ডাটা জমেছিল ভালই। ঘরের ভেতর গুচ্ছ-গুচ্ছ আড্ডা। একখানে তাস, একখানে ক্যারাম, একখানে ব্রজ আর সত্য দাবায় বসেছে, এবং তাদের ঘিরে আরও অনেকে বসে রয়েছে। আমি নরেন, কামাল, ব্রতীন আর তারাপদ ক্রিকেট নিয়ে তুলকালাম তর্ক করছি। এক ফাঁকে কখন তারাপদ উঠে গিয়েছিল। হঠাৎ সে দৌড়ে ঘরে ঢুকল। মুখে উত্তেজনার ছাপ। চোখ দুটো বড় হয়ে উঠেছে। বলল, "এই! শিগ্‌গির আয়! দেখে যা তোরা!"

খেলায় যারা মশগুল, তারা লক্ষ্য করল না। আমরা চারজন গল্প থামিয়ে তারাপদর পিছন পিছন উঠোনের দিকে বেরুলুম। ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তার মিটমিটে আলোর একটু ছটা এসে বাড়িতে ঢুকেছে। আমগাছটার তলায় বাথরুমের দরজা খোলা এবং আবছা একটা মূর্তিকে ভেতরে আমাদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম।

গোঁয়ার কামাল চেঁচিয়ে বলল, "ও মশাই! ও মশাই! এ কি বাপের বাথরুম পেয়েছেন? বলা নেই, কওয়া নেই—হুট করে ঢুকে পড়েছেন?" নরেন বলল, "থাম। বেরুতে দে না। তারপর দেখাচ্ছি মজা! তারাপদকে শালা বলেছিল না ব্যাটা?"

আমি বললুম, "পাগল-টাগল হবে রে! ছেড়ে দে।"

ব্রতীন বলল, "কিন্তু ও ঢুকল কী ভাবে? উঠোনের দরজার তো ওই অবস্থা।"

উঠোনের দরজার এদিকটায় জঙ্গল গজিয়ে রয়েছে। তার ওপর ইট আর সুরকির স্তূপ প্রায় বছর গড়াতে চলল, ওদিকে কেউ বাইরে বেরোয় না।

আমরা লোকটার দিকে তাকিয়ে আছি আর সমানে গজগজ করছি। সে কিন্তু তেমনি দাঁড়িয়ে আছে—যেন অনন্তকাল ধরে হিসি করে চলেছে। কামাল বলল, "তবে রে নিকুচি করেছে পাগলার।" তারপর সে বৃষ্টির মধ্যে উঠোনে ঝাঁপ দিল।

তাকে বাথরুমের দরজায় গিয়ে হঠাৎ 'বাপ রে' বলে ঘুরতে দেখলুম। তার পর সে এক দৌড়ে বারান্দায় ফিরে বলল, "ইলেকট্রিক শক মাইরি! উঃ! হাতে কী একটা ছুঁইয়ে দিল—সঙ্গে সঙ্গে মনে হল ....." সে ডান হাতটা বাঁ হাতে ডলতে ডলতে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

কিন্তু আশ্চর্য, বাথরুমের ভেতর আবছা মূর্তিটা আর নেই। আমরা হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তারাপদর ডাকে সম্বিত ফিরে পেলুম। ঘরে ফিরে এলুম। কিন্তু আড্ডাটা আর জমল না। কুড়ি বছর আগে তখন আমাদের শরীরে ও মনে যৌবনের উত্তাপ তীব্র। সবটাতেই বেপরোয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঝোঁক এবং ক্ষমতা দুই-ই আছে। কেউ কেউ সেই রোগা ফর্সা রহস্যময় লোকটিকে জব্দ করার জন্য ফন্দিফিকির আঁটতুম। কিন্তু অন্য কোনদিন তাকে দেখা যেত না। ঠিক শনিবার রাত আটটা থেকে দশটার মধ্যে কোন এক সময়ে তার আবির্ভাব ঘটত বাথরুমটাতে। তাড়া করে গিয়ে দেখতুম, সে নেই।

আরও কয়েকটা শনিবার কাটিয়ে ব্যাপারটাতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়লুম এবং আর কোনো কৌতূহল রইল না তার সম্পর্কে। এই পুরনো একতলা বাড়ির টিকটিকি, ইঁদুর অথবা আরশোলার মতই সে রয়ে গেল। শুধু তারাপদ বলত, "লোকটা আমাকে কিন্তু কথা বলে গালাগালি করে।" কিন্তু তারাপদর এই কথাটায় আর আমরা আমল দিতুম না।

এরপর সেপ্টেম্বর মাসের এক রবিবারের সকালে আমি, ব্রতীন আর কামাল কী খেয়াল হল, মোড়ের রেস্তোরাঁয় আড্ডা না দিতে গিয়ে "বারোভূতে" ক্লাবে হাজির হলুম। রবিবারের সকালে ক্লাবে অবশ্য কেউ কেউ আসত। তবে আড্ডা জমত বিকেল থেকে।

গিয়ে দেখি, তারাপদ কখন এসে ভেতরদিকের বারান্দায় চেয়ার পেতে চুপচাপ বসে আছে। কেমন উস্কোখুস্কো চেহারা। চোখ দুটো লালচে। অবাক হয়ে বললুম, "কী ব্যাপার?"

তারাপদ একটু হাসল। "জানিস? আজ রাতে এখানে কাটিয়েছি।"

"সে কী!"

'ইচ্ছে করেই।" তারাপদ বলল। লোকটার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা দরকার ভেবেছিলুম। ব্রতীন হো-হো করে হেসে বলল, "হয়েছে তো বোঝাপড়া?'

তারাপদ গম্ভীর মুখে বলল, "হয়েছে। এভটা খুব ট্র্যাজিক রে! তাই মনটা খারাপ।"

কামাল বলল, "বিয়ের পর তুই মাইরি এত গুলবাজ হলি কেন বল্ তো?'

তারাপদ বলল, "বিশ্বাস কর। বাজে কথা বলার অভ্যাস আমার নেই। যা বলছি সব সত্যি।"

আমি বললুম, "বেশ। বল্ কী হয়েছে।"

তারাপদ তার অভিজ্ঞতা শোনাতে থাকল।....

"....একটা বোঝাপড়ার দরকার ছিল। কারণ, ভূতের বিশ্বাস আমার ছিল না। দেহাতীত আত্মায় আমার বিশ্বাস ছিল না। অথচ এই ঘটছে।

কাল রাত ঠিক এগারোটায় আমি এ বাড়িতে এলুম। নরেনের কাছে চাবিটা চেয়ে নিয়েছিলুম, এই ঘরে ঢুকে টেবিলে শুয়ে পড়লুম। টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হল। কাল রাত সাড়ে আটটায় লোকটাকে আমতলায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলুম। জিগ্যেস করলে বলেছিল, বিরক্ত করো না। মন ভাল নেই। শুনে আমি তাকে আর ঘাঁটাইনি। ওদিকে গির্জার ঘড়িতে ঢঙঢঙ করে বারোটা বাজলে হঠাৎ টের পেলুম সে বারান্দায় এসেছে। অমনি ঘরের আলো নিভিয়ে বারান্দায় গেলুম। গিয়ে দেখি, ওই বন্ধ ঘরের দরজাটা সে খোলার চেষ্টা করছে। আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। রাস্তার আলোর ছটায় আবছা দেখতে পেলুম, তার মুখের রাগী ভাবটা আর নেই। মিষ্টি হেসে বলল, দেখুন তো মশাই, এ কী জ্বালা। ননী তালা আটকে কোথায় গেছে, এদিকে ঘরের ভেতর আমার এটাচি রয়েছে। ওর মধ্যে বম্বে মেলের টিকিট-ফিকিট কত কী আছে। ট্রেন রাত দুটো পাঁচে ছাড়বে। এখন করি কী?

বললুম, তালাটা ভেঙে ফেলুন। ইট এনে দেব? বলল, অগত্যা।

তখন টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে উঠোনে নেমে একটা ইট কুড়িয়ে আনলুম। ইটটা নিয়ে সে ঠুকতে আরম্ভ করল। কিন্তু ইটটা গুঁড়ো হয়ে গেল। তার হাতেও চোট লাগল। উহু হু করে ককিয়ে উঠল। বললুম, দাঁড়ান একটি লোহালক্কড় পাই নাকি দেখি।

কিন্তু খুঁজে কোথাও এক টুকরো লোহা পেলুম না। এক কাজ করা যাক। দুজনে লাথি মেরে দরজাটা ভেঙে ফেলি, আসুন।

সে হাসল। ... ননী এলে রেগে যাবে। তা রাগুক। আমার ট্রেন ধরাটা জরুরী।

দুজনে দমাদ্দম লাথি মারতে শুরু করলুম। পুরনো দরজা। একটু পরেই ক্র্যাক করল। আরও কয়েক জোড়া লাথির পর একটা পড়ে গেল। সে ভেতরে ঢুকল। বললুম, আলো জ্বালুন। আপনার মাথা খারাপ? আলো জ্বাললেই কেলেংকারি।

কেন, কেন?

বুঝলেন না? ডিরেক্ট লাইট আদপে সহ্য হয় না। নিজেকে আটকে রাখতে পারি না। আলোর ধাক্কায় হাত পা নাক ক্রমাগত খসে পালায়—ঝড়ে পাতা যেমন করে ছিঁড়ে উড়ে যায়। মৃত্যুর পর মানুষের এই সমস্যা মশাই!

অবাক হয়ে বললাম, কি আপনি সত্যি ভূত ?

ভূত কথাটা গালাগালি। বরং বিদেহী আত্মা বলুন।

তা আপনি কি বিদেহী আত্মা?

আপনার অবিশ্বাসের কারণ কী?

আপনার এই দেহ। আপনার এই কথাবার্তা। তাছাড়া আপনি আমার মতো জ্যান্ত মানুষের মুখোমুখি রয়েছেন। এসব কীভাবে সম্ভব?

প্রথম কথা, আপনি ভয় পান না বলেই আপনার মুখোমুখি আছি। কথাবার্তা বলছি।

দ্বিতীয় কথা, আমার যে শরীরটা দেখছেন, এটা আমার স্মৃতি থেকে সংগ্রহ করেছি। ইচ্ছাশক্তির জোরে সেটাকে চালিত করছি।

আমার হাসি পেল। বললাম, ইচ্ছাশক্তির জোরে বোম্বে যাওয়া যায় না বুঝি ?

কেন যাবে না ? কিন্তু আমি আমার দেহকেও নিয়ে যেতে চাই—সেটাই সমস্যা। তাই ট্রেন ছাড়া উপায় নেই।

বুঝলুম। তা মশাইয়ের নাম? সাতকড়ি রায়। নামটা শুনে থাকবেন—ননীবালার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। কাগজে সে খবর ফলাও করে ছেপেছিল ১৯৩৬ সালে।

নাঃ। এত পুরনো খবর জানি না। যাকগে, পেলেন এটাচি ?

পেয়েছি। আপনার কোঅপারেশনের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আচ্ছা, এবার চলি।

শুনুন, আপনি যেভাবে দেহ সংগ্রহ করেছেন, ননীবালাও তো তেমনভাবে ....

খিকখিক করে হাসলেন সাতকড়িবাবু। ....ননীবালা মনে হচ্ছে কী গণ্ডগোলে পড়েছে। অ্যাদ্দিন ধরে এসে ওকে ডাকাডাকি করছি, তার পাত্তা নেই। বেচারির ইচ্ছাশক্তির জোর অত ছিল না। নৈলে সে ওর ঘরের দরজা ভাঙার সময় এসে কেলেংকারি বাধাত।

তা আপনি এতরাতে হাওড়া স্টেশন যাবেন কী করে। পাঁয়ে হেঁটে নাকি ?

দেখি, কোচোয়ানদের আড্ডায় ওদের ধরে পাকড়ে একটা ব্যবস্থা করা যায় নাকি।

সাতকড়িবাবু এটাচি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। যাইহোক, ভাঙা দরজার সামনে একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকার পর ভেতরে ঢুকলুম। দেশলাই জ্বেলে সুইচবোর্ড দেখে আলো জ্বেলে দিলুম।

বললে বিশ্বাস করবি না, কোনার দিকে একটা খাট—খাটে চাদর ঢাকা দিয়ে কেউ শুয়ে আছে দেখে চমকে উঠলুম। কাছে গিয়ে ভাল করে দেখি, মুখটা বেরিয়ে রয়েছে এবং আশ্চর্য, অত্যন্ত আশ্চর্য—সে ফিল্মস্টার ননীবালা। তার যৌবনের ছবি আমি দেখেছি। সেই অসামান্যা সুন্দরী যুবতী ননীবালা চোখ বুজে শুয়ে রয়েছে।—"

তারাপদ কথা শেষ করে একটু হাসল। "ভেতরে গিয়ে দেখে আয়। আমার বিশ্বাস সে এখনও তেমনি শুয়ে আছে।"

আমরা হন্তদন্ত দৌড়ে পাশের ঘরটার দিকে গেলুম। সত্যি দরজা ভাঙা। ভেতরে ঢুকেই আমরা হতচকিত হয়ে থমকে দাঁড়ালুম।

খাটের ওপর কেউ সত্যি চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে। গলা অব্দি চাদর ঢাকা। ব্রতীন দম আটকানো গলায় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "সর্বনাশ! এ যে তারাপদর বউ!"

এক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর সম্বিত ফিরল। বেরিয়ে এলুম! কামাল ও ব্রতীন গর্জে উঠল, "তারাপদ।"

দেখলুম, তারাপদ চেয়ার থেকে কখন পড়ে গেছে। উপুড় হয়ে পড়েছে। মুখটা একপাশে কাত। মুখে চাপ চাপ গেঁজলা ভাঙছে। চোখের তারা ঠেলে বেরিয়ে গেছে।....

বিশ বছর পরেও এ রহস্যের মীমাংসা আমি করতে পারব না। শুধু এটুকু বুঝতে পারি, তারাপদর মধ্যেই হয়ত একটা ভূত ছিল।

ভয়

সন্ধ্যায় আবার আকাশ কালো করে মেঘ, তারপর ঝিরঝির করে বৃষ্টি এল। আজ সারাটা দিন এরকম চলেছে। এবার খুব আগাম-আগাম বর্ষা আসছে, কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে খবর ছিল। রোজ রাতে টিভির পর্দায় একটা রোগা লম্বা লোক দেশের মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছে, 'তুরন্ত মোসুম আনে লগি। বে অব বেঙ্গলসে ডিপ্রেসান। পচ্ছিম বঙ্গালমে বহত জোর বর্ষায়গি।' কৃত্রিম উপগ্রহের পাঠানো ছবির ওপর ধ্যাবড়া শাদা ছোপ। হাওয়া-বাবুদের হলেও হতে পারে গোছের জ্যোতিষচর্চা নয়, ক্যামেরার চোখ। রাতভোর দিনভোর বৃষ্টি রাগিয়ে দিচ্ছে মানুষকে।

কেকা জানালায় বসে বৃষ্টি দেখছিল। মৃণা এসে বলল, 'সেই গানটা কী যেন রে বড়দি? বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি মিষ্টি মিষ্টি মিষ্টি !'

কেকা বলল, 'আবার তুমি জ্বালাতে এলে? বেশ তো টিভি দেখছিলে বাবা!'

'ভ্যাট! খালি খানকতক বুড়োর বক-বক। গান নেই ফান নেই।' মৃণা পাশ ঘেঁষে বসে জানালার রড আঁকড়ে ধরল ব্যালান্স রাখতে। তারপর গুনগুন করতে লাগল।

কেকা বলল, 'মিনু! ভাল হবে না বলছি।'

মৃণা ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'যা বাবা! হঠাৎ হল কী তোর? অন্ধকারে ভূতের মত চুপচাপ বসে আছিস দেখে তোকে সাহস দিতে এলাম।' তার মুখের একপাশে নিচের রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট থেকে টেরচা হয়ে খানিকটা বৃষ্টিভেজা আলো পড়েছে। চোখে চাপা হাসি থরথর করছে। তারপর আর চেপে রাখতে পারল না হাসিটা।

কেকা রাগ করতে চাইছিল। কিন্তু ইচ্ছের বিরুদ্ধে হেসে ফেলল। 'কী বললি যেন? সাহস তে না কী?'

'হুঁ। তুই যে যখন তখন কী সব দেখতে পাস, আর চ্যাঁচামেচি করে হুলস্থূল বাধাস।'

'যাঃ! সে তো স্বপ্ন। ওই একবার মোটে।'

'স্বপ্ন? তখন কিন্তু স্বপ্ন বলিসনি বড়দি! মনে করে দ্যাখ। বলেছিলি কে একটা লোক তোর বছানার পাশে....'

'মিনু! ভাল হবে না বলছি!'

মৃণা আবার হাসতে লাগল। বলল, 'আমি সত্যি বুঝি না বড়দি, এত যদি ভয় তোর, এমন চুপচাপ বসে থাকিস কেন? একা এমন করে বসে থাকতে ভয় করে না— খ কিছু বললেই যত ভয় তোর।'

কেকা আস্তে বলল, 'থাম তো তুই! বৃষ্টি দ্যাখ।'

মৃণা জানালার রডে নাক ঠেকিয়ে একটু দেখে নিয়ে বলল, 'দেখলাম। দেখার মত জিনিস

নয়। রাস্তায় জল জমেছে। আর ঘণ্টাখানেক যদি চলে, কী হবে জানিস? কাল সকালে
প্রোগ্রাম মাটি। আমার যাওয়া বন্ধ। রিকশো ভাড়া চাইবে মোড় অব্দি পাঁচ। ব্যস! হয়ে গেল

'কাল কী আছে রে তোর?'

'আমার প্রাইভেট ব্যাপার তোকে বলব কেন? তোর তুই বলিস? জীবনে বলেছি
কখনও?'

তিতি ঢুকে বলল, 'ওম্মা! তোরা অন্ধকারে কী করছিস ওখানে?' বলে সে খট করে সুই
টিপল। কিন্তু আলো জ্বলল না। অথচ সব ঘরে আলো আছে। সে খটখট করে বারকতক সুই
টিপে বলল, 'এ কী বড়দি! আলো জ্বলছে না কেন? মেজদি, তুই তো সব কিছুতে এক্সপার্ট
দেখে যা তো।'

মৃণা বলল, 'নাও! এবার ওটার পেছনে লাগল। জ্বলছে না জ্বলছে না। তোর কী সর্বনা
হচ্ছে তাতে?'

কেকা এতক্ষণে বলল, 'জ্বলছে না?'

তিতি ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। চাপা স্বরে বলল, 'নিশ্চয় তোমরা কিছু চক্রান্ত করছি
চুপিচুপি আমাকে নিয়ে। আমি বাবা ডোন্ট কেয়ার। হুঁ, ভয় দেখাবে তো? যত খুশি দেখাও ন
আমি রেডি।'

পিঠাপিঠি তিন বোন। চেহারা প্রায় একইরকম—রোগা ছিপছিপে, পাতাচাপা ঘাসের ম
রঙ। মাথার চুলে সামান্য তারতম্য আছে এই যা। বয়স যথাক্রমে তেইশ, বাইশ আর কুড়ি
কোনও ভাই নেই। শহরতলির গা ঘেঁসে যে রেললাইন গেছে, তার নিচে বিশাল এক ঝিল
ঝিলের ধারে খেলার মাঠ, মাঠের ধারে এই দোতালা পুরনো বাড়ি। নিচের তলায় একদঙ্গ
ভাড়াটে। দোতালার পাঁচটা ছোট-বড় ঘর নিয়ে কেকা, মৃণা, তিতি আর তাদের বাবা সত্যেশ্ব
মা বৈজয়ন্তী, বিধবা পিসিমা সুহাসিনী, সত্যেশ্বরের দূর সম্পর্কের এক ভাগ্নে মনীশ—সে
পড়ছে সান্ধ্য ক্লাসে এবং দিনে চাকরি করে, কাজের মেয়ে সন্ধ্যা আর কাজের ছেলে ভা
থাকে। সংসারটা বেশ বড়ই। সত্যেশ্বর রিটায়ার করেছেন চাকরি থেকে। মেয়েদের বিয়ে
ভাবনায় বিপন্ন। কেকা বি এ-তে আটকে গেছে। মৃণা পাশ করেছে টেনেটুনে। তিতি এখন
লড়ে যাচ্ছে। সামনের বছর বি এ পার্ট-টু দেবে।

তিন বোনে খুনসুটি, ঝগড়া, হাসাহাসি, আবার রাগারাগি, আবার ভাব—এইরকম মে
রৌদ্রের খেলা সারাক্ষণ। আগে মারপিটও বেধে যেত। তবে সেটা সন্ধ্যার দিকে হলে সুহাসি
এসে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলেই সব চুপ এবং আলো জ্বললে দেখা যেত তিনটি
জড়াজড়ি হুমড়ি খেয়ে বিছানায় পড়ে আছে, নয়তো দেয়ালে ঠেস দিয়ে দুহাতে মুখ ঢে
দাঁড়িয়ে আছে। বৈজয়ন্তীর মতে, তাঁর ননদ সুহাসিনীই ভুতের গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে ওদের মগ
বিগড়ে দিয়েছেন। সুহাসিনী আবার দিনদুপুরেই ভূতপ্রেত দেখেন। দিব্যি গম্ভীর মুখে বর্ণ
করে চলেন। কেউ বিশ্বাস করল না করল, ওঁর বয়েই গেল।

তিতির কথা শুনে মৃণা ভারী গলায় বলল, 'তিতি! পড়াশোনা ছেড়ে ইয়ার্কি দিতে এসে
কিন্তু। বলছি দাঁড়াও বাবাকে।'

বাবা-মা, পিসিমা টিভি দেখছেন ওপাশের বড় ঘরে। কিচেনের দরজায় দাঁড়িয়ে হাপিত্যেশ করছে সন্ধ্যা। মাঝে মাঝে খুন্তি দিয়ে নেড়ে আসছে আলু-কুমড়োর ঘ্যাঁট। এরপর রুটি বেলতে বসবে। তার ভাগ্যে টিভি দেখা নেই। পিসিমার পায়ের কাছে বসে প্যাটপ্যাট করে ছবি দেখছে ভানু। গ্রামের ছেলে। তার আনন্দ মানুষের ছায়াবিম্ব দেখে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যাকে ডাকতে গিয়ে বেজার হয়ে ফিরে আসছে।

তিতি উদাস গলায় বলল, 'বৃষ্টিব সময় পড়তে ভাল্লাগে না রে মেজদি।' তারপর দিদিদের মাঝখান দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'তোরা নিশ্চয় কিছু দেখছিলি। তাই না? বল না আমাকে কী দেখছিলি?'

মৃণা বাঁকা হেসে বলল, 'একটা কঙ্কাল ল্যাম্পপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।'

কেকা বলল, 'আঃ! আবার!'

তিতি বলল, 'বলুক না। আমি ডোন্ট কেয়ার। ইশ! কী বৃষ্টি রে! ফ্লাড এসে যাবে সেবারকার মত। মাঠ-ঝিল একাকার হয়ে যাবে। উঃ! দারুণ! কালোদারা নৌকো আনবে। শুধু একটা ভয়—' সে হঠাৎ থেমে কী দেখতে লাগল। তারপর শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'ও মেজদি! ওই দেখ, সত্যি কে যেন দাঁড়িয়ে আছে এদিকে তাকিয়ে।'

মৃণা চমকে উঠল। নিচের রাস্তাটা কিছুটা এগিয়ে খেলার মাঠের ধার দিয়ে ঘুরে বস্তি পেরিয়ে রেললাইন পেরিয়ে চলে গেছে। রাস্তার ওধারে টালিখোলার বস্তিটা শুরু। বস্তিটায় ডি সি বিদ্যুৎ। লোডশেডিং চলেছে। রাস্তায় ল্যাম্পপোস্ট আর এদিকটায় এ সি। ভোল্টেজ মাঝে মাঝে কমে যায়। বৃষ্টির মধ্যে রাস্তার আলোটা তত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে না তাহলেও মৃণা কাউকে দেখতে না পেয়ে তিতির কান টেনে দিল। 'তুই পিসিমা হয়ে গেছিস দেখছি! কই? কোথায় কে?'

তিতি বলল, 'ওই তো! মেজদি! লোকটা যেন হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। অবিকল তাই মনে হচ্ছে।'

মৃণা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'শাট আপ!'

কেকা চুপচাপ বসেছিল। আস্তে বলল, 'ও তো অরুণদা।'

মৃণার বুক ধড়াস করে উঠল। কিন্তু সে যে ভয় পায়নি, তা প্রমাণের জন্য জানালার ভেতর একটুখানি হাত বাড়িয়ে এবং কষ্টকর হেসে বলল, 'ঠিক আছে। অরুণদাকে ডাকি। এসে তোদের ঘাড় মটকাক। আমি বসে বসে দেখি।'

তিতি বলল, 'না রে! অরুণদা কেন হবে? একটা জ্যান্ত লোক। নিশ্চয় কোনো মাতাল। নয় তো ভিখিরি।'

কেকা বলল, 'না, অরুণদা।'

মৃণা বলল, 'যা বাবা! আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। তিতি, কোথায় রে?'

তিতি বলল, 'ওই তো ল্যাম্পপোস্টের ধারে।'

'ভ্যাট! কিচ্ছু নেই।'

কেকা আবার বলল, 'অরুণদা দাঁড়িয়ে আছে।'

তিতি বলল, 'দাঁড়া, পিসিমাকে ডেকে আনি।'

মৃণা ওকে টেনে ধরল। 'না। আর তাহলে ঘুমুতে পারব না সারারাত ! জ্যান্ত হোক আর মড়া হোক, পিসিমা তার সঙ্গে আরও একগাদা ভূত টেনে এনে কেলেঙ্কারি করে ছাড়বেন। তুই আর বড়দি দেখছিস, সেই যথেষ্ট। প্রাণভরে দ্যাখ।'

তিতি বলল, 'সত্যি দেখতে পাচ্ছিস না মেজদি?'

'না। আমার বাবা তোমাদের মত অত দৃষ্টিশক্তি নেই।'

কেকা আপন মনে বলল, 'অরুণদার মতলব ভাল নয়।'

মৃণা খাপ্পা হয়ে বলল, 'বড়দি! বৃষ্টি দেখছিস, দেখছিস। এর মধ্যে অরুণদা-টরুণদাকে টেনে আনলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। আফটার অল যে মারা গেছে, তাকে নিয়ে ঠাট্টাইয়ার্কি আমার ভাল লাগে না।'

অরুণ ছিল পাড়ার ছেলে! এ বাড়ি প্রায় আসত-টাসত। সবাই জানত হয়ত মৃণার সঙ্গে তার বিয়ে হবে। শুধু কেকার মুখ চেয়ে একটু ইতস্তত করা। তাছাড়া অরুণেরও চাকরি ছিল না।

ছিল না, কিন্তু সে রোজগার করত নানাভাবে। পাড়ায় তার বদনাম ছিল মস্তান বলে। গত মাসে প্রচণ্ড এক গরমের রাতে কেবলফল্ট হয়ে সারারাত বিদ্যুৎ বন্ধ ছিল, তার শ্বাসনালী কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। মৃণা দেখতে যায়নি। গিয়েছিল কেকা আর তিতি। বডি জল থেকে ওঠানো অব্দি দুই বোন সেখানে ছিল। বৈজয়ন্তী কপালে দুহাত জোড় করে ঠেকিয়ে শ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, 'ঠাকুর যা করেন মঙ্গলের জন্যে।'

বৃষ্টিটা নাটকীয় মোড় নিল এতক্ষণে। হঠাৎ কালো আকাশ চিড় খাইয়ে ভয়ঙ্কর শব্দে বাজ ডাকল। তিন বোন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছিল। এই সময় পিসিমা সুহাসিনী ভাইঝিদের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে এক ঘরে চলে এলেন। কিন্তু আলো নেই দেখে থমকে দাঁড়ালেন। ডাকলেন 'কেকা! মিনু, তিতি ! আছিস নাকি সব?'

মৃণা বলল, 'আছি পিসিমা!'

আলো নেই কেন ঘরে? কী অদ্ভুত কাণ্ড তোদের বাপু! তার ওপর বাজ ডাকছে, আর অমন করে জানলার ধারে বসে আছিস সব? সরে আয় ওখান থেকে।'

সুহাসিনী তিতির মত খটখট করে বারকতক ব্যর্থ সুইচ টিপে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন 'অ মলো! এ আবার কী? ও কেকা! ও মিনু! ও তিতি !'

তিতি কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, 'পিসিমা, দ্যাখ গে যাও! ল্যাম্পপোস্টের কাছে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল।'

সুহাসিনী মারমুখী হয়ে এগিয়ে গেলেন। 'ও আবার এসেছে? সাহস তো কম নয়। কই কোথায় সে হতচ্ছাড়া বাঁদর? দেখাচ্ছি মজা।' বলে জানলার রডের ফাঁকে নাক বের করে দিলেন।

কেকা ও মৃণা উঠে দাঁড়িয়েছে। বৃষ্টিটা সমানে ঝমঝমিয়ে ঝরছে।

রাস্তার জলে হালকা আলো হলুদ কাপড়ের মত পড়ে আছে, কাঁপছে তিরতির করে। ওপাশের বস্তিঘরে মিটমিটে কয়েকটা আলো জুলজুল করছে। তারপর আবার চিড় খেল কালো আকাশ। মেঘ ডাকতে লাগল। সুহাসিনী তক্ষুনি সরে এসে বললেন, 'আমাকে দেখে

পালিয়ে গেছে। আয় তোরা, ওঘরে গিয়ে বসবি সব। মনা (মনীশ) আসুক, সুইচটা দেখে দেবে'খন।

মনীশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইভনিং ক্লাস করে ফেরে সাড়ে নটা বা দশটায়। আজ খুব বিপদে পড়বে বাড়ি ফিরতে। এই এলাকায় একটু বৃষ্টিতেই এককোমর জল জমে যায়। ট্যাক্সি তো সন্ধ্যার দিকে এদিকে আসতেই চায় না। যদি মনীশ হাওড়ায় ট্রেনে চেপে আসে, স্টেশন থেকে এটুকু রাস্তা জল ভেঙে আসা তার মত বাবুর পক্ষে কঠিন। রিকশো এমন সব রাতে বিশ টাকা হাঁকলেও অবাক হওয়া চলে না।

কেকা বলল, 'বেশ তো আছি এ ঘরে। টিভির বকর বকর আমার ভাল লাগে না।'

মৃণাও বলল, 'তুমি টিভি দেখ গে পিসিমা। আমরা বৃষ্টি দেখি।'

তিতি দোনামোনা করে বলল, 'আলোটা জ্বললে ভাল হত। পিসিমা, বরং একটা মোম খুঁজে নিয়ে এস না তুমি!'

এক পাশে তিন বোনের জন্যে দুটো খাট জোড়া দিয়ে বিশাল বিছানা। ওপরে পুরনো ফ্যানটা ঘড়ঘড় শব্দে ঘোরে। ড্রেসিং টেবিলের ওপর একটা টেবিলল্যাম্প আছে। চমৎকার শেড দেওয়া আনকোরা নতুন। মনীশ এনে দিয়েছে কিছুদিন আগে। কেকা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে হুলস্থূল বাধিয়েছিল যে রাতে, তার পরদিন। বিছানা থেকে হাত বাড়ালে তার সুইচ ছোঁয়া যায়।

সুহাসিনী আবছা আঁধারে ফ্যান এবং টেবিলল্যাম্পের সুইচ দেখে নিয়ে বললেন, 'ঘরের পুরো লাইনই ফিউজ হয়েছে হয়ত। দাঁড়া, তোরা, মোম নিয়ে আসছি। ভয় করবিনে তো?'

মৃণা রাগ দেখিয়ে বলল, 'কিসের ভয়? আছি তো আমরা—ছিলাম তো এতক্ষণ! তোমার খালি—'

'না রে। ও এসেছে, বুঝলি তো? আনাচে কানাচে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্চে।'

সুহাসিনীর এসব রহস্যময় কথা শুনতে তিন বোন অভ্যস্ত। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে পিসিমার কথা শোনে। তিতি বলল, 'লোকটা কে গো?'

'ওই আছে একজন। বলছি দাঁড়া না, মোম নিয়ে আসি আগে।'

সুহাসিনী পা বাড়ালে কেকা আস্তে আগের মত বলল, 'ও তো অরুণদা।'

সুহাসিনী ঘুরে বললেন, 'কী বললি?'

'অরুণদা।'

সুহাসিনী হেসে ফেললেন। 'কথা শোনো! আমাকে অরুণ দেখাচ্ছে। অরুণকে আমি চিনি না? দাঁড়া, এসে বলছি।'

সুহাসিনী চলে গেলে তিন বোন জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিদ্যুতের ঝিলিক এসে মাঝে ছুঁয়ে যাচ্ছিল ওদের। মৃণা মনে মনে রেগে গেছে কেকার ওপর। এতদিনে মনে হচ্ছে, কেকার কি ঈর্ষা ছিল তার প্রতি? বলত বটে, 'অরুণ খারাপ ছেলে। ওকে বেশি পাত্তা দিস কেন রে?' অথচ জানত কেকা, অরুণের সঙ্গেই মৃণার বিয়ে হবে। শুধু কেকার একটা সম্বন্ধ ঠিক হওয়ার অপেক্ষা। অরুণ খুন হওয়ার পর বাথরুমে ঢুকে মৃণা যে নিঃশব্দে কান্নাকাটি করেছিল, তাও জানে কেকা। কিন্তু সে অরুণকে দেখবে কেন বৃষ্টির সন্ধ্যায় ল্যাম্পপোস্টের

কাছে? কী অধিকার আছে তার ওকে দেখার? মৃণা ভাবছিল, মানুষের আত্মা যখন অমর, অরুণের আত্মা দেখা দিতেও পারে। কিন্তু সে তো তাকে দেখতেই চায়। অথচ দেখতে পাচ্ছে না। পাচ্ছে কেকা।

তিতি ভাবছিল, যে অচেনা লোকটা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তার দিকে তাকিয়ে হাসছিল, সে নিশ্চয় তাহলে পিসিমার চেনা লোক। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না ওকে, আবছা কালো সিল্যুট মূর্তি—শুধু মুখটা একটু স্পষ্ট এবং হাসিটা তো আরো স্পষ্ট।

সুহাসিনীর গলা শোনা গেল টানা বারান্দায়। ভানু অথবা সন্ধ্যাকে বকাবকি করছেন। বারান্দার মিটমিটে আলোটা ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছিল। টানটান আলোর ওপর দাগড়া দাগড়া বাড়তি পোঁচ— মোমবাতিটার। দরজার পর্দা সরানো আছে! সুহাসিনী পর্দাটা টেনে দিয়ে মোমবাতিটা ড্রেসিংটেবিলের ক্রিমের কৌটোর মাথায় বসিয়ে দিলেন। তারপর জানলার পর্দাটা টেনে দিতে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে আপন মনে বললেন, 'পালিয়েছে।'

বাকি তিনটে জানালা বন্ধ। ওই একটাই খোলা। বাতাসে পর্দাটা কাঁপতে থাকল। বৃষ্টির ছাঁট আসছে এতক্ষণে। বাতাস উঠেছে। বাইরে বৃষ্টি, বাতাস আর মেঘের শব্দ মিলে দুর্যোগের আভাস। সুহাসিনী ভাইঝিদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললেন, 'মলো যা! তোদের হয়েছে কী বলতো! আমি থাকতে অত ভয় পাচ্ছিস কেন? আয়, বস সব।'

তিন বোন গম্ভীর মুখে বিছানায় উঠে পা মুড়ে বসল। সুহাসিনী বসলেন পা ঝুলিয়ে। তারপর ফিক করে একটু হাসলেন। তিতি বলল, 'কার কথা বলছিলে গো?'

সুহাসিনী চোখ বুজলেন। ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল। তারপর কপালে দুহাত জোড় করে ঠেকিয়ে চোখ খুলে আবার ফিক করে হেসে বললেন, 'পরশু রাত্রে টিভিতে দেখেছিলাম ওকে. জানিস তোরা? ওই যে নিরুদ্দেশ সম্পর্কে একটা ঘোষণা—দাঁড়া, নামটাও মনে আছে, হুঁ ..... কাজল বোস। আমাদের চুঁচড়োর লোক বলল বলেই চোখ গিয়েছিল। চেনা চেনা লাগছিল— তবে ঠিক মনে করতে পারছি না। গোবিন্দ ঘোষ রোড বললে কিনা—সেজন্যই।'

তিতি বলল, 'সে তো কেউ হারিয়ে যাওয়া লোকের ব্যাপার। সে কেন—'

'হারিয়ে যায়নি। অরুণের মতোই মার্ডার হয়েছে।'

মৃণা চমকে উঠে বলল, 'তুমি কীভাবে জানলে?'

'জানি। বুঝতে পারি।'

'পারো, তাহলে পুলিশকে জানিয়ে দিলে না কেন—মনুদাকে দিয়ে?'

তিতি বলল, 'কীভাবে জানতে পারলে বলো না পিসিমা?'

'টিভিতে ছবি দেখামাত্র বুঝলাম, হতভাগা মার্ডার হয়েছে। ওর বডি এখনও পেয়ে যাবে. বালি ব্রিজের ওখানে আটকে আছে।'

কেকা শক্ত গলায় বলল, 'ও অরুণদা। কাজল-ফাজল কেউ না।'

তিতি বলল, 'কার কথা বলছিস বড়দি? যাকে রাস্তায় দেখলাম?'

'হ্যাঁ।'

সুহাসিনী জোরে মাথা নেড়ে বললেন, 'কখনো না। পরশু থেকে দেখছি, কাজল বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরছে। কাল শেষ রাত্রে আমার ঘরের কপাট পর্যন্ত ঠেলছিল।'

তিতি ও মৃণা একসঙ্গে বলল, 'সত্যি?'

'সত্যি না তো মিথ্যা বলছি?' সুহাসিনী গম্ভীর মুখে বললেন, 'দেখবি হয়তো কালই কাগজে খবর বেরুবে কাজলের মৃতদেহ উদ্ধার। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, কেন ও আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে?'

তিতি বলল, 'চেহারার ডেসক্রিপশান দাও তো পিসিমা!'

'কেকার ভুল হচ্ছে কেন, বুঝেছি। কতকটা অরুণের মতই দেখতে ছিল। টিভিতে ছবিটা একটু আবছা ছিল। তাহলেও মনে হয়েছিল চিনি ওকে। গোবিন্দ ঘোষ রোডে লাল রঙের বাড়িটায় কোন বোস থাকত যেন। ওই বাড়িরই ছেলে হবে।'

কথাটা বলে সুহাসিনী গুম হয়ে কিছু ভাবতে থাকলেন। মৃণা অবিশ্বাসের সীমানা থেকে ওঁর দিকে তাকাতে তাকাতে বিশ্বাসের সীমানায় পা ফেলতে গিয়ে তুলে নিচ্ছে। আবার ফেলছে। তারপর তার একটা কথা মনে পড়ে গেল। আগের মাসে এক সন্ধ্যায় সে ছাদে গিয়ে একা দাঁড়িয়ে ছিল। কিছুক্ষণ পরে অরুণ গেল। মৃণা একটু লজ্জা পেয়ে চলে আসছিল। অরুণ তাকে আসতে দেয়নি। বলেছিল, 'মাঠের ওখান থেকে তোমাকে দেখে ছুটে আসছি। আর তুমি চলে যাচ্ছ? দাঁড়াও কথা আছে।' মৃণার ভয় করছিল। অরুণকে কিছু বিশ্বাস নেই। ও যা সাঙঘাতিক ছেলে! মৃণা বলেছিল, 'নাও চটপট বল কী বলবে।' অরুণ তার মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে কী বলতে গিয়ে হঠাৎ চুমু খেয়ে বলেছিল, 'এই আমার কথা।' আর মৃণা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে নিচে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে অরুণও নেমে এসে তার বাবার ঘরে ঢোকে। বাবা ওকে খুব পছন্দ করতেন। মা তো খাতিরের চূড়ান্ত করে ছাড়তেন। কিন্তু মৃণা যখন ওদিকের বারান্দার রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আনমনা হয়ে আছে, সুহাসিনী এসে চাপাস্বরে হঠাৎ তাকে বলেন, 'অরুণের কপালে একটা কিছু আছে, মিনু। আজ ওকে দেখে আমার ভাল লাগল না।' মৃণা খুব রেগে গিয়েছিল বেমক্কা এসব কথাবার্তায়। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপারটা সে ভুলেই গিয়েছিল। এমনকি, সত্যি ঝিলে অরুণের মড়া পাওয়া গেলেও ওটা মনে পড়েনি। এখন সব মনে পড়ছে, সুহাসিনীর মুখে সেইদিন কেমন একটা বাঁকা হাসিও দেখেছিল যেন। তাহলে পিসিমা সব টের পেয়েছিলেন। টের পান কী ঘটতে চলেছে কার ভাগ্যে। তার পিসিমা কে?

সুহাসিনী শ্বাস ছাড়লেন। 'বরাবর আমার এটা হয়, বুঝলি? তার ওপর এ ঘরের লাইন ফিউজ আজ। এও একটা লক্ষণ। এদিকে বৃষ্টি পড়ছে। বাজ ডাকছে। এমনি সব সময়েই তো ওরা আসে।'

তিতি ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'কারা পিসিমা?'

কেকা আস্তে বলল, 'অরুণদা, কাজল বোস....'

মৃণা হিসহিস করে 'শাট আপ' বলে খাপ্পা হয়ে চলে যাচ্ছিল। খাট থেকে নামতে গিয়েই সে থমকে গেল। শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে বলে উঠল, 'পিসিমা! ওটা কী?'

দরজার পর্দার তলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ছিল একটা কালো বেড়াল—হলুদ জ্বলজ্বলে দুটি চোখ, শাদা গোঁফ। বেড়ালটা ঘরে ঢুকে কোনার দিকে রাখা মোড়ার ওপর, তারপর টেবিলে উঠে গেল লাফ দিয়ে। পিঠ কুঁজো করে বসে এদের দিকে হলুদ চোখে তাকিয়ে রইল। তিন

বোন পুতুল হয়ে গেছে। সুহাসিনী মিটিমিটি হাসছেন বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে। কতক্ষণ পরে মৃণা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ওটাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ না কেন পিসিমা? শিগগির তাড়িয়ে দাও!' কান্নার সুর তার কণ্ঠস্বরে।

সুহাসিনী বললেন, 'আহা, ঢুকেই পড়েছে যখন, থাক। দেখি কী বলে।'

তিতি বলল, 'তুমি ওর কথা বুঝতে পারবে?'

'পারছি তো।'

'কী বলছে, বলো না গো!'

মৃণা বলল, 'ভ্যাট! ওটা রানুদিদের বেড়াল।'

সুহাসিনী ধমক দিলেন। 'খুব জানিস তুই! রানুদের বেড়ালটা গাড়িচাপা পড়ে মরে গেছে জানিস? কাজলের আত্মা বেড়ালটার শরীরে ঢুকে গেছে। এবার তোরা একটু চুপ কর তো। ও কী বলছে শুনে নিই।'

শোনা হল না। ভানু এল দুহাত তুলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে। 'দিদিরা আসুন! শিগগির আসুন পিসিমা আসুন। চিত্তহার! চিত্তহার।'

টিভিতে 'চিত্রহার' প্রোগ্রামের খবর। তিতি মেঝেয় ঝাঁপ দিল সবার আগে। তারপর মৃণা। সুহাসিনী উঠে দাঁড়ালেন। কালো বেড়ালটাকে চোখ কটমটিয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন, ভানু 'আবার?' বলে চিক্কুর ছেড়ে তার দিকে ছুটে এল। বেড়ালটা এক লাফে মেঝেয় পড়ে ওদের পাশ কাটিয়ে পালিয়ে গেল। ভানু হি হি-করে হাসতে লাগল।

'বাঁদর' বলে সুহাসিনী তার কানের দিকে হাত বাড়িয়ে তার পেছন পেছন বেরিয়ে গেলেন। 'চিত্রহার' শুনতে খুব ভাল লাগে সুহাসিনীর। তিতি ও মৃণারও। বেশ কিছুক্ষণ জাতীয় সংহতি। .... 'আমরা-আ সব নির্ভয় নির্ভীক .... আমরা-আ....'

কেকা বসে রইল একা। মোমটা ছোট। তলার দিকে ঠেকেছে। শিখাটা ফুলে গেছে। দপদপ করে কাঁপছে। পুট পুট শব্দ হচ্ছে। বাইরে বৃষ্টি আর বাতাস একই তালে প্রাকৃতিক বাজনা বাজাচ্ছে। শুধু মেঘের ডাকে ক্লান্তির আভাস। গলা ভেঙে গেছে।

চিড়বিড় করতে করতে মোমটা দপ করে নিভে গেল। কেকার শরীর শক্ত হয়ে উঠল। মনে মনে বলল, ভয় পাব না। আমি কিছুতেই ভয় পাব না। জানালার ফাঁক দিয়ে রাস্তার আলোর সামান্য আভাস আর উল্টোদিকে দরজার পর্দার তলা দিয়ে বারান্দার মিটমিটে আলোর একটু ছটা এসে পড়ে আছে। ঘরের ওই জায়গাটা জুড়ে আলো-অন্ধকারমেশা খানিকটা আভা, কাকজ্যোৎস্না রাতের প্রতিবিম্ব। সেইখানে পায়ের শব্দ। কেকা তাকিয়ে রইল। অনেক দূর থেকে কেউ এগিয়ে আসার মত পায়ের শব্দ। কেকা ঠোঁট কামড়ে ধরল। সে ভয় পাবে না। কিছুতেই ভয় পাবে না।

কেকা কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে, 'কে?'

'আমি।' .... কয়েক সেকেন্ড পরে, 'কাজল।'

'কী কাজল-টাজল করছ? তাকে আমি চিনি না। পিসিমা চেনে।'

'তুমিই বল আমি কে?'

'অরুণ।'

'আমার ওপর তোমার এত রাগ কেন কেকা?'

'সে-রাতে তুমি অমন করে আমার পাশে বসলে কেন? কী মতলবে?'

'তাই বুঝি তুমি মাঝখানে শুচ্ছ তারপর থেকে ?'

'জানি, তুমি সে-রাতে ভুল করে আমাকে মিনু ভেবেছিলে।'

'বিশ্বাস করো....'

'শাট আপ! তুমি মিনুকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে।' কেকা হিসহিস করে বলল। বিশ্বাসঘাতক! মিথ্যাবাদী! ভণ্ড! জোচ্চোর! বেরিয়ে যাও ঘর থেকে। নইলে চ্যাঁচাব।'

'চুপ করো কেকা! বিশ্বাসঘাতক আমি না তুমি?'

'তুমি আগে, পরে আমি।'

'কেকা! তুমি এমন সাঙঘাতিক মেয়ে আমি ভাবিনি। তোমার কি এতটুকু ভয় করেনি, াত কাঁপেনি....'

'না। যে আমার সর্বনাশ করেছে, তাকে শাস্তি দিতে আমার হাত কাঁপবে কেন?'

'তুমি সেদিন অত রাতে আমাকে ঝিলের ধারে অপেক্ষা করতে বললে, আমি সরল ি্শ্বাসে অপেক্ষা করেছিলাম। তুমি গেলে। ভীষণ প্রেম দেখাতে শুরু করলে। আমার বুকের পর শুয়ে পড়লে। তখনও টের পাইনি তোমার উদ্দেশ্য। আসলে আমি ড্রিঙ্ক করে মাতাল য়ে ছিলাম। হঠাৎ তুমি ড্যাগার বের করে আমার শ্বাসনালী কেটে ফেললে। কী সাঙঘাতিক য়ে তুমি কেকা! তারপর আমার পা ধরে টেনে জলে ফেলে দিলে। ড্যাগারটা জলে ফেলে য়ে ঝিলে নামলে। তুমি ভেজা কাপড়ে বাড়ি ফিরে গেলে। আমি সব দেখতে পাচ্ছিলাম। ন্তু তখনও কিছু বুঝতে পারছিলাম না। নইলে ....'

'তুমি বেরিয়ে যাও। নইলে চ্যাঁচাব।'

'তোমার পিসিমা সব জানেন, কেকা। তোমার কাপড়ে ব্লাউজে রক্তের ছোপ ধোয়া যায়নি খনও। তুমি ওঁর সামনে পড়ে গিয়েছিলে।'

'তুমি যাবে কি না বলো!'

'তোমার পেটে আমার সন্তান আছে, কেকা! তার কী হবে ভেবেছ কি?'

'পিসিমা জানে। শিগগির ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তুমি জ্বালিও না তো! যাও।' কেকা ক্লান্তভাবে লে। বৃষ্টিটা থেমে গেছে মনে হচ্ছে। ঝিল ও মাঠের দিকে ব্যাঙ ডাকছে। পোকামাকড় াকছে। কাঁপা-কাঁপা এঞ্জিনের হুইসিলের শব্দ রেললাইনে। কেকা নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে।

'কেকা! কেন তুমি এই ভুলটা করলে? কেন অপেক্ষা করলে না আর কিছুদিন? দেখতে, ামি কী করতাম!'

কেকা কান্নাজড়ানো স্বরে বলল, তুমি মিনুকে ভালবেসেছিলে! ওকে বিয়ে করতে ইছিলে।'

'না। তোমার বাবা-মা তাই চাইছিলেন। কারণ তোমার জন্য নাকি কোথায় একটা ছেলে ক করা আছে।'

'তাকে আমি বিয়ে করতাম না। তুমি কেন বাবাকে বললে না....'

'আঃ! বলেছিলাম। তোমার বাবা মিনুর জন্য ইনসিস্ট করলেন।'

'তুমি বলনি তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে?'

'অতটা বলা যায় না, কেকা!'

'ন্যাকামি! তুমি চলে যাও, অরুণ।'

'আমি তোমাকে নিতে এসেছি, কেকা!'

অমনি কেকা থরথর করে কেঁপে ওঠে। আবছায়া মূর্তিটা এগিয়ে আসছে তার দিকে কেকার গলার স্বর বন্ধ হয়ে যায়। একটা ঠাণ্ডা হিম হাত তার বাহুতে। সমস্ত শরীর—হাড়ের ভেতর পর্যন্ত কনকনিয়ে যায়।

অবশেষে ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে কেকা বলে, 'হাত ছাড়, যাচ্ছি।'.....

ট্রেন থেকে নেমে মনীশ শর্টকাট করতে চাইছিল। রাস্তায় প্রায় কোমর জল ভাঙতে হবে খেলার মাঠ দিয়ে নাক বরাবর এগোলে জলটা কম। খানাখন্দ আছে কোথাও কোথাও। তা থাক, দেখেশুনে পা ফেলবে।

বৃষ্টিটা থেমেছে। আশ্চর্যভাবে মেঘের ফাঁক গলিয়ে ডিমের হলদে কুসুমের মত থলথলে চাঁদ। ভিজে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে মাঠের জলের ওপর। বাতাসটা আছে এখনও বঙ্গোপসাগরের ডিপ্রেশানটা গাঙ্গেয় উপত্যকা পেরিয়ে বিহারে সরে গেল হয়ত। কাল প্রচুর রোদ, মনীশ আশা করছিল।

মাঠের মাঝামাঝি এসে থমকে দাঁড়াল। ডাইনে ঝিলের দিকে কেউ প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেও থমকে দাঁড়িয়েছে মনীশকে দেখে। মনীশ বলল, কে ?

দৌড়াবার চেষ্টা করছে দেখে মনীশ অ্যাডভেঞ্চারের লোভ সামলাতে পারল না। 'চোর চোর' বলে সে তাড়া করল। ঝপাং ঝপাং শব্দে জল ও হলুদ জ্যোৎস্না ভাঙচুর করে এগিয়ে যেতেই 'চোর' আছাড় খেয়েছে জলে। মনীশ তার দিকে ঝুঁকেই চমক খেল। 'কেকা! তুমি

কেকা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। মনীশ তার গালে থাপ্পড় মারতেই হু-হু করে কেঁদে ফেলল। বাড়িতে নিশ্চয়ই বকাবকি বা ঝগড়াঝাটি হয়েছে। মনীশ বলল, 'বোকা মেয়ে! আমি তো আছি, না কী?'

সারাপথ কোনো প্রশ্নের জবাব দিল না কেকা।

ততক্ষণে টিভি দেখা শেষ। বারান্দার শেষপ্রান্তে কিচেনের সামনে টেবিলে মৃণা ও তিতি খেতে বসেছে। সুহাসিনী রেলিঙে ভর করে একটু দূরে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছেন। এখনও বলেননি কেকা ওঘরে নেই। বললেই তো হুলস্থূল শুরু হবে।

আসলে সুহাসিনী চাইছিলেন, কেকা যদি মরতে গিয়ে থাকে, মরুক। ওর মরাই উচিত

কিন্তু একটু পরে সিঁড়ির মুখে মনীশ আর কেকাকে দেখতে পেয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন সঙ্গে সঙ্গে। মৃণা ও তিতি এঁটো মুখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগল। সত্যেশ্বর বৈজয়ন্তী নিজেদের ঘরে চাপা গলায় কথা বলছেন। বাড়িটা অস্বাভাবিক চুপচাপ। শুধু মাঠ ঝিলের দিক থেকে বর্ষারাতের প্রাকৃতিক কণ্ঠস্বর। তারপর হুইসিল দিতে দিতে একটা ট্রেন যেতে থাকল। খালপোলের দিকে আবার কিছুক্ষণ বুকের শব্দের মত আশ্চর্য এক শব্দ।

আশ্রয়

আমাদের গ্রামে বিদ্যুৎ এলে দণ্ডী আবার আশ্রয়চ্যুত হয়েছিল। সে থাকত গ্রামে ঢোকার মুখে বিশাল এক অশত্থগাছে। এই গাছটার আদি বাসিন্দা ছিল সুদাং খেপি। তাকে ভাগিয়ে দণ্ডী গাছটা দখল করেছিল। লোকেরা বলাবলি করত, বেচারী সুদাং গেছে স্টেশনের ওখানে খথুবড়ে পড়েথাকা একটা ওয়াগনের ভেতর। গ্রামের কয়লাকুড়োনি মেয়েরা নিঝুম সন্ধ্যাবেলায় মাঝেমাঝে আবছা তাকে দেখতে পেত।

বিদ্যুতের তার সোজাসুজি টানতে গেলে ওই অশত্থগাছটা কাটা ছাড়া উপায় ছিল না। কুড়ুলের কোপ পড়ার সময় গাছটার সে কী চিৎকার! গ্রামের অন্য প্রান্ত থেকে তা শোনা যাচ্ছিল। লোকদের মতে, ওই চিৎকারে দণ্ডীরই তীব্র আপত্তির প্রতিধ্বনি ছিল।

কে ছিল এই দণ্ডী?

দণ্ডী ছিল স্বাধীনতাযুগের সন্ধিকালে এক দক্ষ কাঠ-মিস্তিরি। তক্ষণশিল্পে তার মতো নিপুণ তদানীং দুর্লভ। এ অঞ্চলের অনেক বিত্তবান মানুষের ঘরদোরে তার অসাধারণ নকশা-চাতুর্য এখনও খুঁজলে মিলতে পারে।

দণ্ডী ছুতোর যৌবনের শেষদিকে হরিমতী বোষ্টুমীর প্রেমে পড়ে বোষ্টম হয় এবং মাধুকরী অবলম্বন করে। ধর্মত্যাগের জন্য অবশ্য এই প্রেমজনিত পদস্খলনের চাইতে কাজের অভাবটাই গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে মনে হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে পুরনো গ্রামীণ বৃত্তিগুলো বিকল হয়ে যাচ্ছিল। কেন যাচ্ছিল তা বিজ্ঞ সমাজতাত্ত্বিকরাই বলতে পারেন।

স্কুলের টিফিন পিরিয়ডে একদিন রাস্তায় ভিড় দেখে ছুটে যাই এবং শিউরে উঠে দেখি, হরিমতী বোষ্টুমী দণ্ডীর পায়ে বিচুলির দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। নদীর ধারে পাড় অবধি তাদের অনুসরণ করেছিলুম।

কিছুদিন পরে পরে দণ্ডীর খুলিটা একটা বেগুনক্ষেতে কাকতাড়ুয়ার ডগায় দাঁত বের করে আছে দেখে খুব ভয় পেয়েছিলুম।

সেখানে নদীর জলে শেকড় ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে হিজল গাছ. দিনশেষে বাড়িফেরা ... ক্ষেতমজুর আর রাখালেরা বলত, সেটাই হয়েছে এখন দণ্ডীর আশ্রয়। কিন্তু পরের এক ... বন্যায় গাছটা উপড়ে ভেসে যায়। ফলে সে ঠাঁইছাড়া হয়ে চলে আসে আকলু মোড়লের ...র কানাচে একটা ঢ্যাঙা তালগাছের ডগায়। নিশুতি রাতে দণ্ডীর বাটালি. তুরপুন আর ...কাপের হরেক শব্দ শোনা যেত। মাঝে মাঝে, ঠিক চাঁদ অস্ত যাবার সময়টাতে চেরা গলায় ... খঞ্জনি বাজিয়ে সে তার প্রিয় গানটা গেয়ে উঠত. 'হরি দিন তো গেল / সন্ধ্যা হল / ... করো আমারে .....'

সূর্যাস্তে জীবিতদের যদি সন্ধ্যা হয়. চন্দ্রাস্তে মৃতদেহের সন্ধ্যা হতেই পারে। তবে দণ্ডীর এ

সুখটুকু বরবাদ করতে বর্ষার দেবতা থুথু ফেললেন এবং তালগাছটার মাথা জ্বলে গেল। দণ্ডী আবার আশ্রয়চ্যুত হয়ে গ্রামের শেষে অশত্থগাছটা জবরদখল করল।

আমাদের গ্রামের মৃতদের এই এক অভ্যাস ছিল, তারা জীবিতদের কাছাকাছি থাকতে চাইত। আমরাও তাদের পরিত্যাগ করতে চাইতুম না। তারা আমাদের জীবনকে আগের মতোই প্রভাবিত করত। কে মৃত্যুর পর কোথায় থাকছে, আমরা তার খবর রাখতুম। আমাদের গ্রামীণ মানুষদের নীতিবোধ মৃত্যুর পরও সক্রিয় থেকে যেত। কোনো যুবতী বধূ এলোচুলে নিরিবিলি জলের ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকলে, কিংবা নির্লজ্জের মতো অসম্বৃতবাস হলে তারা তাদের শাস্তি দিতে চাইত। বধূটির ভর উঠত। তখন ডাকা হত পিরিমলের ওঝাকে। পিরিমলের হলুদপোড়া ধোঁয়া ও ঝাঁটা খেয়ে বধূর মুখ দিয়ে সেই মৃত মানুষটি বলে দিত, কেন তাকে ধরেছে সে। সোমত্ত যুবতী মেয়ে, অমন করে একা বুকের কাপড় খুলে দাঁড়িয়ে ছিল কেন?

তবে এই সুযোগে মৃত মানুষটি আশাতীত আহার জুটিয়ে নিত। সেইসব সুস্বাদু, লোভনীয় খাদ্য, যা সে বেঁচে থেকে খেতে পায়নি,—দুধ, রসগোল্লা, পাকা কলা প্রচুর পরিমাণে দাবি করত এবং গোগ্রাসে বধূটির মুখ দিয়ে খেয়ে তবে তাকে ছেড়ে চলে যেত!

কিন্তু পিরিমল ছিল হাড়বজ্জাত দুষ্টুবুদ্ধি লোক। জলভরা ঘড়া দাঁতে কামড়ে কিংবা ইঁদারা ডিঙিয়ে যাবার হুকুম দিত। তা পেটে খেলে পিঠে সয়।....

আমাদের গ্রামে বিদ্যুৎ আসার পর আমরা দণ্ডীকে খুঁজছিলুম তন্নতন্ন করে। গ্রামে তত বেশি গাছপালা আর ছিল না। দণ্ডী ছিল কাঠের মিস্তিরি। কাঠের উৎস হিসেবে গাছকে তা ভাল লাগার কথা। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের বছর তাহের ঠিকাদার আমাদে গ্রামটিকে প্রায় বৃক্ষশূন্য করতে পেরেছিল। বয়স্ক গাছের সংখ্যা কমে গিয়েছিল। যা ছিল, ত সবই পুরুষ-মৃতদের দখলে। দণ্ডীর পক্ষে তাদের হটিয়ে স্থান দখল করা সম্ভব ছিল না স্ত্রীলোক-মৃতদের আশ্রয় ছিল সচরাচর বাড়ির আনাচকানাচ, পেছনের ছাঁচতলা, পুকুরঘা গোয়ালঘরের চাল এইসব আজেবাজে জায়গায়। এক অন্ধ বৃদ্ধা, যাকে বলা হত 'কানী বামনী সে থাকত রাখলরাজ গোঁসাইয়ের ভিটেয়। প্রায়দিন সন্ধ্যাবেলা খেলার মাঠ থেকে ফের সময় আমরা তার সঙ্গে রসিকতা করতে ছাড়তুম না। চেঁচিয়ে আঙুল নেড়ে বলতুম, 'ঠাকম কটা আঙুল নড়ছে?' ভিটের নিমবনে সন্ধ্যার হাওয়া উঠত নড়ে। সেই হাওয়ায় সুর ধরে গা দিত কানী বামনী। আমরা হিহি করে হাসতে হাসতে পালিয়ে আসতুম।

সেই ভিটেয় এখন রাখালবাবুর ছোট ছেলে এসে পাকা দালান তুলেছে। বাইরে ধা ধানভানা ময়দাপেষা কল। বিদ্যুতের আলো জ্বলছে। কানী বামনীকে পরে আবিষ্কার ক হয়েছে স্টেশনের বেলইয়ার্ডে। আমরা বলাবলি করি, কেন, কেন ওরা উদ্বাস্তু হয়ে এ রেললাইনেই গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে? ওরা কি শহরের দিকেই চলে যাবে শেষমেশ, যেমন ক এই গ্রামের জীবিতদের অনেকেই চলে যাচ্ছে?

আমাদের এই চিন্তার যুক্তি আছে। জীবিত বহু লোক ছানাপোনা বউ নিয়ে জঙ্গলে গি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কিছুদিন বাস করছে দেখতে পাই। তারপর তারা ট্রেনে চেপে চলে য মৃতরাও তাদের অনুসরণ করলে এতে অবাক হওয়ার কিছু আছে কি? তাই আমরা অবাক

না। শুধু ভাবি, একের পর এক এভাবে সবাই গ্রাম থেকে আশ্রয়চ্যুত হয়ে চলে গেলে আমরা—আমাদের বংশধররা একটা রহস্যময় জগৎকে হারিয়ে ফেলবে ক্রমশ। বেঁচে থাকাটা এত বেশি প্রত্যক্ষ, এমন মায়াহীন হয়ে যাওয়াটা কি কাম্য হতে পারে মানুষের? মৃতরাও স্নেহ ও অভ্যাস জীবিতদের ছেড়ে চলে যায়নি এতকাল। আমরাও তাদের নিয়ে থেকেছি। কত সুন্দর সন্ধ্যা ও রাতদুপুর, কত ঘুঘুডাকা নিঝুম দিনদুপুর আমরা তাদের কথাবার্তা শুনেছি। শুনেছি তাদের সুখদুঃখের সঙ্গীত। তাদের কাজকর্মের শব্দপুঞ্জ। জীবিতদের শরীরে তাদের যন্ত্রণার আক্ষেপ দেখে বিষণ্ণবোধ করেছি। হাসপাতালের ডাক্তার হিস্টিরিয়া বলতে পারেন, কিন্তু পরিচিতা কোনো যুবতী চোখের সামনে অপরিচিতা ও রহস্যময়ী হয়ে ওঠার বিস্ময় আর কীভাবে পাব আমরা?

গ্রামে বিদ্যুৎ আসার পর আমার বিয়ে হল। বিয়ের কিছুদিন পরে এক রাতে ঘরের কপাটে অদ্ভুত একটি চিড়খাওয়া শব্দ শুনে বউ চমকে উঠে বলল, 'ও কিসের শব্দ?'

আমার বউ এক সমৃদ্ধ গঞ্জের মেয়ে। সে আমাদের গ্রামের লোকের ভূত-প্রেতের প্রতি সরল বিশ্বাস নিয়ে রসিকতা করে। সে তাদের জংলি বলে। এই 'পাড়াগাঁয়ে' সে নিজেকে মনে করে নির্বাসিত। সে মেয়েদের সঙ্গে ভূত নেই বলে তর্ক করে। তাদের উপহাস করে।

সে-রাতের শব্দটা ছিল রহস্যময়। পাছে আমাকে বউ ঠাট্টা করে, আমি এড়িয়ে গেলুম। কিন্তু আমার খটকাটা লেগেই রইল। আমাদের বাড়িটা খুব পুরনো। ঘরের কপাটগুলো প্রকাণ্ড। কপাটে দারুণ সব কারুকার্য। শুনেছিলুম, বেশির ভাগই দণ্ডী ও তার বাবার হাতের কাজ।

আরেক রাতে বউ আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বলল, 'খাটে কিসের বিচ্ছিরি শব্দ। ঘুম আসছে না।'

সত্যি একটা শব্দ হচ্ছিল—খুবই গোপন ও গভীরতর সেই শব্দ। ঘিসকাপ, তুরপুন কিংবা বাটালির শব্দের সুদূর প্রতিধ্বনির মতো। আলো নিভিয়ে টের পেলুম ওইসব শব্দ এবং বললুম, 'ঘুণপোকার শব্দ।'

কিন্তু খটকাটা বেড়ে গেল। নিষুতি নিঝুম রাতে মস্তিষ্কের ভেতর ছড়িয়ে পড়া ওইসব সুদূর রহস্যময় শব্দপুঞ্জ সত্যি কি ঘুনপোকার? এই পালঙ্কে ঐতিহ্যসম্মত তক্ষণশিল্পের সর্বশেষ নমুনা বিধৃত। দণ্ডী ও তার বাবার হাতের নিপুণ শিল্প ও এ বাড়ির অনেক দারুকার্মে রয়ে গেছে। তাহলে কি আশ্রয়চ্যুত দণ্ডী এ ঘরেই আশ্রয় নিয়েছে? অনেক রাতে কপাটে মৃদু ঘিসকাপের ঘসঘস শব্দ হঠাৎ-হঠাৎ ভেসে উঠে থেমে যায়। পালঙ্কের গভীরতা থেকে তুরপুনের চাপা ঘর্ঘর শব্দ শুনি। ঘুমোতে পারি না।

কিছুদিন পরে জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে বউয়ের মুখে পড়েছে। রূপ দেখতে গিয়ে হঠাৎ দেখি, সে নিঃশব্দে হাসছে। কালো চুলের মধ্যিখানে হলুদ মুখের হাসি। শিউরে উঠে বললুম, 'কী হল?'

অমনি বউ হি হি করে বিকট হেসে উঠল। তারপর আমার গালে মারল প্রচণ্ড এক চড়। তার হাসির শব্দ, আমার ভয়ার্ত চিৎকার বাড়ির লোকেদের ঘুম ভাঙিয়ে দিল। বউ তখন

বিছানায় উঠে বসে এলোচুল দুলিয়ে দুর্বোধ্য কী আওড়ে চলেছে।

সুতরাং অত রাতে পিরিমল ওঝাকে আসতে হল। হলুদপোড়ো ধোঁয়া তৈরি হচ্ছে আর অবাক চোখে বউকে দেখছি। শিউরে উঠে ভাবছি, একে তো এতদিন দেখিনি! কে এ?

হলুদপোড়া ধোঁয়ার চোটে বউ চেঁচিয়ে বলল, 'ওরে থাম থাম! আমি দণ্ডী। আমি দণ্ডী মিস্তিরি।'

পিরিমল চিক্কুর ছেড়ে বলল, 'দণ্ডে ? তুই দণ্ডে ?

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। আমি দণ্ডে।'

'তুই বউমাকে ধরলি যে? ধরার আর মানুষ পেলিনে তুই?'

'হি হি—হাতাকাটা জামা পরে চুল এলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল যে সন্ধ্যাবেলা। দেখে লোভ হল, তাই ধরলুম!'

ঠাকুমা বললেন, 'অ পিরিমল, ওকে জিজ্ঞেস করো না এখন থাকে কোথায়?'

পিরিমল একগাল হেসে বলল, 'হালবিত্তেন্ত না জেনে কি ছাড়ব ভাবছেন মা? ও দণ্ডে! আজকাল তুই থাকিস কোথায়? অশত্থতলা তো নেই।'

'হি হি—এই ঘরের কপাটে-পালঙ্কে ভাগাভাগি করে আছি।'

অবাক হয়ে পিরিমল বলল, 'ভাগাভাগি মানে?'

'বাবা তো কপাটে আছে অনেককাল থেকে। আমি আছি পালঙ্কে।'

'তোর বাবা কপাটে আছে? বলিস কী রে দণ্ডে!'

'হ্যাঁ। বাবার কপাট দুটোর ওপর বড্ড লোভ।'

পিরিমল সবার দিকে অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করে বলল, 'ঠিক আছে। তুই বউমাকে ছাড়।'

'ইশ! ছাড়ব বললেই হল? এমনি-এমনি ছাড়ব?'

'কী নিয়ে ছাড়বি, তাই বল আগে শুনি।'

ঠিক সেই সময় হঠাৎ আবির্ভাব ঘটল হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর। হয়েছিল কী, আমার ছোটভাই পিংকু নতুন জেনারেশন। সে ভূত বিশ্বাস করে না। শহরের কলেজে হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো করে। সেদিন সে বাড়িতে ছিল। কখন গিয়ে ডাক্তারবাবুকে ঘুম থেকে উঠিয়েছে। প্রকাণ্ড শরীর ডাক্তার কমলাক্ষ বোসের। দুপদাপ শব্দে ঘরে ঢুকেই স্মেলিং সল্টের শিশি ঠেসে ধরলেন ভূতগ্রস্তার নাকে। সে নেতিয়ে পড়ে গেল। তারপর বুক ও পেট কাঁপতে শুরু করল। তারপর ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে চোখ খুলল।

পিরিমল গুম হয়ে ঝুলিতে তার জিনিসপত্র গুছিয়ে বেরিয়ে গেল। লক্ষ্য করলুম, ঠাকুমা ভারিমুখে সরে গেলেন। ডাক্তার বোস একটু হেসে বললেন, 'কেমন বোধ করছ বউমা?'

বউমা আস্তে বলল, 'ভাল।'....

ডাক্তার বোস যাই বলুন, ওই ঘরটাতে আর আমাদের থাকতে দেওয়া হয়নি। এরপর মাঝে মাঝে বউয়ের মধ্যে দণ্ডীর আভাস পেলেই স্মেলিং সল্ট শুঁকিয়ে দিতুম। তবে ডাক্তার বোস যা বলেছিলেন, তাই হল। বাচ্চা হবার পর পর বউয়ের ওই বালাইটা ঘুচে গিয়েছিল তারপর পিংকুর বিয়ে হল। পিংকু তার বউ নিয়ে দণ্ডী ও তার বাবার আশ্রয়ে ঢুকে পড়ে

আশ্চর্য ব্যাপার, আর কিছু ঘটলই না। পিংকুর বউ বহাল তবিয়তে রয়ে গেল।

তার মানে দণ্ডী ও তার বাবা দুজনেই আবার আশ্রয়চ্যুত হয়েছিল। তা ছাড়া ঘরটার ওই স্তব্ধতা ও নিরুপদ্রব হওয়ার আর কী কারণ থাকতে পারে?

গেল কোথায় ওরা? আমি তন্নতন্ন খুঁজতুম। লোকেরাও খোঁজাখুঁজি করত ভেতর-ভেতর। তারা জানে, মৃতরা জীবিতদের ছেড়ে সহজে যেতে চায় না। কিন্তু যা দিনকাল পড়েছে! স্বাধীনতার পর যোজনা এসে গ্রামের চেহারা হু-হু করে বদলে দিচ্ছিল। পাশের রাস্তাটা চওড়া হয়ে কংক্রিট স্ল্যাবে মোড়া হল। ছোট্ট বাজার বসে গেল পর্যন্ত। রাজনীতি এসে ঢুকল গ্রামে। পুরনো দলাদলির চেহারা জটিল করে ফেলল। দু'বেলা দাঙ্গা, খুনজখম, বোমাবাজি। রীতিমতো শ্রেণীসংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। এই অবস্থায় জীবিতরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। মৃতদের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে যেতে বাধ্য এবং এভাবেই একটা আলাদা জগৎ—বস্তুত একটা আলাদা গ্রাম, যা জীবিতদের গ্রামেরই গভীরতর রহস্যময় একটা প্রতিরূপ, যা দর্পণবিম্ববৎ থেকেছে হাজার হাজার বছর ধরে, তা মুছে গেল। কারণ দর্পণটাই গেল ভেঙে গুঁড়িয়ে। মায়াহীন এক রুক্ষ কর্কশ বস্তুগত গ্রাম নিয়ে আমাদের এখন বেঁচে থাকা।

এই বিশাল ভাঙন ও নবপত্তনের পর কলকাতা থেকে আমার এক বন্ধু এলেন আমাদের গ্রামে। তিনি একজন লোকতাত্ত্বিক। প্রাচীন লোকবিশ্বাস ও সংস্কার (কুসংস্কার) নিয়ে তিনি গবেষণা করছেন। তিনি যদিও ব্যাপারটা এভাবেই ব্যাখ্যা করলেন, আমি বুঝেছিলুম তিনি আসলে ভূতপ্রেত বিষয়ে একটা ডক্টরেট অর্জনের তালে আছেন। কারণ তিনি প্রথমেই আমাদের গ্রামে ক'রকম ভূত ছিল এবং তাদের গতিবিধি ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছিলেন। দণ্ডীর বৃত্তান্ত তিনি খুব মন দিয়ে শুনে কী সব নোট করে নিলেন। তারপর বললেন, 'তুমি তক্ষণ শিল্পী না কী বলছিলে যেন?'

আসলে আমরা গ্রামীণরা শহরের মানুষদের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহার করে থাকি। বললুম, 'হ্যাঁ, দণ্ডী ছিল বংশানুক্রমে তক্ষণশিল্পী।'

লোকতাত্ত্বিক রহস্যময় হেসে বললেন, 'তুমি তক্ষকের ডাক শুনেছ কখনও?'

অবাক হয়ে বললুম, 'কেন? গ্রামে থাকি যখন, তখন তক্ষকের ডাক না শোনার কারণ নেই। আমাদের বাড়ির পেছনে ডোবার ধারে একটা ডুমুরগাছে ছেলেবেলায় তক্ষকের ডাক শুনতাম। মুর্গির মতো কঁক কঁক করে ডাকত।'

লোকসংস্কৃতিবিদ খুব হাসলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, 'কঁক কঁক নয়, ঠক্ ঠক্। তক্ষক কেন বলে জানো? যে সরীসৃপ গাছের ডালে ওইরকম ঠক্ ঠক্ শব্দ করে, লোকসমাজে তাকে ছুতোরমিস্তিরি ধরে নিয়েই তক্ষণশিল্পের সঙ্গে জড়িয়েছিল। তক্ষক শব্দের মূলে তক্ষণ আছে।'

আমার বিজ্ঞ বন্ধু এরপর দুরূহ তত্ত্ব আওড়াতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, 'সংস্কৃত তক্ষণ ও ফার্সি তক্তা বা তখ্‌ত্‌ একই মূলজাত। বাই দ্য বাই, মহাভারতের শুরু জন্মেজয়পুত্র পরীক্ষিতের সর্পবংশ ধ্বংস নিয়ে। তারপর তিনি হস্তিনাপুরে নয়, তক্ষশীলায় রাজধানী পত্তন

করেছিলেন। আসলে তক্ষশীলা ছিল তক্ষণশিল্পের কেন্দ্র। কিন্তু তক্ষণের সঙ্গে সাপের সম্প
কী প্রমাণ করছে জানো কি? তক্ষণশিল্পীদের টোটেম ছিল সাপ বা নাগ। তার মা
পরীক্ষিত ....'

আমার বউ চা আনলে তিনি চুপ করলেন। রসিকতা করে বললুম, 'এই ভদ্রমহিলাকে
দণ্ডী পেয়েছিল, জানো?'

বউ ভুরু কুঁচকে রাগ করে চলে গেল। গবেষকের প্রশ্নের জবাবে সে রাতের ঘট
সবিস্তারে বর্ণনা করলুম। তিনি হাসতে গিয়ে গম্ভীর হলেন। বললেন, 'দণ্ডী কি গ্রাম ছে
চলে গেছে মনে হয়?'

বললুম, 'কে জানে! আজকাল তো গ্রামীণ উদ্বাস্তুরা শহরে গিয়ে ভিড় বাড়ায়।'

'পিরিমল ওঝার খবর কী? নিশ্চয় সে বেকার হয়ে গেছে?'

কবে! বেকার হয়ে সে শহরের ফুটপাতে গিয়ে উঠেছে। জড়িবুটি, মড়ার খুলি এসব নি
সে বসে থাকে দেখেছি।'

গবেষক একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'দণ্ডী আর তার বাবা তোমাদের যে ঘরটাতে আ
নিয়েছিল, সেটা একটু দেখতে চাই।'

আমার ছোটভাই পিংকু এখন ধানবাদে আছে সপরিবারে। কাজেই ঘরটা খালি প
আছে। সেই ঘরে ঢুকে লোকতাত্ত্বিক ঘোষণা করলেন, আপত্তি না থাকলে এই ঘরে তিনি এ
রাত কাটাতে চান।

সে ব্যবস্থাই হল। এঘরে আর তেমন কোনো রহস্যজনক শব্দ শোনা যায় না। তাই আম
ধরেই নিয়েছিলুম, দণ্ডী ও তার বাবা ঘর খালি দেখে আর ফিরে আসেনি। আমার গবে
বন্ধু অনেক রাত অব্দি আশ্চর্য সব লোকতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করলেন। তারপর হাই তু
বললেন, 'এবার শুয়ে পড়া যাক।'

আমার ঘুম আসছিল না! একটু উদ্বেগও ছিল মনের ভেতর। যদি কোনো অঘটন ঘ
যায়, অপ্রস্তুতের একশেষ হব।

ঠাকুর্দাঘড়িতে ঢঙ ঢঙ করে দুটো বাজলে উঠে পড়লুম। সেই ঘরের কপাটে টোকা দিলা
পণ্ডিত বন্ধু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কে?'

'আমি।'

তিনি দরজা খুলে দিয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার?'

'আঃ! আলো নেভান।'

'সে কী! কেন?' তিনি খুব অবাক হয়ে গেলেন। .

'আলো আমার সহ্য হয় না।'

তিনি বিস্ময় চেপে বড় আলো নিবিয়ে টেবিলবাতি জ্বেলে হাসতে হাসতে বললেন, 'কি
হঠাৎ আপনি আপনি করছ যে?'

'আমি সামান্য লোক, বাবুমশাই!'

'তার মানে?'

'আমি দণ্ডী।'

বন্ধু হাসতে হাসতে বললেন, 'এত সহজে আমি ভয় পাই না বাদার! তবে তোমার রসিকতাটি অদ্ভুত বটে! এস, বসো। এমনিতেই নতুন জায়গায় গিয়ে আমার ঘুম হয় না .... আরে! আরে! করছ কী! ছাড়ো, ছাড়ো, দম আটকে যাচ্ছে যে!'

ধস্তাধস্তি চলতে থাকল। তারপর কেউ হ্যাঁচকা টানে আমাকে পেছন থেকে টেনে নিল। আমি মেঝেতে পড়ে গেলুম।

* * * * *

চোখ খুলে একদঙ্গল মুখ দেখে ক্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। হাসপাতালের নতুন ডাক্তার হরিপদ বাগচী মৃদু হেসে বললেন, 'কেমন বোধ করছেন?'

ধড়মড় করে উঠে বসে বললুম, 'আমার কী হয়েছিল বলুন তো?'

আমার বউ বাঁকা মুখ করে বলল, 'বুড়োবয়সে আদিখ্যেতা!'

গবেষক মুখ চুন করে বসেছিলেন। একটু হাসলেন। 'তুমি ভীষণ কান্নাকাটি করে বলছিলে, বাবুমশাই, আমি কোথায় যাব? ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত।'

পারিবারিক ভৃত্য নন্দ বলল, 'ছাড়িয়ে না দিলে এতক্ষণ খুনের দায়ে পড়তেন বাবুদাদা!'

আমি অথবা দণ্ডী যেই হোক, কেন হঠাৎ ওই ভূতগবেষকের ওপর অমন খাপ্পা হয়ে উঠেছিলুম, কে জানে! শুধু এটুকু বলতে পারি, জ্ঞানত আমি কিছু করিনি। ওই কপাটে হাত রাখার সঙ্গে সঙ্গে আমি কেন যেন বদলে গিয়েছিলুম। নিজের ওপর এতটুকু নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

এতে আমাদের বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটেনি, যদিও গবেষক তাঁর গবেষণার বিপজ্জনক দিকটি টের পাওয়ায় আর এ লাইনে পা বাড়াননি। তবে এটুকু বুঝতে পেরেছি দণ্ডীর শেষ আশ্রয় আমিই।...

প্রতিবেশিনী

সন্ধ্যার পর এ-পাড়াটা কেমন ঝিমিয়ে আসে। কখনও দু-একটা লণ্ঠনের আলো, কেউ কাউকে ডাকে, কিংবা চাপা গলায় হঠাৎ কথা-বার্তা। তারপর আবার নিঝুম নিশুতি।

বাজার পর্যন্ত বিদ্যুৎ এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। তাছাড়া বাজারের দিকে ঘরভাড়াটা বড্ড বেশি। নৃপেনের মাইনের প্রায় কাছাকাছি। বাস-কন্ডাক্টারের অবশ্য উপরি আয় থাকে। নৃপেনেরও আছে। কিন্তু এই খুচরো-খাচরা উপরিকে জমাতে পারলে তো! খুব খরুচে মানুষ নৃপেন।

আগের বউ মঞ্জুরানী নৃপেনের পকেট থেকে সিকিটা আধুলিটা হাতিয়ে শ তিনেক টাকা জমিয়েছিল। তার মৃত্যুর পর সেই টাকা উদ্ধার করে নৃপেন একটা ট্রানজিস্টার কিনেছে। নতুন বউ রাখীর সেটা দিনরাতের সঙ্গী হয়েছে। সন্ধ্যার পর বিবিধ ভারতী শোনে। কিন্তু চারপাশে ব্যাপক স্তব্ধতা আর অন্ধকার যেমন ছিল তেমনি থাকে। এতটুকুও যেন চিড় ধরাতে পারে না বোম্বের গাইয়েরা—এমন কি কিশোরকুমার, তিনিও না।

নৃপেনের ফিরতে সেই রাত নটা সাড়ে নটা। ততক্ষণ বারন্দায় লণ্ঠনের কাছে ট্রানজিস্টার রেখে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকে রাখী। ভাঙাচোরা বেড়ার ওধারে ছোট্ট পুকুর। পুকুরের পাড়েও কয়েকটা বাড়ি আছে। বাড়ির নিচে ঘাট আছে। সেই সূত্রে সবে আলাপ হয়েছে তার বয়সী একটি বউয়ের সঙ্গে। অবশ্য কেউ কারুর নাম জানে না। রাখীর কাছে গল্প করতে আসবে বলেছে, কিন্তু আসে না। এ-ঘাট থেকে ও-ঘাটের দূরত্ব হাত তিরিশের বেশি নয়। রোজই বলে, যাব, যাব। দেখবেন, আজই ও-বেলা গিয়ে হাজির হব। তখন অপ্রস্তুতের একশেষ হবেন।

রাখী বলেছে, অপ্রস্তুতের একশেষ হব কেন?

বউটি হাসতে হাসতে বলেছে, আমি বড় আন্দেরে মেয়ে যে! এমন আব্দার ধরব, ভড়কে যাবেন।

কথাটা বুঝতে পারেনি রাখী। আন্দেরে সে নিজেও কি কম? সে বলেছে, বেশ তো, দেখা যাবে কী আব্দার ধরেন!

এক রাতে নৃপেন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিল, পাড়ায় আলাপ-পরিচয় হল তো কারুর সঙ্গে? নাকি লজ্জা লজ্জা করেই কাটিয়ে দিচ্ছ গো?

রাখী আস্তে বলেছিল, হয়েছে।

কার কার সঙ্গে হয়েছে? নৃপেন জানতে চেয়েছিল। একটা কথা বলে রাখা অ্যাদ্দিন উচিত ছিল। শোন, নগেন কবরেজের বাড়ির কারুর সঙ্গে আলাপ করতে যেও না যেন। ওরা খারাপ লোক। আর ওই যে নোটনের মা—সাবধান! খুব কুচুটে মেয়েছেলে। হ্যাঁ, ভানুদার বউয়ের সঙ্গে মিশতে পার, তবে বেশি নয়। আর ওই দোতলা বাড়ি ....

রাখী সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, পুকুরপাড়ে তো?

হ্যাঁ। ও-বাড়ির ঝিমলির সঙ্গে আলাপ করতে পার। আর কারুর সঙ্গে না।

কে ঝিমলি?

কলেজে পড়ে। রোগা করে, ফর্সা করে। খুব ভাল মেয়ে। এতটুকু অহঙ্কার নেই।

রাখী জিজ্ঞেস করেছিল, ঝিমলির বিয়ে হয়েছে?

নৃপেন ফিক করে হেসে অস্থির। ধুর বোকা। বললুম না কলেজে পড়ে! এখনই বিয়ে হবে কী!

হয় না বুঝি?

নৃপেন তরুণী বউয়ের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠেছিল। তারপর বিব্রতভাবে বলেছিল, হ্যাঁ—তোমার কথাটা মনে ছিল না। তবে কিছু ভেবে আমি বলিনি। কপালের দোষ থাকলে তাও হয় বৈকি। নৃপেন অপ্রস্তুত হয়ে একটু হেসেছিল। এই দেখ না, আমিও তো স্কুল অব্দি পড়েছিলুম। কপালের দোষে বাস-কন্ডাক্টারি করছি।

আর কপালের দোষে আমার মত মেয়ের পাল্লায় পড়েছ। বলে রাখী পাশ ফিরেছিল।

নৃপেন ওকে আদরের চূড়ান্ত করে শেষে বলেছিল, তোমার পয় আছে। জানো, তোমার সঙ্গে যেই বিয়ের কথা হল, বাস সিন্ডিকেট পঁচিশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিল এক থোকে। ভাবা যায়?

নৃপেনের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। দেখতে একটু রোগা হলেও স্বাস্থ্যটা মোটামুটি ভাল। সাদাসিধে মানুষ। এ-পর্যন্ত তাকে একবারও রাগ করতে দেখেনি রাখী—প্রায় মাসখানেক হতে চলল নৃপেনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। তবে কলেজে পড়তে পড়তে বিয়ে হয়েছে বলেছিল, এতে খানিকটা বাড়াবাড়ি আছে। কলেজে ঢুকেই তার মা তাকে নিয়ে এক দূর সম্পর্কের দাদার বাড়ি আশ্রয় নেন। রাখী চাকরির চেষ্টাও খুব করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মামা আর মায়ের চাপে তাকে বিয়েতে রাজি হতে হয়। রাজি হওয়ার পরমুহূর্তেই সে মনকে প্রস্তুত করে নিয়েছিল যে কোনো অবস্থার জন্য। তা তার কষ্ট হয়নি। কিন্তু ভেতর ভেতর হলেও লড়াই করে কষ্টটাকে চেপে দিয়েছে। অবশ্য নৃপেনকে মানুষ হিসেবে ভাল লাগতে দেরিও হয়নি।

একটু পরে সে বলেছিল, আচ্ছা, ও-বাড়ির ঘাটে একজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে—কে গো মেয়েটা?

কেমন দেখতে?

খুব ফর্সা নয়, আমার মতো রঙ। একমাথা চুল। বেশ সুন্দর মতো। বাড়ির বউ-টউ হবে।

নৃপেন ভাবতে ভাবতে বলেছিল, ও-বাড়ি তিনটে বউ আছে। দাঁড়াও, বলছি। হুঁ, তাহলে দীপুর বউই হবে। ছেলেপুলের মা বলে মনে হয়?

যাঃ! আমার মতো বয়েস।

তোমার মতো বয়েসে বুঝি ছেলেপুলে হয় না! নৃপেন রসিকতা করে হেসে উঠেছিল। এক বছর আগে তোমার বিয়ে হলে ....

রাখী ওর পাঁজরে প্রচণ্ড চিমটি কেটে বলেছিল, যাঃ খালি অসভ্যতা।

নৃপেন ভাল মানুষ হয়ে বলেছিল, ঝিমলিদের বাড়িতে তিনটে বউ আছে। অবু, সতু আর দীপু—তিন ভাই। আর আছে ওদের বাবা হারামজাদা কেলুবাবু। বাজারে বিরাট আড়ত। তার সঙ্গে সুদের আর বন্ধকীর কারবার। ঝিমলির মাও মহা ধড়িবাজ মেয়েছেলে। পরে ওদের হিসট্রি সব বলব 'খন। তোমার সঙ্গে যার আলাপ হয়েছে, সে মনে হচ্ছে দীপুর বউ।

কী নাম গো?

দেখ কাণ্ড। আমি কি পাড়ার বউদের নাম মুখস্থ রেখেছি? তুমি জিজ্ঞেস করো না।

ছেলেপুলের খবর তো বেশ রাখো!

কানে আসে। ও-বাড়ির যা কেচ্ছা!

নৃপেন বলেনি। ভোর চারটেয় তার ফার্স্ট টিপ। সাঁইথিয়া-কাঁদি করে ভোর থেকে রাত নটা অব্দি চক্কর মারতে হয় তাকে। বয়সও হয়েছে—বাইরে যত যুবক সেজে থাকার চেষ্টাই করুক ......

বিকেলে ঘাটে গিয়ে ও-ঘাটের সেই আলাপিনীর সঙ্গে দেখা হতেই রাখী বলল, কী? রোজই খালি এক কথা—যাব, যাব। বুঝেছি, গরিবের বাড়ি এলে মান-সম্মান যাবে, না!

ছিঃ! ও-কথা বললে দুঃখ পাব ভাই!

তাহলে এসেই প্রমাণ করুন সেটা।

পেছন দিকে নিজেদের খিড়কির দিকে ঘুরে দেখে দীপুর বউ বলল, এখন একটু অসুবিধে আছে। ঘণ্টা দুই বাদে যাচ্ছি। আপনার কর্তা বাড়ি নেই?

না, তার তো ফিরতে রাত নটা-দশটা।

ওম্মা! অতক্ষণ একা থাকেন ওই বাড়িতে? আমি হলে ভীষণ ভয় করত, জানেন?

রাখী একটু হেসে বলেছিল, আমার কি ভয় করলে চলে?

না ভাই। দিনকাল ভাল না। কর্তাকে বলেন না কেন, কাউকে ততক্ষণ থাকতে বলবে!

আমার পাহারা দরকার নেই।

উঁহুঁ। তাছাড়া কেউ থাকলে কথা বলেও তো সময় কাটে।

অত যখন বললেন, আপনিই এসে থাকুন। কথা বলে বাঁচি। পাহারাও দেবেন।

রাখী হাসতে লাগল, দীপুর বউ এদিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, আমার অবশ্য ততকিছু কাজকম্ম নেই। আমার অবস্থাও কতকটা আপনার মতো।

কেন? বাড়িতে তো অত লোকজন আপনাদের?

দীপুর বউ চাপা গলায় বলল, বনে না কারুর সঙ্গে। মিশিনে ভাই। এত দেমাক আমার সয় না।

কতদিন আপনার বিয়ে হয়েছে?

বছর তিনেক হয়ে এল প্রায়। আপনাকে তো সবে ক'দিন দেখছি।

যাঃ! ক'দিন কি বলছেন? একমাস হয়ে গেল।

তা হবে। আপনার বাপের বাড়ি কোথায়?

ছিল বহরমপুরে, রাখী অন্তরঙ্গতা করে বলল, বাবা মারা গেলে মিঠিপুরে মামার কাছে ছিলুম। সেখানে থেকে এখানে।

মা বেঁচে আছেন তো?

আছেন। অসুস্থ মানুষ।

আর ভাইবোন?

কেউ নেই।

হুঁ, আমারই অবস্থা একেবারে। তাও তো আপনার মা আছেন, আমার তাও নেই।

আপনি কোথাকার মেয়ে?

কাটোয়ার।

আচ্ছা, ওর সঙ্গে আমার তর্ক হয়েছে। আমি বলেছি, আপনার কাচ্চাবাচ্চা হয়নি মোটে। বলেছে, হয়েছে।

তাই বুঝি? দীপুর বউ খিলখিল করে হেসে উঠল। তাই তো ভাই, হেরে গেলেন!

আপনার বাচ্চা আছে?

আছে, মানে কি ছিল। এখন নেই।

আহা রে! কী হয়েছিল?

দীপুর বউ সাঁৎ করে উঠে গেল। ঘাটের দু-ধারে কলাবন আর আগাছার ঝোপঝাড়। রাখী াক হয়ে দেখল, সে কলাবনের ভিতর দিয়ে উধাও হয়ে গেল কোথায়। অবাক চোখে কিয়ে রইল রাখী।

ও বাড়ির খিড়কি দিয়ে আর একটি বউ বেরিয়ে সোজা ঘাটে নামল। বেলা পড়ে এসেছে। লর শব্দ হচ্ছিল। রাখী তাকিয়ে রইল তার দিকে। কিন্তু সে আর এদিকে তাকাল না। কাজ য় করে চলে গেল ব্যস্তভাবে।

বেলাশেষের ধূসরতা গাঢ় হয়ে আসছিল। হাঁসের ডাক, বাছুরের গলায় ঘণ্টার শব্দ, দূরের ায় মোটর গাড়ির চাপা গর্জন, একে একে ফুরিয়ে গিয়ে দোতলার বাড়িটাতে শাঁখ বেজে ল। তারপর কোথায় মন্দিরে বাজতে থাকল আরতির ঘণ্টা।

অন্ধকার বাড়ির উঠোনে ঢুকে একটু চমকে উঠেছিল রাখী। কী? এসে গেলুম তো?

রাখী ব্যস্ত হয়ে বলল, এক মিনিট। আলোটা জ্বালি।

বিকেলেই অভ্যাস মতো হেরিকেনের কাঁচ মুছে তেল পুরে পাশে দেশলাই পর্যন্ত ঠিকঠাক খে দেয় রাখী। দীপুর বউ উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। হেরিকেন জ্বালা হলে বলল, অন্ধকার া লাগে না আপনার? দম কমিয়ে এখানে আসুন। গল্প করি। আলো আমার একেবারে সহ্য না।

রাখী একটা মাদুর আনছিল। আনতে বারণ করল দীপুর বউ। অতিথি সেবা করতে হবে তাহলে কিন্তু চলে যাব, বলে দিচ্ছি।

রাখী মাদুর রেখে বলল, অন্তত একটু চা?

আমি চা খাইনে। দীপুর বউ কপট ধমক দিল। ছাড়ুন তো ওসব। আসুন এখানে।

অন্ধকার উঠোনে একটু দূরত্ব রেখে দাঁড়াল রাখী। তখন অমন করে ঘাট থেকে উঠে লেন যে? ওই ভদ্রমহিলা আপনার জা, না? বড় না মেজ?

মেজ। কিন্তু আপনার নামটাই এখনও জিজ্ঞেস করা হয়নি।

রাখী। আপনার?

আপনার কাছাকাছি প্রায়। রানী। তবে ওই যে বলে, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন, এ তাই।

যাঃ, কেন? আপনি কত সুন্দর দেখতে!

কে জানে? সুন্দর হওয়া হয়তো ভাল নয়। ..... রানী চারদিকটা ঘুরে আবছা আঁধারে দে নিল। আপনাদের বাড়িটা বেশ। আমার বিয়ের পর থেকে দেখতুম আর ভাবতুম পো বাড়ি। শেষে দেখলুম, না, লোক আছে। তারপর আপনার কর্তার কথা শুনলুম। খুব ভা মানুষ কিন্তু ভদ্রলোক। এই যে তিনটে বছর চলে গেল, কখনও দেখিনি একবার ঘাটের দি মুখ তুলে তাকিয়েছেন। এমন কি ঘাটে মেয়েরা থাকলে সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেছে

বাঃ! তাই যদি, তাহলে কেমন করে চিনল আপনি দীপুবাবুর বউ?

বলেছেন বুঝি তাই?

হ্যাঁ। আরও কত কথা বলেছে।

কী?

রানী একটু চমকে উঠেছিল বুঝি। রাখী তা টের পেয়ে সংযত হল। বলল, না মা আপনাদের বাড়িতে কে আছে, এইসব কথা।

রানী জোরে শ্বাস ছেড়ে বলল, থাকগে ওসব কথা। আপনার ট্রানজিস্টারটা আজ ব কেন? খুলুন না একটু গান শুনি।

বাঃ! গল্প করবেন বলে এলেন। আপনাদের বাড়িতে তো কত দামী রেডিও আ রেকর্ডপ্লেয়ারও আছে নিশ্চয়। আর আমার কথা যদি বলেন, ওইসব হিন্দি গান আম একেবারে ভালে লাগে না।

সে কী! তবু যে দিনরাত্তির বাজান শুনতে পাই!

কী করব? সময় কাটানোর জন্য।

বই-টই পড়েন না কেন? আমি ভীষণ বই পড়তে ভালবাসি। লাইব্রেরি থেকে আনি নিই।

কে এনে দেবে? রাখী একটু চুপ করে থাকার পর বলল ফের, বই দেখলেও আমার র হয়, জানেন? এতদিন বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে আমি হয়ত এ বাড়ির বউ হয়ে আস না। বাবা হঠাৎ মারা গেলেন, আমাকে না কলেজ ছেড়ে ....

আশ্চর্য! আমার সঙ্গে আপনার দারুণ মিলে যাচ্ছে কিন্তু। কাঁটায় কাঁটায়।

উঁহুঁ, মোটেই মিলছে না। আপনি বড়লোকের বাড়ির বউ। রাখী হাসতে হাসতে ব কথাটা। আর আমার স্বামী বাসকন্ডাক্টার। মিল-টিল খুঁজে লাভ নেই।

রানী শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, আঃ! কি বলছেন? বড়লোকের বাড়ির বউ! আপ জানেন কেন আপনার সঙ্গে আলাপ করেছি, কেন এমন করে চলে এসেছি আপনার কাছে

রাখী একটু অবাক হয়ে বলল, কেন?

আপনাকে আরও ভাল করে হিংসে করতে।

সে কী! কেন ভাই?

হ্যাঁ-আপনি কত সুখী! আর আমার জীবনটা দেখুন! জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে গেল। অথচ আমিও আপনার মত সুখী হতে পারতুম। আমিও ....

ও কী! আপনি কেঁদে ফেললেন!

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাখী। আবছা আঁধারে দীপুর বউ চাপা শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে কাঁদছে। রাখীর মন মমতায় কাতর হল। সে পা বাড়িয়ে ফের বলল, ছিঃ। কাঁদে না। কেন কাঁদবেন?

রাখী ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, জয়েন্ট ফ্যামিলিতে বিয়ে হলে এরকম হয়। তখন মামা কথাটা বলতেন, বুঝতুম না। এখন অবশ্য মনে হয় কথাটা ঠিক। একার সংসারে আছি। যা খুশি করি। কেউ কিছু বলতে নেই, দোষ ধরতে নেই। আপনাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি কিনা। নানা রকম জটিলতা থাকবেই।

রানীর গলাটা একটু ধরে গেছে কান্নার দরুন। ভাঙা গলায় বলল, শুধু সেজন্যে নয়। আচ্ছা, আপনার বিয়েতে কিছু দাবি করেনি?

দাবি? রাখী হাসল। কী দাবি করবে? করলে কি বিয়ে হত? কে মেটাতে পারত দাবি, বলুন না? আমরা মা-মেয়ে ভেসে বেড়াচ্ছিলুম। তা আপনার বিয়েতে বুঝি দাবি উঠেছিল?

উঁহু। রানী ভাঙা গলায় বলল। কিন্তু জ্যাঠামণির কাছে মানুষ হয়েছি। নিজের মেয়ের চাইতে বেশি স্নেহ করতেন। সাধ্যমতো দেওয়া-থোওয়া করেছিলেন। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির খোঁটার জ্বালায় অস্থির। আমার দুই জা না বড়োলোকের মেয়ে। তাদের বাড়িসুদ্ধ লোকের সঙ্গে এক রা।

আপনার স্বামী প্রতিবাদ করেন না?

প্রতিবাদ করবে? তাহলে তো একটুও দুঃখ করার ছিল না। চুপচাপ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

সে কী! রাখী ভীষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

রানী চাপাস্বরে বলল, রাত দুপুরে বাবু বাড়ি ফিরবে মাতাল হয়ে। আমার জীবনটা জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। একেক সময় মনে হয়, দিই নিজেকে শেষ করে।

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। তারপর নৃপেনের গলা পাওয়া গেল। রাখী বলল, ওই আমার বাবু এসে গেছে। এক মিনিট, আমি আসছি।

দরজা খুলে দিলে নৃপেন বলল, কার সঙ্গে কথা বলছিলে? কখন থেকে কড়া নাড়ছি, ডাকাডাকি করছি। তুমি গল্প করেই যাচ্ছ, করেই যাচ্ছ।

রাখী একটু হেসে চাপা গলায় বলল, দীপুবাবুর বউ।

তাই বলো। বলে নৃপেন বাড়ি ঢুকল। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না।

রাখী বলল, অদ্ভুত মেয়ে তো! না বলে চলে গেল!

গরম পড়েছে বলে বারান্দায় মশারি খাটিয়ে শুয়ে থাকে নৃপেন আর রাখী। এ রাতে রাখীর ঘুম আসছিল না। নৃপেন আজ সকাল সকাল ফিরেছে। বাস সিন্ডিকেটের আপিসের বারান্দায় এখনও তাসের আড্ডা চলছে। নৃপেন বউকে বলে না তার ভীষণ তাসের নেশা। আজ তাসের

চাইতে বউয়ের কথা বড় হয়ে উঠেছিল তার কাছে। একেবারে একটেরে এই বাড়িটা। কো
বিপদ-আপদ হলে বাঁচানোর কেউ নেই। এই সব কথা ভেবেই নৃপেন তাসের নেশা জয় ক
বাড়ি ফিরেছে।

রাখী দীপুর বউয়ের দুঃখের কাহিনী শোনাচ্ছিল। নৃপেন শোনার ভান করছিল। তার
নানা বৈষয়িক চিন্তায় সবসময় ভরা। রাখী তাকে খুঁচিয়ে দিয়ে যখন বলল, ঘুমলে নাকি ?

সে ছোট্ট একটা হাই তুলে বলল, না, একটা কথা ভাবছিলুম।

রাখী রাগ করে বলল, তাই বলো! এদিকে আমি বকে মরছি!

না, না। তোমায় কথাও শুনছিলুম! নৃপেন একটা সিগারেট ধরাল। ওই দোতলা বাড়ি
বড্ড অপয়া, জানো? বিশেষ করে ওই হারামজাদা কেলুবাবুদের ত্রিসীমানায় বাস করতে
হয়। তাই ভাবছিলুম, বাজারের দিকে দেখব নাকি চেষ্টা করে। এই নিরিবিলি শ্মশানের ম
জায়গায় তুমি একা পড়ে থাকো।

রাখী বলল, আমার ভয় করে না।

নৃপেন খিকখিক করে হাসল। আমার কিন্তু করে! তুমি যখন ছিলে না, আমি একা রা
ফিরে বড্ড গা বাজত। তপুকে হোক, বাঁটুলকে হোক—যাকে পেতাম, সঙ্গে নিয়ে এসে শু
থাকতাম। না—না, তুমি ভাবছ, এ বাড়িটার দোষ আছে, তা নয়। এ-বাড়ি ছিল খুব ধা
মানুষের। নন্তুবাবু, বেচে তিনি এখন ধানবাদে ছেলের কাছে আছেন। নন্তুবাবুর ইচ্ছে আছে
বাড়িটা ভেঙে গোডাউন তৈরি করবেন।

রাখী অস্ফুট করে বলল, কিসের ভয়?

বললুম না, ফেলুবাবুদের বাড়িটা বড্ড অপয়া!

কেন?

নৃপেন বলল, থাক। রাতবিরেতে সেসব কথা বলতে নেই। দিনে বলব'খন।

রাখী জেদের বশে উঠে বলতে যাচ্ছিল। না, এখনই শুনব। নৃপেন তাকে টেনে শু
দিল। রাখী হিসহিস করে বলল, ওসব ন্যাকামি আমার ভাল লাগে না, রোজ খ
বলব—বলব।

সে একটু ভেংচি কাটল নৃপেনের কথার ভঙ্গি নকল করে। নৃপেন সিগারেটে লম্বা
দিয়ে বলল, বড় ঘরে বড় কেলেঙ্কারি। দীপুর আগে একবার বিয়ে হয়েছিল—আমারই ম

রাখী অবাক হয়ে বলল, সত্যি বলছ?

হ্যাঁ, তুমি জিজ্ঞেস কোর না দীপুর নতুন বউকে! আগের বউটা গায়ে কেরোসিন
স্যুইসাইড করেছিল। সে নিয়ে খুব থানা-পুলিশও হয়েছিল। সত্য-মিথ্যা জানিনে, লোকে
কেলুবাবুর বউ তাকে পুড়িয়ে মেরেছিল। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায়। বছর
পরে দীপুর আবার বিয়ে হলো, তাও দেখলুম। বুঝলে না? এ সংসারে যার টাকা আছে
সবই পারে।

রাখী কাঠ হয়ে শুনছিল। বলল, তাই খালি মনে হচ্ছিল, ওরা অমন বড়লোক। অথচ
মতো গরিবের মেয়েকে বউ করে কেন আনল? সব জেনেও বাধ্য হয়ে রানীর জ্যাঠামণি
বাড়িতে বিয়ে দিয়েছেন।

নৃপেন একটু অবাক হল। .... গরিবের মেয়ে? আমি তো শুনেছি পায়ে না কোথায় ডিফেক্ট আছে বলে ....

রাখী কথা কেড়ে বলল, থামো! দিনরাত তো বাইরে ঘোর। পাড়ার খবব খুব রাখো তুমি! আমার সঙ্গে রোজ কথা হচ্ছে রানীর। আমি জানি না কিছু, আর তুমি সব জেনে বসে আছ!

নৃপেন হার মেনে বলল, তা হবে। লোকে কত কী রটায়।

পরদিন রাখী খুব আগ্রহ নিয়ে ঘাটের দিকে লক্ষ্য রেখেছিল। কিন্তু রানীর পাত্তা নেই। আরও দুটো দিন চলে গেল, তবু দোতলা-বাড়ির ঘাটে তাকে আর দেখতে পেল না রাখী। ভাবল, অসুখ-বিসুখ করেছে নাকি। কিন্তু ও-ঘাটে যে নামে, তাকে জিজ্ঞেস করতে বাধে তার।

দিন কতক পরে এক পলকের জন্য কলাবনের ভেতর রানীকে দেখে রাখী প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই রানী উধাও হয়ে গেছে। ক্ষোভে অস্থির হয়ে রাখী দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ এরকম অদ্ভুত আচরণ করছে কেন দীপুর বউ? একি তার সঙ্গে মেশার জন্য বাড়িতে বকাবকি করেছে ওকে ? সেটাও সম্ভব। বাস-কন্ডাক্টারের বউয়ের সঙ্গে বড়লোকের বাড়ির বউয়ের মেলামেশা কি উচিত ?

মনে আরও আঘাত পেল রাখী। কিছুদিন পরে এক বিকেলে রানীকে ও-ঘাটে দেখে সে ভাবল, বাঁকা হেসে বলবে, কী? বাড়ির লোকে বুঝি আমার সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করেছে? কিন্তু চোখে চোখ পড়তেই রানী ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারায় তাকে চুপ করতে বলল এবং তারপর বাড়ির দিকে আঙুল তুলে ফের কী ইশারা করল। হ্যাঁ, রাখী যা ভেবেছে, তাই ঠিক। বাড়ির লোকে শাসন করেছে বেচারাকে। সেদিন এতক্ষণ ধরে রাখীর কাছে এসে কথা বলেছিল। নিশ্চয় ওরা টের পেয়ে বকেছে।

তবু রাখী একটু হেসে চাপাস্বরে বলল, বুঝেছি। সুযোগ পেলে আসবেন কিন্তু!

রানী মাথাটা একটু দোলাল। তারপর দ্রুত উঠে গেল ঘাট থেকে।

সে রাতে নৃপেন ফিরে সুখবর দেওয়ার আনন্দে বলল, পেয়ে গেছি রাখী! বাস অফিসের পেছনে একটা গ্যারেজ মতো ঘর খালি হয়েছে। সাবরেজিস্ট্রি অফিসের এক মুহরিবাবু থাকত। নতুন বাসা যোগাড় করে উঠে গেছে। মোটে তিরিশ টাকা ভাড়া। একটু অসুবিধে হবে। হোক না! বাজার জায়গা। ইলেকটিরি আছে।

রাখী কিন্তু খুশি হল না। বাস অফিসের চারপাশ জুড়ে গা ঘিনঘিন করা ভিড় সে দেখেছে। সব সময় হট্টগোলে কান পাতা দায়। এমন কী, নৃপেন নিজেই তো কতদিন বলেছে, বিকেল থেকে রাত অব্দি ওখানে তাড়ি-মদের আসর বসে। সাট্টাজুয়াও চলে আনাচে কানাচে। নৃপেন নিজেই কত নিন্দা করেছে। এখন এমন পরিবেশে গিয়ে থাকতে চাইছে, সে কি রাখীর ওপর কোনো সন্দেহ হয় বলে?

রাখীকে চুপ করে থাকতে দেখে নৃপেন বলল, বাজার জায়গায় একটু হইহল্লা আছে বটে। কিন্তু ইচ্ছে করলে তুমি বাড়ি বসে টিউশনিও করতে পারো। ড্রাইভার বরুণদা বলল, ভালই হবে নৃপেন। তোর বউ তো এডুকেটেড মেয়ে। আমার ছেলেমেয়েগুলোকে পড়াবে-টড়াবে।

রাখী শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, যা ভাল বোঝ কর, আমি কিছু বুঝি না।

নৃপেন হাসতে লাগল। তা নয়, কথাটা হচ্ছে—এমন সুনসান নিরিবিলি জায়গায় একা তোমার থাকাটা ঠিক নয়। দিনকাল খারাপ। কথাটা বুঝলে না?

বাসা বদলের দিন রাখী খুব ব্যস্ত হয়ে রানীকে খুঁজছিল। কিন্তু ঘাটের দিকে তাকিয়ে চোখ ব্যথা হয়ে যায়, রানীর পাত্তা নেই। বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ পুকুরপাড়ে জঙ্গলের ভেতর রানীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাখী হাত ইশারা করে বিদায় চাইল।

রানীও হাত নাড়ল দূর থেকে। মুখের হাসিটা করুণ মনে হচ্ছিল রাখীর ....

নতুন বাসায় গিয়ে রাখীর কিছুদিন খুব কষ্টে কাটল। ভিড়, অনেকটা রাত অব্দি হল্লা, আর খালি মোটরগাড়ির শব্দ সারাটা রাত। সে ঘুমোবার ভান করে মনের ভেতর দেখতে পায় সেই নিরিবিলি বাড়িটা, গাছপালা ঘেরা পুকুর, অন্য পাড়ে হলদে দোতলা বাড়ি, আর ঘাটে বসে থাকা রানীকে। রানীর সঙ্গে সে মনে মনে কত কথা বলে। কত সুখের কথা, কত দুঃখের কথা।

এক দুপুরে ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে বাসস্ট্যান্ডের দিক থেকে নৃপেন ভিজতে ভিজতে এসে বলল, তোমার বন্ধুকে নিয়ে এলুম সাঁইথিয়া থেকে। বাপের বাড়ি গিয়েছিল।

রাখী চমকে উঠে বলল, কে? রানী? কৈ, কোথায়?

নৃপেন হাসল। জামাইষষ্ঠী করতে গিয়েছিল দীপু। শ্বশুরবাড়ি থেকে একটা ছাতাও আদায় করে আনবি তো! বাস-অফিসের বারান্দায় বউকে বসিয়ে রেখেছে।

রাখী ব্যস্ত হয়ে বলল, কী লোক তুমি! ডেকে আনলে না কেন?

তোমার মাথা খারাপ? যা শুনেছিলুম, সত্যি। দেখলুম রিকশো ছাড়া এক পা হাঁটতে পারে না মেয়েটা। এই বৃষ্টিতে এখন রিকশোওলাদের গরজ প্রচণ্ড। দীপু ওদের আড়তে গেল জীপ আনতে। বোঝ অবস্থা।

রাখী একটা ছাতি নিয়ে দৌড়ুল। নৃপেন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাখী বাস অফিসের বারান্দায় গিয়ে দেখল, বেশ ভিড় জমে আছে বাসযাত্রীদের। তাদে ভেতর রানীকে সে খুঁজে পেল না। তাহলে জীপ এনে দীপু বউকে নিয়ে গেছে সম্ভবত।

কিন্তু রাখী চলে আসবে বলে ঘুরেছে, সেই সময় একটা জীপ এসে বারান্দা ঘেঁষে দাঁড়া একজন রোগা খেঁকুটে গড়নের ফুলবাবু যুবক লাফ দিয়ে নেমে একটা বাচ্চাকে কোলে তু নিল। তারপর বেঁটে মোটাসোটা একটি ঘোমটা ঢাকা মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ক এসো। শালা একে বিষ্টি, তার ওপর ...

বউটির একটা পায়ে গণ্ডগোল আছে। অনেক কষ্টে সে জীপে উঠল। বারন্দা থেকে কে বলল, দীপু জায়গা দে ভাই। বকুলতলার মোড়ে নামিয়ে দিয়ে যাবি।

রাখী নিঃসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। স্বপ্নের ভেতর হাঁটার মতন হেঁটে সে ঘরে ফিরে অজ্ঞান হয়ে গেল। নৃপেন তাকে দু হাতে ধরে না ফেললে তার মাথা ফেটে রক্তারক্তি হ যেত।

অশরীরী

ব্যাপারটা নিছক স্বপ্ন হতেও পারে—কিংবা সত্যি সত্যি ঘটেছিল, নাকি মনে মনে বানিয়ে মনে-মনেই বিশ্বাস করে বসে আছি, আমার পক্ষে এখন বলা বেশ কঠিন। শুধু জানি, স্বপ্নে হোক, এটা ঘটেছিল।

তখন আমার বয়স বড় জোর দশবছর। সে আমলের রেওয়াজ মতো প্রাথমিক বৃত্তিপরীক্ষা দিতে গেছি গ্রাম থেকে মহকুমা শহরে। এখনকার বিচারে ওটা শহর-টহর ছিল না নিতান্ত ইলেকট্রিফায়েড গ্রামনগরী। শহরের আনাচে-কানাচে বনজঙ্গল ছোঁক ছোঁক করত। শেয়াল ডাকত বাঘও হামলা করত কদাচিৎ। শহরের বেশির ভাগ লোকই খালি গায়ে ঘোরাফেরা করত। মাঝে মাঝে অবশ্য জমিদার কিংবা ইংরেজ কর্মচারী ফোর্ড হাঁকিয়ে হর্ন বাজিয়ে ভিড় হটাতে-হটাতে যাতায়াত করত। সেগুলো নিশ্চয় বড় হাস্যকর দৃশ্য ছিল। জনসাধারণকে তাক লাগাতে তাদের গোঁফগুলোয় কী পরিমাণ মোমের পালিশ দেওয়া হত তা আঁচ করা যায়।

পরীক্ষার শেষ দিন ছিল অঙ্ক। মৌখিক এবং লিখিত। মৌখিক হয়ে গেছে। স্কুলবাড়ি মাঠের ধারে শিরীষতলায় বসে অঙ্কের বই খুলেছি, হঠাৎ আমার সমবয়সী একটি ফ্রকপরা ফুটফুটে মেয়ে এসে বলল—রাজু তুই এখানে কী করছিস রে? এদিকে তোকে খুঁজতে খুঁজতে আমার পা ব্যথা। আয়, দাদু তোকে ডাকছে।

অবাক হয়ে বললুম—কে রাজু। আমি রাজু না।

মেয়েটি সে কথা গ্রাহ্যই করল না। আমার দিকে ঝুঁকে এসে অঙ্কের বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর চুল খামচে ধরে বলল—খুব তো ইয়ে হয়েছিস। তোর কারিকুরি ভাঙছি চল। সারাদিন কেবল পালিয়ে-পালিয়ে বেড়ানো। আয় বলছি।

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছিলুম। নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে বললুম—আঃ! কাকে কী বলছ? তোমার চোখ নেই? দেখতে পাচ্ছ না? আমি রাজু নই, মুকুল। বৃত্তি পরীক্ষা দিতে এসেছি।

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল। আমার চুল ছেড়ে দিয়ে বলল—কী চালাক হয়েছিস রে তুই! বৃত্তি পরীক্ষা না হাতি ? থাম, বলছি গিয়ে দাদুকে—রাজু এল না।

রাগে কোন কথা না বলে অঙ্কের বইটা কুড়িয়ে নিলুম। তারপর দেখলুম, মেয়েটি ভাঙা পাঁচিল গলিয়ে চলে গেল। এদিকটা নির্জন। একটু দূরে স্কুলের সামনে অজস্র ছেলেমেয়ের ভিড়। এক্ষুনি ঘণ্টা পড়বে। সেদিকে এগিয়ে গেলুম। কিন্তু ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত লাগল। মেয়েটি আমাকে ভুল করে রাজু ভেবে বসল কেন? বোঝা গেছে, রাজু নামে কোন ছেলে ওর ভাই-টাই হবে। কাজেই এমন ভুল হওয়া তো একেবারে অসম্ভব।

মনের ওই গোলমাল নিয়ে পরীক্ষাটা মোটেই ভাল হল না। সময়টা ছিল মার্চের শেষ। বিকেল পাঁচটায় পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে সোজা সেই শিরীষতলায় চলে গেলুম। ছোটমামা আমার ক্ষুদে গার্জেন। তাঁর সঙ্গে এসেছি। তাঁর চোখ এড়িয়ে যেতে হল।

এই যাওয়ার মানে একটাই, মেয়েটির সঙ্গে দেখা হওয়া। দেখা হলে জেনে নেব, কেন সে আমাকে রাজু বলে ভুল করল।

বিকেলের গোলাপি রোদ্দুর আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছিল। ফুলন্ত কৃষ্ণচূড়া আর শিমুলের মাথা পেরিয়ে একঝাঁক পাখি চেঁচাতে চেঁচাতে খালের ওপারে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। স্কুলবাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল। মাঠের ঘাসের ওপর হাল্কা ছায়ার কমল পাতা হল, যেন কেউ রাতে টানা ঘুম দেবার আয়োজন করছে। ছোটমামার কথা ভুলে গিয়ে শুধু সেই হলুদ ছিটের ফ্রকপরা মেয়েটির প্রতীক্ষা করছি তো করছি।

অথচ এই প্রতীক্ষাটা যে নিতান্ত বোকামি, তা টের পাচ্ছি না। আমার স্বভাবে খুব ছেলেবেলা থেকেই এক অন্ধ জেদ ছিল।

কিন্তু ওখানেই সে আবার কেন আসবে, তা ভেবে দেখছি না। শুধু মনে হচ্ছে, সে আসবে। এলে তাকে খুব রেগে ধমক দিয়ে বলব—তখন আমার চুল টেনে বড্ড অপমান করেছ। আমার মাথাটা এখনও ব্যথা করছে।

শীতের শেষে এইসব গাছপালা থেকে পাতা ঝরে পড়েছিল, তখনও তলায় জমে রয়েছে। ওপরে চিকন কচিপাতার গালে সন্ধ্যা এসে মায়ের মতো চুমু খাচ্ছে। হঠাৎ শুকনো পাতায় একটা চাপা শব্দ হল। চমকে উঠে দেখি, আশ্চর্য, এই মোটা গাছটার ওপাশে পাঁচিলের দিকে ঘুরে মেয়েটি সম্ভবত অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে। এইমাত্র একটু নড়ে দাঁড়াতেই শব্দটা উঠল। এবং আরও আশ্চর্য, সে নিঃশব্দে যেন কাঁদছে—ওপাশে ঘুরে আছে বলে শুধু তার কনুইটা বাঁকা হয়ে আছে অর্থাৎ চোখ কচলাচ্ছে, সেটুকু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

একটু ইতস্তত করে সোজা চলে গেলুম ওর কাছে। ও গ্রাহ্যই করল না। বললুম—কী হল? কান্নাকাটি করছ কেন?

মুখ ভেংচে মাথা নাড়া দিয়ে ও বলে উঠল—বেশ করছি তোর তাতে কী? আবার জ্বালাতে এলি কেন?

—তুমি যে তখন চুল খামচে দিলে! এবার আমি যদি .....

—ইস্! আয় না দেখি।

বলা যায় না, স্বভাব—ফের হামলা করবে ভেবে গম্ভীর হয়ে বললুম—আচ্ছা শোন। তুমি আমাকে রাজু ভাবলে কেন? রাজু কে?

সন্ধ্যার ধূসরতা গাছতলায় খানিকটা ঘন হয়েছে। আমার কথা শুনেই মেয়েটি যেন চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল। ওর রুক্ষ চুলের ঝালরের মধ্যে জ্বলজ্বলে দুটো চোখ দেখতে পেলুম। বেশ কিছুক্ষণ ওভাবে ওকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললুম—কী? এবার বিশ্বাস হচ্ছে তো? আমি তোমাদের রাজু নই। আমার নাম মুকুল!

ওর ঠোঁটদুটো কাঁপতে থাকল। ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল—সেই কুঞ্চন মুছে গেল তারপর

ঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে হু-হু করে কেঁদে উঠল আবার। কান্নার মধ্যে ওর বারবার 'না না না' নতে পাচ্ছিলুম। তারপর বিকেলের মতোই সে আচমকা দৌড়ে সেই ভাঙা পাঁচিল গলিয়ে লে গেল।

আমার অন্ধ জেদ বুনো ঘোড়ার মতো লাফ দিল। আমি ওকে অনুসরণ করলুম। ভবেছিলুম পাঁচিলের ওপাশে রাস্তা পড়বে। কিন্তু তার বদলে জঙ্গলে একটা জায়গায় পড়লুম। নে হল এটা একটা বাগান। অন্ধকার গাঢ় হয়েছে সেখানে। আবছা ওর ছুটে চলা চোখে ড়েছে। মরিয়া হয়ে দৌড়াচ্ছি। ওকে ধরা চাই-ই, এমন একটা ঝোঁক চেপে গেছে মাথায়।...

এখন ভাবলে সব টের পাই। কেন আমি ছুটে গিয়েছিলুম—কেনই বা অমন অন্ধ জেদ জগেছিল। টের পাওয়া মাত্র গা শিউরে ওঠে। তবে সে কথা পরে .....

বাগানের ওধারে একটা আলো দেখা যাচ্ছিল। খানিকটা এগিয়ে এগিয়ে দেখি, আলোটা কটা জানলা থেকে বেরচ্ছে। মেয়েটি আলোর দিকে যাচ্ছে না। বাঁদিকে দৌড়ে গিয়ে ন্ধকারে মিশে গেল। আমি সেখানে পৌঁছে দেখি, একটা দালান বাড়ি—দুর্গের মতো উঁচু। নে পড়ল, ওখানে একটা রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এবং মনে পড়া মাত্র খুব ভয় পেয়ে গলুম—নিছক ভুতের ভয়। তখন ডান দিকে আলোটার দিকে এগোলুম।

ঠিক এইসময় কোথায় যেন সেই মেয়েটির কণ্ঠস্বর শোনা গেল—রাজু! রাজু! রাজু!

কী করব ভাবছি, আমার গায়ে টর্চের আলো পড়ল। কে ভারিক্কি স্বরে বলে উঠল—কে খানে?

ভয়ে ভয়ে বললুম—আমি। আমি মুকুল। বনকাপাশিতে থাকি।

টর্চটা এগিয়ে এলে দেখি, গাড়ু হাতে এক বুড়ো বলল—এখানে কী করছ খোকা? কাদের াড়ি এসেছ তুমি?

—বৃত্তিপরীক্ষা দিতে এসেছি!

বুড়ো হো হো করে হেসে উঠল। —বৃত্তিপরীক্ষা দিচ্ছ এই সন্ধ্যাবেলা ভূতের আড্ডায়? শ্চয় পথ ভুল করেছ! কোথায় উঠেছ তুমি?

—ছোটমামার হোস্টেলে।

সে তো খালের ওপারে। চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি—

সে রাতে ঘুমটা ভাল হল না। নানারকম ভয় এবং ভালবাসার স্বপ্ন।

হ্যাঁ—ভালবাসা ছাড়া কী বলব? ওই বয়সে যেরকম ভালবাসা জাগে, তাই নিয়ে অনেক া ছেলেমেয়ের সঙ্গে কোথায় যেন যাচ্ছি। সেই মেয়েটিকে খুঁজছি—পাচ্ছি না। অথচ ওর ক শুনতে পাচ্ছি রাজু! রাজু! রাজু!

ঘুম ভেঙে দুঃখে আমার ছোট হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে। মনে মনে বলছি—কেন আমি রাজু য় জন্মাইনি পৃথিবীতে!

ছোটমামা আমার স্বপ্নের ব্যাপারটা টের পেয়ে ঘুমজড়ানো গলায় খুব ধমক চ্ছিলেন—তেলেভাজা খেয়ে পেট খারাপ হলেই ভূতের স্বপ্ন দেখে। খবর্দার, আর ওসব বিনে।.....

পরদিন সকালে গ্রামে ফিরে যাবার কথা। কিন্তু গেলুম না। ছোটমামাকে বললুম—ওবেলা যাব মামা। এবেলা একটু বেড়াব।

—কিন্তু সাবধান! পথ হারাসনে। আমি খুঁজতে যেতে পারব না বলে দিচ্ছি।

ছোটমামার কলেজের পরীক্ষা সামনের সপ্তাহে শুরু হবে। তাই পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত। আমি সকালেই বেরিয়ে পড়লুম।

প্রথমে সেই স্কুলবাড়িতে গেলুম। আজ একেবারে ফাঁকা সব। শিরীষতলায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পাঁচিল গলিয়ে বাগানে ঢুকলুম তারপর ঘুরতে ঘুরতে রাজবাড়ির কাছে গিয়ে পড়লুম। দিনের আলোয় জায়গাটা দেখে বোঝা গেল, কাল সন্ধ্যায় এমন জায়গায় আসাটা এক অসীম সাহসিক কীর্তির ব্যাপার হয়েছে। কোথাও কোথাও ভাঙা দেয়াল থেকে কড়িকাঠ ঝুলছে। ইটের স্তূপের ওপর আগাছার জঙ্গল গজিয়েছে। হলুদ আর শুকনো পাতার স্তূপ সরিয়ে কয়েকটা ছাতার পাখি পোকা বের করে খাচ্ছে। তারপর আমার চোখ গেল মন্দিরের পেছনে। খুশিতে মন নেচে উঠল। সেই মেয়েটি একই ফ্রক পরে পা ঝুলিয়ে বসে রয়েছে। আমার পায়ের শব্দে ঘুরেই হেসে উঠল।

ঠিক এইসময় উঠোনে খড়মের আওয়াজ হল। ঘুরে দেখি, লাল ধুতি আর ফতুয়া গায়ে একটা সন্ন্যাসী গোছের লোক ঢুকছে। তার একহাতে একগোছা শুকনো লকড়ি। অন্যহাতে একটা থলে। থলের মধ্যে তেলের শিশি উঁকি মারছে। তার চুল দাড়ি পেকে ভুট হয়েছে। আমাকে দেখে সেও থমকে দাঁড়াল। তারপর চোখ পিট পিট করে চেনার চেষ্টা করল যেন। তুমি কে খোকা? কোথায় থাকো?

—আমি মুকুল। বনকাপাশিতে থাকি। এসেছি বৃত্তিপরীক্ষা দিতে।

—মানত করতে এসেছ বুঝি? বেশ, বেশ। .....সন্ন্যাসী লোকটা হাসতে থাকল। মন্দিরের বারান্দায় উঠে জিনিসগুলো রেখে তারপর বলল—কত মানত করবে? এখানে এস। লজ্জার কী আছে? কত ছাত্র এসে মানত করে যায়। এস—কাছে এস।

মন্দিরের পিছনে, আশ্চর্য, মেয়েটি আর নেই। ওদিকে তাকাচ্ছি দেখে লোকটা বলল—ওখানে কী দেখছ খোকা! সাপটাপ নাকি? ভয় নেই। বাবার পোষা জীব।

আমি আস্তে বললুম—সাপ না। একটা মেয়ে।

সন্ন্যাসী লোকটা চমকে উঠে বলল—মেয়ে? কেমন মেয়ে?

—হলদে ছিটের ফ্রক পরা। ফর্সা রঙ। এক্ষুনি তো বসে ছিল।

সে হঠাৎ বিকট চেঁচিয়ে বলে উঠল—যাঃ! যাঃ! দূর! দূর!.... তারপর একটা লকড়ি নিয়ে সেদিকে দৌড়ে গেল। ফের গর্জন করে বলল—ফের যদি আসবি, মুণ্ডু চিবিয়ে খাব হারামজাদি, খবর্দার!

আচমকা ওর ওই বিকট মূর্তি আর লম্পঝম্প দেখে মনে হল, লোকটা ভাল নয়। সে ফের গর্জন করে উঠলে আমি ভয় পেয়ে পালিয়ে এলুম।.....

তিরিশ বছর পরে সেই শহরে গেছি ব্লক অফিসার হয়ে। সেই অদ্ভুত মেয়েটির কথা ভুলতে পারিনি। এতদিনে এখানে এসে স্মৃতিটা জোর নাড়া দিল। অনেক স্থানীয় ভদ্রলোককে

জিজ্ঞেস করেও ওর হদিস করা গেল না। শুধু এটুকু জানা গেল, রাজবাড়ির শিবমন্দিরে এক সেবায়েত থাকতেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছে অনেক বছর আগে। একজন বলল—শিবু ভট্টাচার্যের কথা বলছেন স্যার? তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। মন্দিরের পেছনে একটা কুঁড়ে বানিয়ে থাকতেন। তাঁর একটা নাতি আর নাতনী ছিল। নাম অ্যাদ্দিন বাদে আর মনে নেই। এটুকু মনে আছে, ভাইবোনে কোন গাছে পাখির ছানা পাড়তে উঠে প্রচণ্ড আছাড় খেয়ে ছিল। ফুসফুস ফেটে মারা যায়।

ভূতপ্রেতে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু যা ঘটেছিল, তার ব্যাখ্যা কী? কিছুদিন পরে আমার কোয়ার্টারে রান্নার কাজ করার জন্য এক প্রৌঢ়া এল। তার নাম জ্ঞানদা বামনী। সে কাজ করতে করতে হঠাৎ থেমে আমার বড় ছেলে পিণ্টুর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকত। আমার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলে জ্ঞানদা দীর্ঘশ্বাস ফেলত শুধু। কিছু বলত না। একদিন তাকে আমিই প্রশ্ন করে ফেললাম। জ্ঞানদা ম্লান হেসে বললে—আমাদের রাজু ঠিক এমনি ছিল দেখতে। অবিকল। তাই দেখি, বাবা।

—কে ছিল রাজু?

—আমার দাদার ছেলে। দাদা আর বউদি কলেরায় মারা গিয়েছিল। আমি তখন হরমপুরে থাকি। ছেলেমেয়ে দুটোকে কাছে এনে রাখতে চাইলুম, বাবা দিলেন না। সাধু সন্ন্যাসী লোক ছিলেন। ওখানে ভাঙা মন্দিরটা দেখেছেন তো বাবা? ওখানেই উনি থাকতেন। রাজু আর সাজু—ভাল নাম ছিল রাজেন্দ্র আর সন্ধ্যা—বড় দুষ্টু ছিল। ভাইবোনে ইস্কুল বাড়ির গাছে উঠেছিল খেলা করতে। পড়ে গিয়ে ......

সেই পুরনো অন্ধ জেদ আমাকে পেয়ে বসল। তক্ষুনি হনহন করে ব্লক প্রাঙ্গণ পেরিয়ে খাল পেরিয়ে পোড়ো রাজবাড়ির দিকে চললুম—নিশি পাওয়া মানুষের মতো।

ইস্কুলবাড়ির চেহারা বদলেছে। সেই শিরীষটা আর নেই। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মন্দিরটা খুঁজে পেলুম একসময়। নির্জন বনভূমিতে দুপুরবেলায় শান্তিময় স্তব্ধতা। কিছু পাখির ডাক। বাতাসের হঠাৎ দু'একটা আলোড়ন। আমার হৃদয়ের সেই পুরানো ক্ষতটা টনটন করে উঠল। মনে মনে বারবার মিনতি করলুম—সন্ধ্যা! একবার দেখা দাও—শুধু একটি বার।

ফিসফিস করে উঠল কেউ কোথায় কোন গাছের আড়ালে—রাজু! রাজু! রাজু!

চেঁচিয়ে বলতে যাচ্ছিলুম—সন্ধ্যা! আমি এসেছি! কিন্তু এখন আমার বয়স চল্লিশ। আমি দায়িত্বভারি ব্লক অফিসার। চুপ করে গেলুম। ফিসফিস ডাকটা আমার চারপাশে ঘুরতে থাকল। তিরিশ বছর আগের এক বালিকার বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর হয়ে তিরিশ বছর আগের এক বালককে আঁকড়ে ধরল। থরথর করে কেঁপে উঠলুম।......

জীবনের ওপারে

আগের দিন বইমেলায় গিয়ে একটা দোকানে বইটা আবিষ্কার করে চমকে উঠেছিল মিতা। সম্প্রতি একটা বিদেশী পত্রিকায় বইটার আলোচনা পড়েছিল। খুব আগ্রহ জেগেছিল। কলকাতার বইমেলার সেই বই দেখতে পাবে, এমন আশা করেনি। কারণ বইটা পুরনো। দুষ্প্রাপ্য বললেই চলে। সতের শতকে ইতালির এক আশ্চর্য ক্ষমতাশালিনী মহিলা অ্যানা বিয়াত্রের আত্মজীবনী 'বিয়ন্ড দা লাইফ' অর্থাৎ জীবনের ওপারে।

জীবনের ওপারে কী আছে, তাই নিয়ে ইদানীং মিতার ভাবনা। ঋকের অ্যাকসিডেন্টে মৃত্যুর পর থেকে এই ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছে। কদিন পরেই ঋকের সঙ্গে তার সামাজিক মিলন ঘটত। মিতা নিশ্চয় সুখী হত। সেই সুখ তার হাতের নাগাল থেকে সরে গেল। তারপর থেকে মিতা শুধু মৃত্যুর দিকে ভয়ে বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে।

ঋক তাকে এবং সে ঋককে পাগলের মতো ভালবাসত। মৃত্যু ভালবাসার ওপর বিশাল ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে গেল। তবু ভালবাসার চাইতে ভালবাসার স্মৃতি বড় যন্ত্রণা দেয়। মিতার ভেতর সেই গোপন যন্ত্রণা।

বই কিনবে বলে মিতা বইমেলায় যায়নি। কিছুতে মন বসে না, কিছু ভাল লাগে না, তাই অফিসের ছুটির পর অস্থির হয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। অ্যানা বিয়াত্রের 'বিয়ন্ড দা লাইফ'-এর একটা কপি একপাশে কিছু ঝড়তি-পড়তি পুরনো বইয়ের ভেতর পড়েছিল। দামও তত-কিছু বেশি নয়। কিন্তু মিতার সঙ্গে সে-টাকাও ছিল না।

সে সারামেলা ঘুরে চেনা কাউকে দেখতে পায়নি যে টাকা ধার নিয়ে বইটা কিনবে। হতাশ হয়ে সেলসম্যানকে বলেছিল, বইটা যদি দয়া করে রাখেন কাল আমি নেব।

সেলসম্যানটি কেমন বদমেজাজী যেন। বলেছিল, যখন নেবেন, তখন নেবেন। দশটাকা অ্যাডভান্স করে যান তাহলে। নৈলে গ্যারান্টি দিতে পারব না।

মিতা বলেছিল, সঙ্গে টাকা থাকলে অ্যাডভান্স করতুম! প্লিজ, যদি বইটা ....

লোকটা হাতমুখ নেড়ে বলেছিল, গ্যারান্টি দিতে পারব না। বললুম তো!

পরদিন মিতা মেলার দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গেই আসবে ভেবেছিল। কিন্তু একটা জরুরি কাজে অফিসে আটকে গেল। বেরুতে সাড়ে পাঁচটা বাজে প্রায়। তারপর ডালহৌসিপাড়া থেকে বাস ধরে বইমেলায় আসতে একটা ঘণ্টা লেগে গেল। টিকিটের বিরাট লাইন। যখন সে মেলার ভেতর ঢুকল, তখন চারদিকে আলো ঝলমল করছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে সেই দোকানে ঢুকে পুরনো বইয়ের ঝাঁকে সে হাতড়াতে থাকল। কিন্তু কোথায় সেই বই? পাশের সেই সেলসম্যানকে জিগ্যেস করলে সে হাসল। বলেছিলুম না দিদি গ্যারান্টি দিতে পারব না? এসব বইয়ের খদ্দেরের অভাব হয় না কোনো সময়।

হতাশ হয়ে মিতা বেরিয়ে আসছে, হঠাৎ ক্যাশকাউন্টারের দিকে চোখ গেল। প্রৌঢ় ঢ্যাঙা
নের এক ভদ্রলোক সেখানে দাঁড়িয়ে দাম মেটাচ্ছেন। তাঁর হাতে সেই 'বিয়ন্ড দা লাইফ।'
মিতা মুখে ব্যাকুলতা ফুটিয়ে বলল, যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলব?
ভদ্রলোক ঘুরে তার দিকে তাকালেন। কিছু বলছেন?
মিতা বলল, দেখুন—এই বইটা আমি কাল দেখে গিয়েছিলুম। সঙ্গে টাকা ছিল না বলে
তে পারিনি। আমার ভীষণ দরকার ছিল বইটা। আপনি যদি প্লিজ ওটা আমাকে ....
ভদ্রলোক নিষ্পলকচোখে তাকিয়ে কথা শুনেছিলেন। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিয়ে
লেন, ক্ষমা করবেন। বইটা আমারও ভীষণ দরকার। হয়তো আপনার চেয়ে বেশি দরকার।
তারপর উনি দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন। মিতাও বেরুল। ভিড়ের ভিতর ভদ্রলোক
চেয়ে ঢ্যাঙা। মাথায় একরাশ কাঁচা-পাকা চুল। পরনে শাদা ধুতি-পাঞ্জাবি। গোঁফ-দাড়ি
ার কামানো। মিতা হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে ওঁর চলে যাওয়া দেখছিল।
একটু পরে ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন। তারপর এদিকে ঘুরে যেন মিতাকেই দেখলেন।
খ আলো পড়েছে ওঁর। চকচক করছে চোখ দুটো। মিতা একটু অস্বস্তি টের পেল।
লোক তার কাছে এসে চাপা গলায় বললেন, বইটা কি আপনার সত্যি দরকার?
মিতা সঙ্গে সঙ্গে আশান্বিত হয়ে উঠল। বলল, হ্যাঁ—ভীষণ, ভীষণ দরকার।
কেন?
মিতা এ প্রশ্নের জবাবে কী বলবে ভেবে পেল না। আস্তে বলল, ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছিল।
ভদ্রলোক একটু হাসলেন। .... আপনি তো এখন যথেষ্ট ইয়ং। এ বয়সে মৃত্যুর
রের—মানে জীবনের ওধারে কী আছে জানবার এত কৌতূহল কেন?
মিতা একবার তাকিয়ে মুখটা নামাল তেমনি আস্তে বলল, জানতে ইচ্ছে করে।
ভদ্রলোক বললেন, আপনার সামনে এখনও বিরাট জীবন—প্রচুর সম্ভাবনা। মৃত্যুর দিকে
নোর সময় হয়নি। আমার কথা অবশ্য আলাদা। জীবনের অনেকটাই আমার দেখা হয়ে
! তাছাড়া ইদানীং আমি জীবনের ওধারের জিনিসগুলোও দেখতে পাই। আরও ভাল করে
ত চাই, বুঝতে চাই বলেই অ্যানা বিয়াত্রের শরণ নিচ্ছি।
মিতা মুখ তুলে বলল, অ্যানা বিয়াত্রের কথা আপনি জানেন?
জানি। ভদ্রলোক গাঢ়স্বরে বললেন। অ্যানা আপনার মতো বয়সে এক দুর্ঘটনায় মারা যান।
কবর দেওয়া হয়। একবছর পরে অ্যানা কফিন থেকে বেরিয়ে আসেন।
মিতা বলল, হুঁ, একটা পত্রিকায় পড়েছি।
বইটা অ্যানার সেই একবছরের অভিজ্ঞতা। পঞ্চাশবছর আগেকার ইংরেজি এডিশান
বইটা। ভদ্রলোক বইটার ওপর হাত বুলিয়ে হাসতে লাগলেন। জানি না, কী সেই
জ্ঞতা। আমার দেখার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাই। কিন্তু .... আপনার নামটা জানতে পারি

তা নাম বলল।
দ্রলোক বললেন, আমার নামটা জানিয়ে দিই। পি কে চৌধুরী। কিন্তু এ বইয়ে কেন
ার আগ্রহ বললেন না তো?

মিতা আসল কথাটা বলতে পারল না। শুধু বলল, এমনি। জানতে ইচ্ছে করে।

তাদের চারপাশে ভিড় চলমান। ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে তারা কথা বলছিল, কিন্তু কে
লক্ষ্য করছিল না তাদের। ভদ্রলোক পকেটে হাত ভরে একটা কার্ড বের করে বললেন, কার্ড
রাখুন। বইটা আমার পড়া হলে আপনাকে ধার দিতে পারি—যদি যোগাযোগ করেন। এ
কার্ডে আমার ঠিকানা রইল।

মিতা আগ্রহ করে কার্ডটি নিল। বলল, কবে নাগাদ যোগাযোগ করব?

দিন দুই পরে। অবশ্য আমার টেলিফোন নেই।

মিতা আস্তে বলল, ঠিক আছে। আমি যাব। আপনি কখন থাকেন বাড়িতে?

ভদ্রলোক হাসলেন। সবসময় থাকি। বলে উনি হঠাৎ হন হন করে এগিয়ে গেলেন ভিড়ে
ভেতর। মিতা কার্ডটা আলোয় ভাল করে একবার দেখে নিয়েই হ্যান্ডব্যাগে রেখে দিল। প
কলকাতার ঠিকানা। রাস্তাটা তার চেনা। তাছাড়া ভদ্রলোক সম্পর্কে তার কৌতূহল জেগে
উনি নিশ্চয় পরলোক বা প্রেতচর্চা করেন। তা না হলে কেন বলবেন, 'ইদানীং জীবনে
ওধারের জিনিসগুলোও দেখতে পাই।

মিতা ঠিক করল সে যাবে। একটু পরে অন্যমনস্কভাবে সে যখন মেলায় ঘুরতে ঘুর
এককাপ কফির তৃষ্ণায় পা বাড়াচ্ছে, আবার সেই ভদ্রলোক—পি কে চৌধুরীকে দেখতে পে
একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। ওখানে আলো কম। শাদা চুল, শাদা পোশাক আর দুটি চকচ
চোখ। কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগল মিতার। কফির কাপে চুমুক দিয়ে আবার যখন
ওদিকে তাকাল, ভদ্রলোককে আর দেখতে পেল না ....

দুদিন পরে অস্থির মিতা পি কে চৌধুরীর বাড়ি গেল অফিস থেকে বেরিয়ে। চারটে
বেরিয়েছিল। জ্যামে আটকে গিয়ে সে এক অবস্থা। সন্ধ্যার আগেই গিয়ে বইটা নিয়ে চ
আসা দরকার। কিন্তু কিছুতেই জ্যামজট ছাড়ার লক্ষণ নেই।

আসলে মিতার মাথায় কী এক নেশা ভর করেছিল যেন। সেই রাস্তায় পৌঁছুল যখন, ত
সবে আলো জ্বলে উঠেছে ল্যাম্পপোস্টে। নম্বর খুঁজে বাড়িটা বের করতেও একটু স
লাগল।

গেটের ভেতর ঢুকে একটা খোয়াভরা লম্বা রাস্তা। সামনে গাড়িবারান্দা। কেমন থমথ
পরিবেশ। উঁচু প্রকাণ্ড বাড়িটার কোথাও একটু আলো নেই। থমকে দাঁড়িয়ে মিতা অস্বস্তি
এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, সেইসময় ওপরের একটা জানালা খুলে গেল। সেই জানালায় পি
চৌধুরীর মুখ।

মিতা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ডাকল, মিঃ চৌধুরী।

ভদ্রলোক হাতটা নাড়লেন। তারপর জানালা থেকে অদৃশ্য হলেন। মিতা অপেক্ষা কর
থাকল। সে ভাবছিল, এতবড় বাড়িতে কেন আলো নেই? কেনই বা লোকজন নেই? অস্বস্তি
বাড়ছিল। এইসব চারিদিকে ঘুরে দেখে টের পেল, আসলে লোডশেডিং চলছে এলাকা
অতটা লক্ষ্য করেনি গেটে ঢোকার সময়।

কিন্তু পি কে চৌধুরীর নেমে আসতে বড্ড বেশি দেরি হচ্ছে। গাড়িবারান্দার ওখানে ঘন ন্ধকার জমে আছে। দু পা এগিয়ে মিতা আবার ডাকল, মিঃ চৌধুরী!

বাড়ির ভেতর কেমন একটা শনশন শব্দ হচ্ছে যেন, এতক্ষণে কানে এল মিতার। এবার ার ভয় করতে থাকল। সে একটু গলা চড়িয়ে ডাকল এবার, মিঃ চৌধুরী!

অমনি গাড়িবারান্দার অন্ধকার অংশ থেকে কেউ ফিসফিস করে বলে উঠল, মিতা! মিতা! গগির পালিয়ে যাও এখান থেকে। বিপদে পড়বে!

মিতার বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। সে কাঁপাকাঁপা গলায় আবার মিঃ চৌধুরীকে ডাকার ষ্টা করল। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার মনে হল, অন্ধকার থেকে কী একটা বেরিয়ে এসে তাকে লে দিচ্ছে। তারপর তার মুখের ওপর শ্বাসপ্রশ্বাসের ঝাপটানি টের পেল। ফিসফিস করে াবার কেউ তাকে বলতে লাগল, আঃ! করছ কী? পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও!

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মিতা পা বাড়াল। হাঁপাতে হাঁপাতে কোনক্রমে গেটের বাইরে াঁছল সে। রাস্তায় আবছা অন্ধকার। এদিকে ওদিকে দু-একটা মাত্র পান-সিগারেটের াকান—সেখানে মোম জ্বলছে। ছায়ামূর্তির মতো লোকজন যাতায়াত করছে। আলোকিত াড়ের দিকে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মিতা চমকে উঠল; তাকে সাবধান করে দিচ্ছিল কে? খুবই না কণ্ঠস্বর। তাহলে কি ঋক তাকে সাবধান করে দিতে এসেছিল? তার পেছনে পেছনে ঋক সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায়?

চোখ ফেটে জল আসছিল মিতার। আলোর অংশে পৌঁছে সে স্থির হয়ে দাঁড়াল। গাগোড়া ব্যাপারটা ভাবতে লাগল। এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হল জীবনে। এই ঘটনার কথা উকে বলতে পারবে না—কারণ কেউ বিশ্বাস করবে না।

কিন্তু আরও একটু বিস্ময় অপেক্ষা করছিল মিতার জন্য। কদিন পরে কী খেয়ালে সে ার বইমেলায় গিয়েছিল। সেই দোকানে ঢুকে অ্যানা বিয়াত্রের 'বিয়ন্ড দা লাইফ' আবিষ্কার র মিতা অবাক। আরেকটা কপি নাকি? কিন্তু সেলসম্যানটি একগাল হেসে বলল, এসব য়ের খদ্দের নেই, দিদি। নিয়ে যান। দাম কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ....

সাদা মোটরগাড়ি

আদিনাথ জানলার ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, ওই যাচ্ছে! দেখে যা, দেখে যা!'

সন্তু, বাদল আর আমি মেঝেয় বসে তাসের ব্রে খেলছিলাম। চমকে উঠে মুখ তুল দেখলাম আদিনাথের ঠোঁটে কামড়ে ধরা সিগারেট থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে দুটো হাত জানলার রডে চেপে ভাঁটার মতো চোখ করে কিছু দেখছে।

সন্তু মুখ নামিয়ে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলল, 'শালা, এখানে এসে খালি ভূত দেখছে! ছা

বাদল আর আমি উঠে গিয়ে আদিনাথের পাশে দাঁড়ালাম। বাদল বলল, 'কই রে?'

আদিনাথ অস্ফুট স্বরে বলল, 'আশ্চর্য! এই তো দেখছিলাম!'

বাদল খাপ্পা হয়ে বলল, 'তোর মাইরি মাথার ভেতর একটা সাদা গাড়ি ঢুকে বসে আচ্ছা এঁদো, তোর সিগারেটটা দে তো টেনে দেখি। নিশ্চয় ওর ভেতর গাঁজা পোরা অ

আদিনাথ কোনো কথা বলল না। তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। অস্বাভাবিক চাউনিতে সে একটা ভুতুড়ে সাদা মোটরগাড়ি খুঁজতে থাকল।

দু'দিন এসেছি আমরা এই চোরডিহা বাংলোতে। কাল ঠিক সন্ধ্যার আগে রুক্ষ বাঁজ বিশাল মাঠে আদিনাথ নাকি ওই গাড়িটাকে ধুলো উড়িয়ে যেতে দেখেছিল। গাড়িটা ওপাশে টিলাপাহাড়গুলোর ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায়। বাংলোর এই জানলা থেকে সামনা সেই মাঠটা দেখা যায়। বাঁদিকে কিছুটা দূরে একটা রেললাইন। সেটা চলে গেছে গয়ার ডাইনে কাছাকাছি একটা ছোট্ট নদী। শীতের শেষে তার জল প্রায় শুকিয়ে গেছে। বুকের অসংখ্য পাথর জেগে উঠেছে। আমি, বাদল আর সন্তু যখন সেই পাথরে বসে গল্প করছি তখন আদিনাথ পাড়ে দাঁড়িয়ে সেই গাড়িটা দেখতে পেয়েছিল।

মোটরগাড়ি যাওয়াটা কোনো আশ্চর্য ব্যাপার নয়। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, যেদিকে গ আদিনাথ দেখেছে, সেদিকে অন্তত দশ মাইলের মধ্যে কোনো রাস্তাই নেই। রুক্ষ খানাখন্দ, আগাছার জঙ্গল—তারপর ছোটছোট সব পাহাড়। ছোটনাগপুর পর্বতমালার শাখা এদিকে বেরিয়ে এসেছে।

আদিনাথ আজ সকালে ফের সেই গাড়িটা দেখার কথা বললে বাদল চৌকিদারকে আনল কিচেন থেকে। চৌকিদারের নাম তোতিরাম। পেল্লায় গড়নের লোক। ভাঙাভাঙা বলতে পারে। সেলাম জানিয়ে বলল, 'বলুন স্যার, কী বোলবেন।'

সন্তু বাঁকা মুখে তাসগুলো গুছিয়ে শাফ্ল করছিল। বলল, 'কারিয়া পিরেত বা।'

বাদল ও আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। বললাম, 'চৌকিদার পোরশুরাম পড় তবে মনে হচ্ছে এটাই সেই ভূশণ্ডীর মাঠ।'

চৌকিদার বাঙালি বাবুদের ব্যাপার-স্যাপার বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

বাদল বলল, 'দেখো—উও মাঠমে বড়বাবু হরবখত একঠো মোট্রগাড়ি দেখতা। তো .....'

চৌকিদার অবাক হয়ে বলল, 'মোট্রগাড়ি?'

'হ্যাঁ। সাদা মোটরগাড়ি' বাদল বলল। 'সাঁ সাঁ কারকে ভাগ্‌তা ঔর অদৃশ্য হোতা!'

সন্তু মুখ টিপে হেসে বলল, 'বহৎ ধুলোভি উড়াতা! না রে এঁদো?'

আদিনাথকে অন্যরা কখনও-সখনও এঁদো বলে ডাকে। গত অঘ্রাণে বিয়ে করে সে একটু রাশভারি হয়ে গেছে। জানলার ধার থেকে সরে এসে বলল, 'তোরা মাইরি বিশ্বাস করছিস না। কী যে বলব তোদের! আচ্ছা চৌকিদার, ওই হিলগুলোর কাছে রাস্তা-টাস্তা নিশ্চয় কুছ্‌ হ্যায়। তাই না?'

আমাদের হিন্দি জ্ঞানের নমুনা দেখা চৌকিদার ভড়কানোর পাত্র নয়। এই বাংলোয় মাঝে-মাঝ বাঙ্গালীবাবুরা এসে থাকেন। তার বাঙালি সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকা স্বাভাবিক। সে একটু হেসে বলল, 'রাস্তা-উস্তা তো কুছু নাই স্যার। তবে মোটরগাড়ির কোথা বোলছেন, একঠো গাড়ি মুনমুনিয়া গাঁওমে মুজম্মল খাঁয়ের আছে। নও-দশ কোশ দূরে জঙ্গলকা কিনারেমে। চোরডিহার আসলি জঙ্গল তো উধার। মুজম্মল খাঁয়ের কাঠের কারবার আছে। মালুম, খাঁ-সহাবকা মোটরগাড়ি।'

আদিনাথ সন্দিগ্ধভাবে বলল, 'গাড়িটা কি সাদা রঙের?'

চৌকিদার তোতিরাম গোঁফ চুলে ভাবিত মুখে বলল, 'মোনে তো না আছে স্যার। সাদাভি হোবে।'

সন্তু বলল, 'ব্যস! হল তো? রহস্যের মুণ্ডুতে ঘ্যাচাং কোপ পড়ল।'

চৌকিদার চলে গেল। আদিনাথ বলল, 'অলরাইট। আই মাস্ট ইনভেস্টিগেট।'

সে খাটের মশারি-স্ট্যান্ডে ঝোলানো প্যান্ট-শার্ট টেনে নিল। পাজামা ও পানজাবি খুলে ফেলল ঝটপট। বাদল বলল, 'তুই সত্যি যাচ্ছিস? মারা পড়বি এঁদো। বউকে এত শিগ্‌গির বিধবা করিস নে বলে দিচ্ছি!'

আদিনাথ প্যান্ট-শার্ট পরে মাথায় সান-ক্যাপ পরল। চোখে সান-গ্লাসও পরল। তারপর আমাদের দিকে ঘুরে বলল, 'তোরা কেউ যাবি আমার সঙ্গে?'

বাদল রাগ করে বলল, এ বেলা আমাদের চোরডিহা হাটে যাবার কথা না?'

আদিনাথের মুখে একটা মরিয়াপনার ছাপ ফুটে উঠল। সে বলল, আমার কাছে তার চেয়ে একটা সাদা গাড়ি ভীষণ জরুরি।'

সন্তু তাস রেখে উঠে দাঁড়াল। কোমরে দু'হাত রেখে ফিল্মের ভিলেনের ভঙ্গিতে বলল, 'গাড়িটা কি তোর শ্বশুরের ভেবেছিস নাকি যে জামাইকে দেখে তুলে নেবে। শুনলি না কোন খাঁ সায়েবের গাড়ি বলল?'

আদিনাথ কোনো কথায় কান করল না। সে বেরিয়ে গেল।

সন্তু তার কিটব্যাগ খুলে ব্রান্ডির বোতলটা বের করে হাসতে হাসতে বারান্দায় গেল তারপর বোতলটা তুলে চেঁচিয়ে আদিনাথের উদ্দেশে বলল, 'যাবার আগে একটু স্ট্রেন্থ নিয়ে যা এঁদো!'

আদিনাথ বাংলোর এই টিলা বেয়ে হনহন করে নেমে যাচ্ছিল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমরা অনেকক্ষণ ধরে তার যাওয়া দেখলাম। কাছিমের গোলের মতো বিস্তীর্ণ ন্যাড়া মাঠ পেরিয়ে সে যখন পলাশবনটায় ঢুকল, তখন তার ধূসর টুপিটা দেখা যাচ্ছিল। সবে পলাশ ফুলের মরশুম শুরু হয়েছে। দাগড়া-দাগড়া লাল ঝলমল করছে রোদে তার ভেতর আদিনাথ ক্রমশ মিলিয়ে গেল।

বাদল বলল, 'আদিনাথটা বরাবর এরকম একরোখা কেন বল তো?'

সন্তু ব্রান্ডির বোতলে চুমুক দিয়ে ঘরে চলে গেল। আদিনাথ এরকম একরোখা তা জানি কিন্তু কোথায় একটা সাদা মোটরগাড়ি দেখেছে—তা তদন্ত করে দেখার যোগ্য কেন মনে করল, বুঝতে পারছিলাম না। এমন তো হতে পারে, গাড়ি যদি মুনমুনিয়া গাঁয়ের কাঠগোলার মালিক মুজম্মল খাঁয়ের নাও হয়—কারা বেড়াতে এসেছে বাইরে থেকে এবং ইচ্ছে করে মাঠবনবাদাড় চষে বেড়াচ্ছে। মাতালের দল হওয়া বিচিত্র নয়। আমাদের সঙ্গে গাড়ি থাকলে আমরাও কি তাই করতাম না?

চোরডিহা স্টেশন থেকে একটা কাঁচা এবড়োখেবড়ো রাস্তায় মাইল চার এলে এই ফরেস্ট বাংলো। এ রাস্তাটা বাংলোর পেছন দিকে এবং জিপে করে আসা যায়। সরকারি লোকেরা জিপে চেপেই আসে এখানে। চৌকিদারের কাছে শুনেছি, মাঝে মাঝে শিকারীরাও আসে জঙ্গলে শিকার করতে। আসলে জঙ্গলটা বেশ দূরে অবশ্য। একসময় নাকি সামনে দক্ষিণে ওই মাঠ আর আগাছার জঙ্গল সত্যিকার জঙ্গলে ভরা ছিল। উঁচু শালবন ছিল। কালক্রমে উচ্ছেদ করে ফেলেছে লোকেরা। মাটি ন্যাড়া হয়ে গেছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। বন দফতর আবার সেখানে গাছ পোঁতার প্ল্যান করেছে।

বাদল উদ্বিগ্নমুখে তাকিয়ে আছে দেখে বললাম, 'ছেড়ে দে। ওর মাথায় ভূত ঢুকেছে।'

ভেতরে এসে আমরা পোশাক বদলে ফেললাম। তারপর চৌকিদারকে বলে গেলাম আদিনাথ ফিরলে যেন তাকে চোরডিহা চলে যেতে বলে। কারণ আমরা সেখানে বিকেল অব্দি থাকব। সন্ধ্যার মুখে মুরগি কিনে নিয়ে ফিরব।........

চোরডিহায় আদিবাসী পুরুষ ও মেয়েরা মহুয়ার মদ খেয়ে নাচে-গায়। মুরগি বেচে। পুঁতি মালা, ঝুড়ি, কাঠ, বনজ ফলমূল বেচতে আসে। দূর-দূরান্তের শহুরে বাবুরাও বেড়াতে আসে বেশির ভাগই বাঙালি। খনি এলাকার চাকুরে।

হাটের শেষ দিকটায় একটা বিশাল মেহগনি গাছের ছায়ায় বসে আমরা বোতলেভরা সভ্য চেহারার রঙিন মহুয়া পান করলাম। বাদলটা ঝটপট মাতাল হয়ে যায়। তাকে সামলাচ্ছিল। একটু তফাতে বসে কয়েকটি আদিবাসী মেয়ে শালপাতার ঠোঙায় হাঁড়িয়া পান করছিল। বাদল বেচাল করবে ভেবে বারবার তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম, আজকে

বাসীদের আত্মসম্মান বোধ ভীষণ জেগেছে। রাজনৈতিক আন্দোলন করছে তারা। ান, ওদের দিকে নজর দেবে না বা কোনো মন্তব্য করবে না।

ূর্য একটু গড়াল পশ্চিমে তখন গাছের ছায়ায় তিনজনে শুয়ে পড়লাম। সেই ঘুম ভাঙল , তখন রোদ কমে গেছে। ক্ষিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে।

ভাঙা হাটে তাড়াহুড়ো দরদস্তুর না করেই দুটো মুরগি কেনা হল। একটা চটের থলেও তে হল মুরগি দুটোকে আনার জন্য। হতভাগ্য মুরগিদ্বয় সারাপথ থলের ভেতর মুখ বুজে । বাদল তো থলে ছুঁলেই আঁতকে ওঠে। তার ফলে আমাকে আর সন্তুকে পালা করে ত হল।

বাংলোর কাছাকাছি গিয়ে এতক্ষণে আমাদের আদিনাথের কথা মনে পড়ল। সন্তু বলল, া নির্ঘাৎ চৌকিদারের ভাত-রুটি মেরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। এবেলা তো আমাদের রাঁধার কথা ছিল না।'

বাদল তখনও টলছে। বলল, 'কী হারাল জানে না এঁদো! ওঃ, কী দিনটা গেল মাইরি।'

গেটের কাছে পৌঁছে সন্তুর গতি বেড়ে গেল। 'চৌকিদার! চৌকিদার! কাঁহা হ্যায় তুম? আও! দো মুরগি লায়া দেখো!' বলে সে চেঁচাতে চেঁচাতে লন পেরিয়ে শেষ দিকটায় গেল। ওদিকে কিচেন। তার পাশে চৌকিদার তোতিরামের ঘর।

বাদল লনে পেতে রাখা বেতের চেয়ারে বসে চেঁচিয়ে বলল, 'সন্তু। কড়া চা বলে দে। চা।

আমি বারান্দায় এগিয়ে দেখি, দরজাটা ভেজানো। যা ভেবেছিলাম, তাই। আদিনাথ এখনও ছে। কিন্তু গায়ে কম্বল মুড়ি দিয়েছে কেন বুঝলাম না। এখানে মাঝরাতের পর এখনও লাগে। শেষরাতে শীতটা আরও জোরালো হয়। তাই বলে দিনের বেলায় মুড়ি দেবার ওঠে না।

াকলাম, 'আদিনাথ! এই এঁদো!'

আদিনাথের মুখটা কম্বলের বাইরে ছিল। সে একবার তাকিয়েই চোখ বুজল। ওর চোখ চমকে উঠলাম লাল চোখ। কাছে গিয়ে বললাম, 'কী রে? জ্বর-টর নাকি?'

কপালে হাত রেখে টের পেলাম জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। বললাম 'জ্বর বাধিয়েছ তাহলে? বারণ াম রোদে অমন করে বেরিও না। নাও, এখন বোঝো ঠ্যালা!'

আদিনাথ চোখ বুজে রেখেই কেমন হেসে বলল, 'হাটে গিয়েছিলি তোরা?'

হ্যাঁ। তুই ফিরলি কখন?'

দুপুরে।'

হাসতে হাসতে বললাম, 'শ্বশুরের সাদা মোটরগাড়ির পাত্তা পেলি?'

আদিনাথ জবাব দিল না। তখন তাকে একটু ঠেলে দিয়ে ফের বললাম, 'কি রে? কথা স না কেন?'

আদিনাথ এবার চোখ খুলল। অসম্ভব লাল চোখ। আস্তে বলল, 'কী?'

মোটরগাড়ি!'

আদিনাথ সেই অদ্ভুত ভঙ্গিতে একটু হাসল। 'জীবনে এত সুন্দর সাদা গাড়ি আমি দে জানিস? অথচ গাড়িটা যখন চলে, কোনো শব্দ হয় না। একেবারে নিঃশব্দ। তাছাড়া চাকার কোনো দাগই পড়ে না। যেন শূন্যে ভেসে বেড়ায়।'

'কী আবোল-তাবোল ডিলিরিয়াম বকছিস জ্বরের ঘোরে? থাম্, একটু ট্যাবলেট দিই'

আদিনাথ গরম হাতে আমার হাত ধরল। 'থাক্। গাড়িটার কথা শোন।'

এবার আদিনাথ যেন সত্যি জ্বরের ঘোরে ভুল বকতে শুরু করল। অসংলগ্ন কী সব সে গলার ভেতর জড়িয়ে-মড়িয়ে বলছিল, একবর্ণও বুঝলাম না। তখন বাদলকে ডাক সন্তুও এসে গেল। আমরা দেখলাম, আদিনাথ চোখ বুজে বিড়বিড় করতে করতে হাত মুঠো করছে মাঝে মাঝে এবং তার পা দুটোও নড়ে উঠছে। আমি তো ভীষণ ভয় গেলাম।

সন্তু উদ্বিগ্নমুখে বলল, 'এটা সেই ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া না কী যেন বলে, তাই তো?'

বাদল গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু তড়কা।'

সন্তু বলল, 'ধুর বোকা! তড়কা তো বাচ্চাদের হয়!'

'এটা বাজে তর্কাতর্কির সময় নয়। সন্তু, শিগগির এক বালতি জল আর মগ নিয়ে ওর মাথাটা ধুয়ে দেওয়া দরকার।' বলে সন্তুকে তাড়া দিলাম।'

সন্তু জল নিয়ে এল। আদিনাথের মাথাটা বালিশের ওধারে ঝুলিয়ে জল ঢালতে করলাম। মেঝেয় জলের বান ডাকছিল। চৌকিদার জলটার ব্যবস্থা করবে। এ বিপদের মেঝে নিয়ে ভাববার অবকাশ নেই।

একটা রুমাল ভিজিয়ে আদিনাথের মাথায় জলপটিও দেওয়া হল। চৌকিদার তখন ও মুরগি নিয়ে ব্যস্ত। ওর কাছে গিয়ে ব্যাপারটা জানিয়ে বললাম, 'নজদিগমে কৈ ডগদার গা তোতিরাম?'

তোতিরাম হতাশভাবে মাথা দুলিয়ে বলল, 'নজদিগমে তো নাই আছে স্যার! মুনমুনিয়া যাতে পারলে ডাগদার মিলবে। হুঁয়া এক বাঙ্গালী ডাগদারভি আছে।'

ততক্ষণে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়েছে। বাংলোয় বিদ্যুৎ নেই। চৌকিদার হ্যেরিকেন জ্ব কেটলির জল ফুটছিল কয়লার উনুনে। চা করল। আমি চায়ের ট্রে নিয়ে ফিরলাম। অবস্থা গুরুতর। তাই রান্নাটা যত তাড়াতাড়ি হয়, মঙ্গল।

সন্তুরা লণ্ঠন জ্বেলেছে। আদিনাথকে দেখে মনে হল, সে এখন ঘুমুচ্ছে। আমরা চুপচা খেতে থাকলাম। চা শেষ করে বললাম, 'সেই মুনমুনিয়া ছাড়া ডাক্তার পাবার আশা নেই রাত্রিবেলা পায়ে হেঁটে এতদূর যদি যেতেও পারি, ডাক্তার আসবেন না। বন-জঙ্গল এ শুনেছি ডাকাতেরও উপদ্রব আছে। কী করা যায় বল তো সন্তু?'

সন্তু বলল, 'আমার কাছে অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট আছে খাইয়ে দিই।'

আদিনাথ ঘুমোচ্ছিল দেখে ওকে তখনই জাগিয়ে ট্যাবলেট খাওয়াতে চাইলু এবারকার বেড়াতে আসার আনন্দ মাঠে মারা গেল ভেবে আমরা মুষড়ে পড়লাম।

বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যা হবার হল। এঁদো ঘুমোক। চল্ আমরা বাইরে গিয়ে বসি। চাঁদ উঠেছে মনে হচ্ছে।'

আমরা তিনজনে লনে গিয়ে বেতের চেয়ারে বসলাম। সবে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের গড়ন দেখে মনে হল আগামীকালই পূর্ণিমা। চোরডিহায় এখন বসন্তকাল। তবু জ্যোৎস্নাটা পরিচ্ছন্ন নয়। শীতের কুয়াশা যেন এখনও জড়িয়ে আছে জ্যোৎস্নার ভেতর। আমাদের কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। আদিনাথটার গোঁয়ার্তুমির জন্য সব প্রোগ্রাম ভেস্তে গেল। কাল সকালেও যদি জ্বরটা না ছাড়ে তাহলে কী হবে ভেবেই পাচ্ছিলাম না। ডাক্তার আনতে সেই মুনমুনিয়া যাওয়া—বাপ্স্!

দূরে বিস্তীর্ণ ন্যাড়া মাঠটার দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছিলাম। দিগন্তে পাহাড়গুলো কালো হয়ে ফুটে আছে। ঝাপসা জ্যোৎস্নায় কচ্ছপের খোলার মত রুক্ষ মাঠে হয়তো আমি একটা মোটরগাড়ি খুঁজছিলাম।

হঠাৎ পুব-দক্ষিণ কোণে এক ঝলক আলো ফুটে উঠল। তীব্র আলোর ঝাঁটা। মোটরগাড়ির হেডলাইট কি ? উত্তেজিতভাবে বললাম, দ্যাখ্, দ্যাখ্!'

সন্তু 'কী' বলেই চুপ করে গেল। বাদলও সেদিকে তাকাল। তার চোখদুটো চকচক করতে থাকল। আলোর ঝাঁটাটা আরও জোরালো হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ওটা এগিয়ে আসছে। সন্তু চেঁচিয়ে উঠল এবার। 'চৌকিদার! তোতিরাম! জলদি ইধার আও!'

তোতিরাম কিচেনের বারান্দায় বেরিয়ে বলল, 'বোলেন স্যার!'

ওই আলোটা কিসের বলো তো?'

বাদল বিরক্ত হয়ে বলল, 'ধুশ্। ওকি বাংলা বোঝে ? চৌকিদার! উও রোশনি কিসকা হোতা হ্যায়?'

ওর হিন্দি শুনে হাসবার মতো অবস্থা নয়। চৌকিদার একলাফে লনে নেমে ঠাহর করে দেখে বলল, 'হ্যাঁ স্যার! উও রেলকা ইঞ্জিনের বাত্তি আছে। উধার রেলের লাইন আছে না?' সে আরও বোঝাবার চেষ্টা করল। 'দেখিয়ে লাইনে পূরবসে গাড্ডি আসছে। কেমন তো? আসতে-আসতে উত্তর দিকমে ঘুমে যাচ্ছে। উও দেখিয়ে, টেরেন গাড়ি যাচ্ছে।'

আলোটা আর নেই। 'টেরেন গাড়ি' অবশ্য আমরা দেখতে পেলাম না। এলোমেলো দক্ষিণা হাওয়ায় হয়তো চাপা গুড়গুড় একটা শব্দ শুনলাম।—নাকি আমাদের ইচ্ছাকৃত শোনা। এবার তিনজনে একচোট হাসাহাসি করলাম।

তারপর সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বাদল! তুই আদিনাথকে দেখিস। আমি আর সন্তু একটু নেচার আসি।'

বাদল অবাক হয়ে বলল, 'যা বাবা!'

সন্তু ঘরে গিয়ে টর্চ নিয়ে এল। তারপর আমাকে ডেকে বলল, 'আয়!'

বাদল রাগ করে বলল, 'এঁদোর অবস্থা হবে বলে দিচ্ছি। তাছাড়া চৌকিদার বলছিল—ওদিকে শঙ্খচূড় সাপ আছে!'

সন্তু গ্রাহ্য করল না। ও পাছে আমাকে ভীতু ভাবে, তাই নিঃশব্দে ওর পিছু নিলাম।

সামনের রাস্তাটা কিছুটা সোজা গেছে তারপর ফের ঢালু হয়ে উঠে গেছে। ধারে পৌঁছে সন্ত বলল, 'আমার একটা খট্‌কা লেগেছে, জানিস? সেটা মনের ভুল না চোখের ভুল—নাকি সত্যি কিছু, ভেরিফাই করা উচিত।'

সন্দিগ্ধভাবে বললাম, 'কী রে সন্ত?'

সন্ত বলল, 'কাল সন্ধ্যার একটু আগে আদিনাথ সাদা মোটরগাড়ির কথা বলল। অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। কোথায় যেন চাপা গরগর একটা শব্দও শুনতে পেলাম। ভাবলাম, কোনো সরকারি অফিসার আসছে বাংলোয়। সে-ব্যাটা এসে আমাদের ভাগিয়ে দেবে ভেবে মনে মনে তৈরি হয়ে বারান্দায় বেরুলাম। তোরা তখন ঘুমে কাঠ।'

সন্ত দম নিতে শুরু করলে বললাম, 'তারপর?'

'বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। তোর দিব্যি—হঠাৎ মনে হল ঠিক এইখানটায় একটা সাদা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদের আলো ছিল। কিন্তু গাড়িটা অসম্ভব সাদা। তার চেয়ে অবাক কথা, তারপর গাড়িটা আর দেখতে পেলাম না। তখন ভাবলাম, নিশ্চয় ভুল দেখেছি।'

'সন্ত! কথাটা তোর বলা উচিত ছিল!'

'ধুর! ওটা কি বলার কথা? আদিনাথের জ্বর আর ভুলবকা দেখে তখন থেকে মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করছে। তোরা আমাকে কুসংস্কারগ্রস্ত ভাববি বলে চুপ করে ছিলাম। কিন্তু ....' সন্ত একটু ভেবে ফের বলল, 'কিন্তু যদি সত্যি পৃথিবীতে অলৌকিক বা ভুতুড়ে ব্যাপার কিছু থাকে, সেটা আমাদের ভালভাবে বুঝে নেওয়ার দরকার আছে।'

ওর কথা বুঝতে না পেরে বললাম, 'বুঝবিটা কী?'

সন্ত আমার প্রশ্নের জবাব দিল না। সে হনহন করে হাঁটতে শুরু করল। এক জায়গায় আবার কিছু পাথর পড়ে রয়েছে। টের পেলাম, বাংলো থেকে মাঠটাকে যেমন দেখেছি, আসলে তেমনটি নয়। প্রচুর পাথর আর ফাটলে ভর্তি। জায়গায়-জায়গায় কাঁটাগুল্মও রয়েছে। সন্ত একটা বড় পাথরের ওপর উঠে বসে আমাকে ডাকল, 'আয়। এখানে কিছুক্ষণ বসে ওয়েট করি।'

পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে দেখছি। আমি ভেতর-ভেতর বেশ ভয় পেয়ে গেছি। এ অজানা বিস্তীর্ণ প্রান্তরে জ্যোৎস্নায় মানুষের মনে প্রকৃতিপ্রেম জাগবার কথা। আমি অস্বস্তিতে আড়ষ্ট। খালি মনে হচ্ছে, আচমকা একটা অসম্ভব সাদা মোটরগাড়ি কখনও শব্দে কখনও নিঃশব্দে ছুটে আসবে চোরডিহার জ্যোৎস্নার মাঠে। আমাদের ভয়ার্ত চোখের সামনে সারামাঠ ছোটাছুটি করবে। তারপর মিলিয়ে যাবে হঠাৎ।

সন্তুকে একবার একটু নড়ে উঠতে দেখলাম, যেন সত্যি ভুতুড়ে গাড়িটা দেখতে পেয়েছে—কিন্তু তারপর আগের মতো স্থির হয়ে রইল সে।

শোঁ-শোঁ করে হাওয়া বইছিল। বহুদূরে কোথায় শেয়াল ডাকছিল। হাওয়ায় ভেসে আসছিল সে ডাক। আবার মিলিয়ে যাচ্ছিল। কাছাকাছি কোথাও একটা রাতচরা পাখি ডেকে উঠল। তারপর চুপ করল। চাঁদ আরও কিছুটা এগিয়ে এল আকাশে।

তারপর বাংলোর দিক থেকে একটা ডাক ভেসে এল। চমকে উঠলাম। সন্ত কান পেতে শুনে বলল, 'তোতিরাম ডাকছে! আয়, রান্না হয়ে গেছে এতক্ষণে।'

শুনেই ভয় আর তন্ময়তা ঘুচে গেল। ক্ষিদেটা জেগে গেল। আমরা বাংলোয় ফিরে চললাম। যেতে-যেতে সন্তু বলল, 'বসে থাকতে দারুণ ভাল লাগছিল।' সে হেসে উঠল। হয়তো সাদা গাড়ি এসেও যেত একসময় কিন্তু শালা খিদের চেয়ে সাঙঘাতিক বাস্তব আর কিছু নেই।'

কিন্তু তার চেয়েও সাংঘাতিক বাস্তব আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল বাংলোতে। আদিনাথ মারা গেছে। বাদল ঘরে ঢুকে দেখেছিল, সে বিছানা থেকে নিচে পড়ে গেছে কখন। মুখের দুপাশে চাপচাপ ফেনা। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। চিত করে শোয়াতে গিয়ে আদিনাথের নাক থেকে গলগল করে রক্ত এসে বাদলের দুহাত ভিজিয়ে দিয়েছে। বাদল বাচ্চা ছেলের মতো হাউ হাউ করে কাঁদছে। তোতিরাম ভিজে চোখে বারবার বলছে, 'ইয়ে কভি নেহি হো শকতা—ইয়ে কভি নেহি হো শকতা!'

* * * * *

আদিনাথের ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা হয়েছিল—সানস্ট্রোক—মৃত্যু। কলকাতা শহর অলৌকিকতাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। কলকাতায় ফিরে মনে হয়েছিল তাই তো! এই সহজ ব্যাপারটা আমাদের মাথায় ঢোকেনি। ধু ধু রোদে ঘোরাঘুরি করলে অমনটা তো হতেই পারে!

কিন্তু সেই ঘটনার দশ বৎসর পরে আমি আবার চোরডিহা যাই হাওয়া বদলের উদ্দেশ্যে। চোরডিহার ততদিনে অন্যরূপ। বাংলোয় বিদ্যুৎ গেছে। কাছাকাছি এলাকায় তামার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। কপার এজেন্টের লেবার অফিসার রমেন রুদ্র ছাত্র-জীবনে আমার বন্ধু ছিলেন। তিনিই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। জিপে করে পৌঁছেও দেন সেই ফরেস্ট বাংলোতে। তোতিরামকে দেখতে পেলাম না। তার জায়গায় অন্য লোক।

বাংলোর দক্ষিণে সেই প্রান্তরটা কিন্তু একটুও বদলায়নি। শুনলাম, বন দফতর যতবার গাছ পুঁতেছেন, শুকিয়ে মারা পড়েছে। তাই হাল ছেড়ে দিয়েছেন তাঁরা। ওই মাটিতে একরকম রাসায়নিক পদার্থ আছে, যা বড় গাছ বাঁচতে দেয় না। তাছাড়া জায়গায় জায়গায় নিরেট পাথুরে জমি।

সন্ধ্যার পর সেবারকার মতো চাঁদ উঠেছে। নবমী অতবা দশমী তিথি। মাসটা অবশ্য সেই এপ্রিল। চোরডিহিতে শীত বা গ্রীষ্ম, দুটোই কষ্টদায়ক। এপ্রিলটাই ভাল। সন্ধ্যার দিকে মাঠটা থেকে গা জুড়োনো হওয়া ভেসে আসছে। লনে বেতের চেয়ারে বসে মাঠটার দিকে তাকিয়ে আদিনাথের কথা মনে পড়ছিল। সত্যি কি সে একটা সাদা মোটরগাড়ি দেখতে পেয়েছিল এখানে? সন্তুটা তো রাতের দিকে মাতাল থাকে। তার দেখাটা বিশ্বাস করা উচিত নয়। কিন্তু আদিনাথ একটু একরোখা প্রকৃতির হলেও বুদ্ধিমান ছেলে ছিল।

'বসতে পারি?'

তাকিয়ে দেখি পাশের ঘরের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক। মাথায় শণের মতো সাদা চুল। ভুরু পর্যন্ত সাদা। পরনে ধূসর রঙের স্যুট। বিকেলে আলাপ হয়েছিল। খুব ভদ্র আর অমায়িক মানুষ। থাকেন হাজারিবাগে। নাম বলেছিলেন নরনারায়ণ ত্রিবেদী। সায়েবের মতো চালচলন, স্বভাব—সব কিছুই।

ত্রিবেদী সায়েব বসে একটু হেসে বললেন, 'কফি খেতে আপত্তি নেই তো?' বললাম, 'না আমিই বরং ভাবছিলাম.....।'

কথা কেড়ে ত্রিবেদী সায়েব বললেন, 'বলে এসেছি। প্লিজ ওয়েট এ বিট।' তারপর এলাকার হালচাল নিয়ে গল্প করতে থাকলেন।

বুঝলাম, চোরডিহা জঙ্গলের ইতিহাস শোনালেন। তারপর বললেন, 'প্রতি বছর এ সময়টা এখানে আসি। প্রায় দিন কুড়ি করে কাটিয়ে যাই। বাংলোয় জায়গা না পেলে ক্যাম্প করে নদীর ধারে গিয়ে থাকি। শঙ্খচূড় সাপ আছে বলে সবাই ভয় দেখায়। এ পর্যন্ত তা দেখার সৌভাগ্য হয়নি। প্রায় বিশ বছর ধরে এখানে আসছি।'

বললাম, 'আমি আর একবার এসেছিলাম—সেটা ১৯৬০ সালে। চার বন্ধু মিলে এসেছিলাম। তো.....'

ত্রিবেদীসায়েব বললেন, '১৯৬০ বললেন? হুঁ—আমি সে বছর এপ্রিলটা মিস করেছিলাম হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। হাসপাতালে থাকতে হল একটা মাস। তবে সেবার অগাস্টে এসেছিলাম। দুদিন থেকে চলে যাই। আমাকে এপ্রিলেই চোরডিহা স্যুট করে ভাল।'

'হ্যাঁ, এপ্রিলটাই ভাল এখানে।'

কফি আনল চৌকিদার। কফিতে চুমুক দিয়ে ত্রিবেদী সায়েব বললেন, কী বলছিলেন যেন? ও—এপ্রিল! হ্যাঁ—এপ্রিল। চোরাডিহা আমাকে কি দিয়েছে। ভাবতে পারেন?'

একটু হাসলেন ভদ্রলোক। রসিকতার ইচ্ছা হল। বললাম, 'নিশ্চয় হনিমুনে এসেই জায়গাটার প্রেমে পড়েছিলেন?'

হা হা করে হেসে ত্রিবেদী সায়েব বললেন, ও নো নো! আমায় দেখে কি মনে হয় ১৯৬০ সালে বিয়ে করেছিলাম? আমার বয়স এখন পঁচাত্তর। হিসেব করুন তাহলে। ১৯৬০ সালে আমার বয়স ছিল পঞ্চান্ন বছর। আমার মেয়ে সুভদ্রার বয়স ছিল মোটে কুড়ি। একমাত্র মেয়ে ওর মা মারা যায় ১৯৫৯ সালে। পরের এপ্রিলে ওকে নিয়ে বেড়াতে এলাম চোরডিহা। তখন এ বাংলোয় ছিল টালির চাল। বাঘের ডাক শোনা যেত আশেপাশে। ওদিকে হাজারিবাগ-গয়া সড়কের অবস্থা তখন শোচনীয়। তবু সুভদ্রাকে একটু থ্রিল দেব বলে মোটরগাড়ি হাঁকিয়ে এ বাংলোয় এসে হাজির হলাম।'

একটু চুপ করে থাকার পর কফিতে চুমুক দিয়ে ত্রিবেদী সায়েব ফের বললেন, 'সুভদ্রা ছিল দুরন্ত মেয়ে। আমি সকালে বন্দুক নিয়ে নদীর ওদিকে গেছি, যদি কিছু পাখিটাখি মারা যায় সুভদ্রার মাথায় ঝোঁক চেপেছে ও মাঠটায় গিয়ে গাড়ি চালাবে। সবে স্টিয়ারিং ধরতে শিখেছে বুঝলেন ব্যাপারটা? দুপুরে কয়েকটা হরিয়াল নিয়ে বাংলোয় ফিরে দেখি, সুভদ্রা নেই চৌকিদার বলল, গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে মাঠের দিকে। ফিল্ডগ্লাস ছিল সঙ্গে। চোখ রেখে মাঠটা তন্নতন্ন খুঁজলাম। দেখতে পেলাম না। ওদিকে তো কোনো রাস্তাঘাট নেই। গেল কোথায় বোকা মেয়েটা? তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লাম। মাঠের শেষ প্রান্তে যেখানে ওই হিলগুলো দেখতে পাচ্ছেন নদীটা ওখানে ঘুরে গেছে। গভীর খাত সৃষ্টি করেছে। চোরডিহা প্রপাত। দেখেননি?'

মাথা নাড়লাম। কান পেতে শুনছিলাম।

'এপ্রিলে প্রপাতের তলা শুকনো। গিয়ে দেখি গাড়িটা তিনশো ফুট নিচে উল্টে পড়ে ছ।'

'আপনার মেয়ের কী হল?'

বৃদ্ধ চেঁচিয়ে উঠলেন। 'আর ইউ ফুল? তিনশো ফুট নিচে যে গাড়ি পড়ে, তার .....' হঠাৎ ম ধরা গলায় বললেন, 'ক্ষমা করবেন। ইদানীং আমার হাই ব্লাড প্রেসার।'

কতক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর আস্তে বললাম, গাড়িটা কি সাদা রঙের ছিল?'

'হ্যাঁ। কেন বলুন তো?'

'জাস্ট মনে হল আর কী!'

বৃদ্ধের চোখ জ্যোৎস্নায় চকচক করতে দেখলাম। আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু ঙ্গে ফেরাতে ফের বললাম, 'চোরডিহার জঙ্গলে তখন নিশ্চয় বাঘ ছিল। আপনি কখনও মেরেছেন কি?'

নরনারায়ণ ত্রিবেদী 'এক্সিউজ মি' বলে উঠে আস্তে আস্তে বাংলোর দিকে চলে গেলেন। জের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আমিও একা বসে থাকতে পারলাম না। নিজের ঘরে ফিরে লাম। .....

অপেক্ষা

নিশীথ আমার ছেলেবেলার বন্ধু। শুনেছি, বাল্যপ্রেমে নাকি অভিশাপ আছে। আমার ধা
বাল্যবন্ধুত্বেও অভিশাপ আছে। ছেলেবেলার বন্ধুরা প্রায়ই আর যৌবনের বন্ধু থাকে
যৌবনে অনেক নতুন বন্ধু আসে। তখন তাদের এড়িয়ে ছেলেবেলার বন্ধুদের পাশে গি
দাঁড়ানো সহজ হয় না। অবশ্য ব্যতিক্রম দু-একটা নিশ্চয় আছে। কিন্তু নিশীথ আর আ
বর্তমান সম্পর্ক কোনভাবেই সেরকম ব্যতিক্রম নয়।

অর্থাৎ চেষ্টা সত্ত্বেও আর নিশীথের সঙ্গে ছেলেবেলার মত এক হয়ে উঠতে পারি
কোথাও শক্ত বাধার পাঁচিল কোনমতে পার হওয়া যায় না। অথচ গৌতম, সুবিনয় আর
এরা আমার হাল আমলের টাটকা বন্ধু। এদের সঙ্গে না কাটাতে পারলে জীবন কেমন অর্থ
মনে হয়।

এদিকে নিশীথও আমার মত হয়ে উঠেছিল। কখনও কখনও বাসস্টপে কিংবা রা
যেতে হঠাৎ দুজনে পরস্পর দেখা হয়েছে। কখনও অল্প একটু হাসি, কদাচিৎ দুচারটে কথ
তারপর যে-যার দিকে এগিয়েছি। কখনও আমার মনে হয়েছে আসলে দোষটা আমার নয়
নিশীথেরই। নিশীথটা যেন বড্ড ছাপোষা আর স্বার্থপর হয়ে পড়েছে। এত তার সময়ের
যে আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ আড্ডা দিতেও তার লোকসান হয়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণে
দেখেছি, সে আড্ডা দিলেও কি আমার ভাল লাগত ? ছেলেবেলায় নিশীথ এত বাজে ব
যে ওর নাম রেখেছিলুম 'বকারাম'। ওর কাছে অসম্ভব বলে কোন ব্যাপার ছিল না পৃথিবী
সবরকম গাঁজাখুরি ব্যাপারেই ওর ছিল অগাধ বিশ্বাস।

এখন একজন রীতিমত সুশিক্ষিত মানুষ নিশীথ। বাইরের একটা কলেজে অধ্যাপনা ক
শুনেছিলুম, তার অধ্যাপনার খুব সুনাম আছে। ছেলেবেলার চঞ্চল হই-চই করা ছট
ছেলেটিকে এখন ওই চেহারার সঙ্গে একটুও মেলানো যায় না।

দু'বছর আগে নিশীথ বিয়ে করেছিল। ওর বিয়ের সময় আমাকে আপিসের কাজে বা
থাকতে হয়েছিল। তার ফলে বৌভাতেও উপস্থিত থাকতে পারিনি। অনেক পরে ফিরে
আর নিশীথের বৌ দেখতে যাওয়ার উৎসাহ ছিল না। তবে শুনেছিলুম, খুব সুন্দরী
পেয়েছে নাকি নিশীথ। তবু আশ্চর্য, সে যেমন আমাকে তার বাড়ি যাওয়ার জন্যে সা
আমিও তেমনি গা করিনি। সুন্দরী মেয়ে পৃথিবীতে অনেক আছে। কাজেই নিশীথের বর
একজন জুটে যাবে, তাতেও অবাক হবার কিছু নেই।

তারপর মাস তিন আগে হঠাৎ শুনলুম, নিশীথের সেই সুন্দরী বউটি মারা গেছে। আ
এবারও আমি ঘটনাচক্রে বাইরে ছিলুম! কাজেই অনেক পরে যখন খবরটা কানে
নিশীথকে তার বাড়ি গিয়ে কিছু সান্ত্বনা দিতে আর উৎসাহ ছিল না। মধ্যে তার সঙ্গে এব

দেখাও অবশ্য হয়ে গেল। পাছে সে ইনিয়ে বিনিয়ে স্ত্রীর মৃত্যু-কাহিনী শোনাতে বসে, অল্প হেসে চলতি বাসটায় উঠে পড়লুম। কিন্তু আমার মনে হল, নিশীথ যেন অনেকটা সময় এদিকে তাকিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকবে। কেমন এমন মনে হল, বুঝতে পারলুম না অবশ্য। কিন্তু ব্যাপারটা মনে খচ খচ করে বিঁধতে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। কেন আমি নিশীথকে এমন করে এড়িয়ে থাকছি বরাবর? কিসের শোধ তুলছি, নাকি বর্তমান নিশীথের মধ্যে ছেলেবেলার সেই সুপরিচিত চঞ্চল কথক কিশোরটিকে খুঁজে না পাওয়ার একটা গভীর অভিমান জেগেছে আমার মধ্যে?

কিছুদিন পরে এই অনুশোচনার তাগিদেই যেন আপিস থেকে ফিরে সরাসরি হাজির হলুম নিশীথের বাড়ি। ওরা এক সময় যে খুব বড়লোক ছিল, তার প্রমাণস্বরূপ এই সেকেলে বাড়িটা এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে! এরকম জবড়জং ধাঁচে একালে আর কেউ বাড়ি বানায় না। ছেলেবেলায় যেমন দেখেছিলুম, তেমন সতেজ ভাবটি এখন নেই। একতলা-দোতলার সব ঘর ভাড়া দেওয়া হয়েছে। কেবল দোতলার তিন-চারটে ঘর নিজের জন্যে রেখেছে নিশীথ। কলিং বেলের বোতাম টিপলে ওর চাকর দরজা খুলল। বলল, বাবু আছেন। আপনি বসুন, ডেকে দিচ্ছি।

নিশীথ এখন নিতান্ত একা মানুষ, জানি বলেই আমি আর অপেক্ষা করলুম না। সোজা ঢুকে পড়লুম ওর শোবার গরে। পর্দা তুলে চোখে পড়ল, নিশীথ ড্রেসিং টেবিলের সামনা-সামনি একটা ইজিচেয়ারে চুপচাপ বসে রয়েছে। আমাকে আচমকা দেখে সে একটু চঞ্চল হল। বলল, আরে। আয় আয়!

আমি সটান গিয়ে ওর বিছানায় বসে পড়লুম। বললুম, কী ব্যাপার কীরে তোর? একেবারে যে ধরা-ছোঁয়া দিস্‌নে আজকাল! নিশীথ একটু হেসে বলল, কেন? সেইদিনই তো দেখা হল তোর সঙ্গে বাস-স্টপে। বললুম, আরে সে আর বলিসনে। সেদিন একজনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল—তাই, ... যাকগে। তোর দুঃসংবাদটা অবশ্য শুনেছিলুম। ভাবছিলুম.....

নিশীথ বাধা দিয়ে বলল, জানি, তুই তখন বাইরে ছিলি।

বললুম, হ্যাঁরে, কী হয়েছিল কী? অসুখটা ধরা পড়েনি—তাই না?

নিশীথ বলল, না—ধরা পড়েছিল। ব্লাড ক্যানসার।

আমি অস্ফুট কণ্ঠে বললুম, ব্লাড ক্যানসার! সর্বনাশ, ও রোগের তো ওষুধই নেই।

নিশীথ একটু হেসে বলল, হ্যাঁ নেই। এ একটা অদ্ভুত ব্যাপার—যখন স্পষ্ট জানি, এক পা এক পা করে মৃত্যু আমার দিকে এগিয়ে আসছে, তখন মনের কী অবস্থা হয়, বুঝতেই পারছিস! তপতী অবশ্য জানত না যে তার কী অসুখ হয়েছে—তাকে জানতে আমি দিইনি। কিন্তু আমি তো জানতুম, যে ওর মৃত্যু এগিয়ে আসছে, একটু একটু করে। আমার—আমার ওই কয়েকটা দিন যা কেটেছিল, ভাবতে পারবি নে। যাক্‌গে, বোস চা খাবি, না কফি?

আমি বললুম, সে হচ্ছে। আজ তোর সঙ্গে আড্ডা দিতেই তো এসেছি।

নিশীথ হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেইসময় দ্রুত ঘরের ভিতরটা দেখে নিলুম। দেওয়ালে ওর বাপ-মায়ের ছবি রয়েছে দেখতে পেলুম। আসলে আমি ওর বউয়ের

ছবিটা খুঁজছিলুম। কিন্তু কোথাও সে-রকম কোন ছবি দেখা গেল না। ঘরটা চূড়ান্তভাবে বিশৃঙ্খল হয়ে রয়েছে। মেয়েরা যে ঘরে নেই সে ঘর তো এমন হবেই।

নিশীথ তক্ষুনি ফিরে এল। ইজিচেয়ারে আগের মত বসে বলল, এসেছিস—ভাল হয়েছে। একটা ব্যাপারে তোর সঙ্গে আলোচনা করব ভাবছিলুম।

কৌতূহলী হয়ে বললুম, কী ব্যাপার?

নিশীথ বলল, সে হচ্ছে। আচ্ছা বিলু, তুই স্পিরিটে বিশ্বাস করিস?

হেসে ফেললুম। বললুম, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা সবই তো তোর জানা। কেন, আজকাল ভূত-টুত দেখতে পাচ্ছিস নাকি।

নিশীথ কোন জবাব দিল না একথার। বাইরের আলো কমে এসেছিল। সে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল ঘরে। তারপর বলল, একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে। আমি তার কোন মাথামুণ্ডু খুঁজে পাচ্ছিনে।

আরো জোরে হেসে বললুম, অদ্ভুত কাণ্ড তো তোমাদের বাড়িতে বরাবর ঘটে। এর আর নতুন কথা নাকি?

নিশীথ গম্ভীর হয়ে বলল না—সে সব তো তোদের গল্প শোনাতুম। এ ব্যাপারটা কিন্তু তেমন ধরনের নয়—তাছাড়া এ বয়সে আর ভুতুড়ে গড় বলে কাকেও তাক লাগাতে ইচ্ছে করে না। অথচ যা ঘটছে, তা খুব স্বাভাবিক নয় বলেই আমার ধারণা।

আমি ওর ভাবভঙ্গি দেখে আর হাসবার সাহস পেলুম না। তাছাড়া এই ঘরে অল্প কিছুদিন আগে ওর বউ মারা গেছে। ঘরে যে আলোটা জ্বলছে, তাও যথেষ্ট নয়। আমার গা ছমছম করে উঠল হঠাৎ। নিশীথকেও যেন দূরের মানুষের মত দেখাচ্ছিল। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বললুম, সব খুলে না বললে তো কিছু বুঝতে পারছি না।

নিশীথ একটু কেসে বলতে থাকল, তপতীকে তুই দেখিসনি। তার কোন ছবি এখন আমার কাছে নেই। নেই—মানে, সব নষ্ট করে ফেলেছি বিলু, যে সৌন্দর্যের সঙ্গে আত্মরক্ষার শক্তি থাকে না—সে সৌন্দর্য অন্তত আমার কাছে অনভিপ্রেত। সে একটা জীবনের কঠিন বোঝা। তপতী সুন্দরী ছিল ঠিকই। কিন্তু যেদিন আমি জানতে পারলুম, তার অসুখটা কী—আমি পাগল হয়ে গেলুম মনে মনে। প্রকৃতির এ অবিচার মেনে নিতে পারলুম না। চোখের সামনে দেখছি একটা বিষাক্ত কিছু চমৎকার একটা ফুলের পাপড়িগলো কুরে কুরে খেয়ে ফেলছে—অথচ করার কিছু নেই। যেন একটা শক্ত কাচের দেওয়াল মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার হস্তক্ষেপে বাধা দিচ্ছে। তখন—তখন আমি করলুম কী জানিস বিলু? হিংস্র আঘাতে সেই কাচের দেওয়ালটা ভেঙে ফেলতে গেলুম—আর ....

নিশীথ আমার দিকে তাকাল! কিন্তু এ কোন নিশীথ? কঠিন এক পাথরের প্রতিমূর্তি যেন। তার ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। সে বলল, হ্যাঁ, আমার ওই একটা হঠকারিতা। বেচারা তপতী তার মৃত্যুকে নিয়ে পালিয়ে গেল আমার কাছ থেকে। তখন আমি তো মানুষ ছিলুম না বিলু কী বলব—একটা অতিমানুষ, অথচ ভারি অসহায় একটা কাকুতি আমাকে পেয়ে বসেছিল।

কী যেন টের পেয়ে অস্ফুট কণ্ঠে চেঁচিয়ে বললুম, তুই কি ওকে খুন করেছিস নিশীথ?

নিশীথ চমকে উঠে বলল, কে ? আমি খুন করেছি তপতীকে ? কী বলছিস যা তা?

বললুম, কিন্তু কী মানে হয় তোর কথার?

নিশীথ একটু চুপ করে থেকে বলল, ছেড়ে দে। কী করেছি—আমি নিজেই জানিনে। হ্যাঁ—যে অদ্ভুত ব্যাপারটা বলছিলুম—

এইসময় কফি এসে গেল। কফি খেতে খেতে নিশীথ আবার শুরু করল। তপতী যেদিন রাতে মারা যায়—ঠিক কাঁটায় কাঁটায় তখন রাত দুটো—সেদিন বিকেলে সে আমাকে একটা চিরকুট দেখিয়ে বলল, এর মানে কী গো?.... ওর হাত থেকে কাগজের টুকরোটা নিয়ে দেখলুম, গোটা গোটা হরফে লাল কালিতে লেখা রয়েছে : 'অপেক্ষা করে থেকো। ঠিক রাত দুটোয় আমি আসব।' চমকে উঠেছিলুম। বললুম, কোথায় পেলে এটা? তপতী বলল একটু আগে হাত বাড়িয়ে ওষুধের শিশিটা নিতে গিয়ে হাতে ঠেকল। আমি মনে মনে খুব বিস্মিত আর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলুম। কিন্তু মুখে ও কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলুম। তপতী কিন্তু ভারি খুঁতখুঁতে মেয়ে ছিল। তাছাড়া একবার কোনকিছু ওর মাথায় ঢুকলে আর রেহাই নেই। সে সেই বিকেল থেকে আমাকে কিছুতেই বাইরে বেরোতে দিল না। সারাক্ষণ ধরে থাকল। আর শুধু এক কথা : ওগো মনে হচ্ছে—আজ রাত দুটোয় সত্যি কিছু একটা ঘটবে। কেউ আসবে আমার কাছে। আমি বললুম, পাগল! এত রাতে কে আসবে—কেন আসবে তোমার কাছে? কিন্তু তপতী কিছুতেই ভুলতে পারছিল না কথাটা। রাত যত বাড়তে লাগল, ও তত চমকে উঠতে থাকল বার বার। বলল, ক'টা বাজছে দেখ তো! ওকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু ঘুমোল না। অনবরত ফিস্ ফিস্ করতে লাগল, আসবে—ঠিকই আসবে। আমাকে অপেক্ষা করে থাকতে বলেছে—আমি অপেক্ষা করে থাকব। ঘুমোব না। না—না, আমাকে ঘুমোতে বলো না তুমি। সে আসবে, সে আসবে।

নিশীথকে চুপ করতে দেখে আমি বললুম, তারপর?

নিশীথ একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কিন্তু দুটো বাজার আগে, সে ঘুমিয়ে পড়ল। এদিকে আমার চোখে ঘুম নেই। প্রতিটি মুহূর্ত সেই ছোট্ট চিঠির প্রতিধ্বনিতে মাথার ভিতর গম গম করে বাজছে : 'অপেক্ষা করে থেকো। ঠিক রাত দুটোয় আমি আসব।' অসহ্য লাগছিল। আস্তে আস্তে উঠে বসলুম। তারপর পায়চারি করলুম। ওই জানলার বাইরে শিমুল গাছটা কাঁপিয়ে একটা হাওয়া এল। পার্কের দিকে একটা কুকুর ডাকল। হঠাৎ আমার মনে হল, কেউ কি এই নির্জন রাস্তায় এখন এই বাড়িটা লক্ষ্য করে হেঁটে আসছে? কে সে? কী তার নাম? কী তার ঠিকানা? কেন আসছে সে তপতীর কাছে? আস্তে আস্তে সন্তর্পণে দরজা খুলে বাইরের ঘরে গেলুম। সিঁড়ির দিকে কান পাতলুম। ঠিক সেই সময় মনে হল খুব সাবধানে পা ফেলে কে হেঁটে আসছে ওপরতলার দিকে। ক্রমশ পায়ের শব্দটা স্পষ্ট হতে থাকল। উত্তেজনায় হাঁফাতে হাঁফাতে দাঁতে দাঁত চেপে দরজায় পিঠ রেখে দাঁড়ালুম। আমার আত্মা শিশু চিৎকার করে বলতে চাইল, এসো না—খবর্দার! কেউ এসো না! কিন্তু কোন শব্দ বেরোল না। মনে হল দরজায় নক্ করছে সে। প্রথমে মৃদু পরে দ্রুত—গভীর একটানা টক্‌টক্ টক্‌টক্ শব্দ। একটানে দরজা খুলে ফেললুম। কাউকে দেখতে পেলুম না। সিঁড়ির ভিতর একটা

বন্ধ হাওয়া এতক্ষণে ঘুরপাক খেতে খেতে আমার উপর দিয়ে ঘরে ঢুকল। অমনি আমার মনে হল, সে ঘরে ঢুকে পড়েছে। দরজা বন্ধ করে পা টিপে টিপে এ ঘরে তপতীর কাছে এলুম। ঠিক সেই মুহূর্তে দূরের গির্জায় ঢং ঢং করে রাত দুটোর ঘণ্টা বেজে উঠল। দেখলুম, তপতী চিত হয়ে শুয়ে আছে। চোখ দুটো বোজা। ঠোঁটে স্মিত হাসি। আমি তার দিকে এগিয়ে গেলুম। শুনলুম, স্বপ্নাবিষ্টা তপতী বিড় বিড় করছে—এসেছ? তুমি এসেছ? আমি ঘুমিয়ে পড়িনি—এই দেখ, জেগে আছি। এস—তুমি এস, দূরে দাঁড়িয়ে কেন? কাছে এসো—আরো কাছে ....

নিশীথ হঠাৎ থেমে গেল। অসম্ভব স্তব্ধতা ঘরে থম্ থম্ করছে। আমার বুক কাঁপছে। আবার সিগ্রেট ধরিয়ে খুব আস্তে বললুম, নিশীথ, তুই কিছুদিন বাইরে ঘুরে আয়। তোর মানসিক অবস্থা সম্ভবত ভালো নয়। আর সেই চিরকুটটা দেখাবি একবার?

নিশীথ আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপর বলল, সেই চিরকুটটা আমি ছিঁড়ে ফেলেছিলুম। তবে আজ কিছুক্ষণ আগে অবিকল তেমনি একটা চিরকুট আমিও পেয়ে গেছি।

চমকে উঠে বললুম, সে কি! দেখি, দেখি।

নিশীথ পকেট থেকে নীলচে রংয়ের একটুকরো কাগজ বের করে আমার হাতে দিল। আমার গা শিউরে উঠল। লাল গোটা গোটা হরফে লেখা রয়েছে : 'অপেক্ষা করে থেকো। আজ রাত দুটোয় আমি আসব।' আমি ফ্যাল ফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলুম।

নিশীথ কেমন হেসে বলল, খুব অবাক লাগছে না?

বললুম, লাগছে। নিশীথ, এ হেঁয়ালির কোন মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছিনে। কে লিখতে পারে এমন চিঠি? তুই বরং পুলিসে খবর দে। ওরা হাতে লেখা ঠিকই চিনে ফেলবে। এমনও হতে পারে যে কেউ তোদের সঙ্গে এমন রসিকতা করছে।

নিশীথ বলল, রসিকতা? হ্যাঁ—রসিকতাই তো। জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর রসিকতা।

বললুম, না—নিশীথ। ব্যাপারটা খুব সামান্য নয়। আমি বরং আজ রাতটা তোর কাছে থেকেই যাই।

নিশীথ বলল, আমাকে বাঁচাতে চাস?

বললুম, প্রশ্ন তা নয়—প্রশ্ন হচ্ছে, এটা ভারি রহস্যময় ব্যাপার। তোর বউ মারা যায় রাতে, সেদিনও এমনি চিঠি দেখেছিস বললি। আজ আবার তেমনি ভুতুড়ে চিঠি। গোয়েন্দা কাহিনীতে পড়েছি—এসবের পিছনে একটি মোটিভ থাকে। তুই এক্ষুনি ওঠ। চল, থানায় গিয়ে সব জানিয়ে আসি।

নিশীথ হাসতে হাসতে বলল, তোর বুদ্ধিটা চিরকালই মোটা। বিলু, এখন তাহলে যা ভাই। আজ আমি একটুখানি একা থাকতে চাই। অনেক কিছু ভাবতে চাই। হয়তো পরে আর সময়ই পাব না।

আমাকে বিদায় দিতে চায় জেনে ক্ষুব্ধ হলুম। বেরিয়ে এলুম। নিশীথটা নির্ঘাত পাগল হয়ে চলেছে। ছেলেবেলা থেকে যে অতশত ভূতের ব্যাপারে বিশ্বাসী, তার পক্ষে এখনও সে সংস্কার ত্যাগ করা সহজ নয়।

পরদিন সকালে পাড়ার রেস্তোরাঁটায় বসে চা খাচ্ছি। সেই সময় গৌতম বাইরে থেকে এসে বলল, আরে খবর শুনেছিস? তেরো নম্বর বাড়ির সেই অধ্যাপক ভদ্রলোক—বিলু, তোর সঙ্গে তো পরিচয় ছিল রে ....

লাফিয়ে উঠে বললুম, কী হয়েছে নিশীথের?

গৌতম ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকিয়ে বলল, সুইসাইড করেছে শুনলুম। আজকাল তো সবাই তলে তলে ভোজবাজি খেলছে—সামলাতে না পারলেই ব্যস। খেল খতম।

আমি কাঁপতে কাঁপতে আবার বসে পড়লুম। আর তক্ষুনি চকিতে আমার মাথার খুব ভিতর দিকে একটা আলো খেলে গেল। মনে হল—সেই আশ্চর্য চিরকুটের হাতের লেখাটা যার, তাকে আমি খুব ছেলেবেলা থেকেই চিনি।

গৌরমোহন ও মিস রঙ্গবতী

নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। বাসটা এসে থামার সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে পিলপিল করে অগুনতি লোক বেরিয়ে এল। তারপর বাসটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মারমুখী হয়ে। চিৎকার চেঁচামেচিতে কানে তালা ধরে যাচ্ছিল। ভয় পেয়ে ভাবলাম, নির্ঘাৎ এই বাসের ড্রাইভারের মৃত্যু হচ্ছে—কারণ সে আগের ট্রিপে কাউকে চাপা দিয়েছে, অথবা এমন কিছু করেছে যার শোধ নেবার জন্য ওত পেতে ছিল এই ক্রুদ্ধ জনতা।

কিন্তু তারপর যা ঘটল, তাতে আমি আরও হকচকিয়ে গেলাম।

বাসটার চাকা গড়াচ্ছে এবং সেই মারমুখী জনতার একজনও রাস্তায় নেই। বাসটা চলে গেলে তখনও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছি। রাস্তা খাঁ-খাঁ করছে আগের মতো। এ কি ম্যাজিক ?

একটু পরে রহস্যটা বুঝলাম।

ওরা মারমুখী জনতা নয়, বাসযাত্রী। আমার মতোই ওরা কে কোথায় এই বাসটার জন্য অপেক্ষা করছিল।

যাই হোক, তবু ধাঁধা থেকে গেল। এতগুলো মানুষ একটা আগাপাছতলা বোঝাই বাসের ভেতর কীভাবে জায়গা করে নিল কে জানে! বাসটা যেন এক অসাধারণ যাদুকর। কয়েক সেকেন্ডে এতগুলো মানুষকে গুম করে ফেলল!

কলকাতার ট্রামে-বাসে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা আমার আছে। কিন্তু সুদূর মফস্বলে একটা ছোট্ট রেল স্টেশন থেকে নেমে বাস রাস্তায় এসে ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করার পর যে দৃশ্য দেখলাম, তা অকল্পনীয়।

সুমোহনের মৃত্যুপাত করছিলাম মনে মনে। এসব কথা সে কিছুই লেখেনি। লিখেছিল 'চিকনডিহি স্টেশনে নেমে পিচ রাস্তায় চলে আসবি। বাস পেয়ে যাবি! কদমতলা স্টপে নামবি। মোটে মাইল পাঁচেক দূরত্ব। স্টপে আমি তোর অপেক্ষা করব। ......'

রাস্তার ধারে চার-পাঁচটা ছোট্ট চায়ের স্টল আর খাবারের দোকান। কোথাও কোনো ঘরবাড়ি নেই রেলকোয়ার্টার ছাড়া। ধু-ধু রুক্ষ মাঠে বিকেলের রোদ মড়ার মুখের মতো ফ্যাকাশে। রাস্তার দুধারে বড় বড় গাছ আছে। কিন্তু কেমন শ্রীহীন ক্ষয়াটে চেহারা। পশ্চিম রাঢ়ের এই এলাকায় আগে কখনও আসিনি। এসে মনে হল ভুল করেছি। সুমোহনের গ্রামে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে কেন যে আমাকে এমন পেয়ে বসেছিল কে জানে।

যে চায়ের স্টলে বসেছি এতক্ষণ, সেখানে গেলে চাওয়ালা একগাল হেসে বলল, পারলেন না স্যার? আপনারা কলকাতার লোক।'

বুঝলাম সে কী বলতে চাইছে। তার ওপর রাগ হল। কলকাতায় ভিড় হয় বটে, কিন্তু

যাত্রীরা এমন করে বাসে ওঠে না। এ কি বাসে ওঠা, নাকি পিঁপড়ের লড়াই করে গর্তে ঢোকা!

জিজ্ঞেস কললাম, 'নেক্সট্ বাস কটায় ভাই?'

চাওয়ালা খ্যাক খ্যাক করে হেসে বলল, 'আজ আর উদিকে বাস-টাস নেই স্যার। যিনি গেলেন, তিনি রাত আটটায় ফিরে আসবেন। টেশনের যাত্রী নামিয়ে চলে যাবেন। ব্যস! ফের আগামীকাল সকাল আটটায় আসবেন।'

ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আরও এক কাপ চা খেয়ে স্টেশনের দিকে চলেছি, কেউ পেছন থেকে ডাকল 'ও মশাই! শুনুন, শুনুন!'

ঘুরে দেখি, শুঁটকো চেহারার রোগা আর ঢ্যাঙা এক ভদ্রলোক। মাথার কাঁচাপাকা চুল দুভাগ করা সিঁথি। পরনে ধূসর রঙের পানজাবি আর ধুতি। হাতে একটা আঁকাবাঁকা লাঠি।

কাছে এসে অমায়িক হেসে বললেন, 'বাসটা ধরতে পারেননি তো? এক্সপিরিয়েন্স না থাকলে এখানে এটাই প্রব্লেম। কোথায় যাবেন?

'কদমতলা।'

ভদ্রলোক একটু অবাক হলেন যেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কদমতলা, কার বাড়ি বলুন তো?'

'সুমোহন চ্যাটার্জির বাড়ি।'

'আচ্ছা। ওর সঙ্গে কী সম্পর্ক?'

বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আমার বন্ধু।'

ভদ্রলোক হাসলেন। 'আমি সুমোহনের জ্যাঠা। আমার নাম গৌরমোহন।'

এই অচেনা স্টেশনে সুমোহনের জ্যাঠামশাইকে পাওয়া সে-মুহূর্তে আমার কাছে রীতিমতো সৌভাগ্যের ব্যাপার। ঝটপট পায়ের ধুলো নিলাম। গৌরমোহন খুব খুশি হয়ে বললেন, 'আমি রোজ এই পাঁচমাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে যাতায়াত করি। অভ্যাস বলতে পারো। বিকেলবেলাটা আজীবন একটু হেঁটে বেড়ানো চাই।

অবাক হয়ে বললাম, 'রোজ পাঁচমাইল করে দশমাইল?'

গৌরমোহন সেকথার জবাব না দিয়ে বললেন, 'আপত্তি না থাকলে এস তাহলে। দুজনে গপ্প করতে করতে যাই। পাঁচমাইল কি আর ডিসট্যান্স বাবাজী? একালে মানুষ এত পরমুখাপেক্ষী হয়েছে বলেই তো এত প্রব্লেম।'

দীর্ঘ ট্রেন জার্নিতে এমনিতেই ক্লান্ত ছিলাম। তাছাড়া হাঁটার অভ্যাস একেবারে নেই। কিন্তু গৌরমোহনের সঙ্গে হেঁটে কদমতলা পৌঁছানো ছাড়া উপায়ও নেই। এত কষ্ট করে এসে ফিরে যাওয়ার মানে হয় না।

পিচ রাস্তায় দুজনে পাশাপাশি হাঁটছিলাম! গৌরমোহন আমার সবিশেষ পরিচয় নিলেন। ভাইপো সুমোহনের সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। সুমোহন চাকরি না করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। পৈতৃক জমিজমায় মেকানাইজড চাষবাস চালিয়ে যাচ্ছে। কদমতলার মাঠে বিদ্যুতের লাইন থাকায় ডিপ টিউবেলের জলে সেচ দেয় জমিতে।

তারপর বললেন, 'আমি অবশ্য বরাবর একলা আছি। বাবা বেঁচে থাকতেই ফ্যামিলি থেকে

সরে এসেছিলাম। আলাদা বাড়ি করেছিলাম। বিয়ে-টিয়ে করিনি! ভালই আছি কী বলো?'

সায় দিতেই হল।

গৌরমোহন একটু হাসলেন। 'বিয়ে করেছ কি বাবাজী?'

'আজ্ঞে না।'

'বয়স কত হল? সুমোহনের কাছাকাছি নিশ্চয়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে আঠাশ।' গৌরমোহন কিছু ভেবে নিয়ে বললেন, 'এই বয়সটা একটু খারাপ।' কেন জানো? এই বয়সে বেশিরভাগ লোকের ধারণা হয়, বিয়েটা এখনই না করে ফেললে জীবনটা বরবাদ হয়ে যাবে। চল্লিশের পর যেমন মৃত্যু ভয়ের উদ্ভব, তেমনি সাতাশ আটাশে এক ধরনের ভয় জন্মায় মনে —তা হল, একাকিত্বের ভয়। আমারও আটাশ বছর বয়সে এমন ফিলিং হত।'

হেসে বললাম, 'আমার তো তেমন কিছু হয় না জ্যাঠামশাই।'

'হয়, হয়। বুঝতে পারো না। তিরিশ পর্যন্ত এই একাকিত্বের বোধ জ্বালাবে। তিরিশ পার করতে পারলে অনেকটা নিশ্চিন্ত। তখন অপূর্ব রূপবতী পাত্রী সামনে দাঁড়ালেও নানা ভাবনাচিন্তা আসবে। দোনামনা হবে।'

না বলে পারলাম না—'জ্যাঠামশাই নিশ্চয় নিজের কথাই বলছেন।'

গৌরমোহন হাসলেন। 'ঠিক ধরেছ! আমার যখন বত্রিশ বছর বয়স, তখন এ তল্লাটে একটা সার্কাসদল এসেছিল। কদমতলায় শিবচতুর্দশীতে বড় মেলা বসে। সেই মেলায়।

ওঁকে চুপ করতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'বলুন জ্যাঠামশাই।'

গৌরমোহন মুখ উঁচু করে দূরে তাকিয়ে বললেন, 'সার্কাসের এক মেয়ে খেলোয়াড় মিস রঙ্গবতী—কেরলের মেয়ে। অপূর্ব সুন্দরী। আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল। শেষে নিজেই বিয়ের প্রস্তাব দিল আমাকে। রঙ্গবতীর আর দেশেদেশে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগছিল না তাছাড়া, সার্কাসের মালিক ভদ্রলোকও ব্যাড ক্যারেকটার—মাতাল। যখন তখন গালমন্দ করত।'

আবার উনি চুপ করলেন। আস্তে বললাম, 'তারপর?'

অনেকখানি চুপচাপ হাঁটার পর গৌরমোহন বললেন, 'বিয়ের প্রস্তাবে আমি রাজি হইনি। তার কিছুদিন পরে বর্ধমানে ট্রাপিজের খেলা দেখাতে গিয়ে রঙ্গবতীর একটা মারাত্মক অ্যাকসিডেন্ট হয়। সে মারা যায়। তখন কিন্তু আমার দুঃখ হল, বিয়েটা করলেই হয়তো রঙ্গবতী বেঁচে থাকত।'

তারপর একেবারে চুপ করে গেলেন গৌরমোহন। প্রায় এক মাইল রাস্তা আর কোনো কথা নেই মুখে। এবার আমার সন্দেহ হচ্ছিল, ভদ্রলোকের মাথায় গণ্ডগোল নেই তো? এদিকে সূর্য ডুবে গেছে। মার্চের দিনশেষে চারপাশে ধূসরতা ঘন হয়েছে। দুধারে এবার বাঁজা জমি-রুক্ষ ধূ ধূ অসমতল প্রান্তর। দূরে টিলাপাহাড় কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর একটা ছোট নদী পড়ল। ব্রিজে পৌঁছে মুখ খুললেন গৌরমোহন।

বললেন, 'আমার বয়স কত বলতে পারো?'

আন্দাজ করে বললাম, 'ষাটের কাছাকাছি।'

'পাগল? আমার বয়স এখন সাতাত্তর বছর তিনমাস।'

'বলেন কী?'

সে কথায় কান না দিয়ে গৌরমোহন বললেন, 'পঁয়তাল্লিশ বছর আগে এমনি মার্চে গ্রেট শিয়ান সার্কাসের মিস রঙ্গবতীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার দেখ বাজী, ওই যে তার অ্যাকসিডেন্টে মৃত্যু হল এবং সে মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী ভেবেছিলাম, র্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে সেই মৃত্যুর অনুশোচনা আমাকে দগ্ধ করে মারছে। একটি মেয়ে মার কাছে একটা নতুন জীবন চেয়েছিল। দিইনি—ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। এই নিষ্ঠুরতা কি প নয়? মহাপাপ। পাপের গ্লানি থেকে আজও মুক্ত হতে পারছি না।'

আমার কাছে ব্যাপারটা অবশ্য ছেলেমানুষী মনে হচ্ছিল। তবু ওঁর কণ্ঠস্বরে গাঢ়তা ছিল। শ্চয়ই ভদ্রলোক সত্যি সত্যি কষ্ট পাচ্ছেন। তাই বললাম, 'পুরনো ঘটনা নিয়ে দুঃখ করে ভ নেই জ্যাঠামশাই।'

গৌরমোহন আমার কথায় কান করলেন না। ডানদিকে ঘুরে কী যেন দেখতে থাকলেন। রপর হঠাৎ রাস্তা থেকে নেমে হন হন করে বাঁজা মাঠের ওপর হাঁটতে থাকলেন। বললাম, কাথায় যাচ্ছেন জ্যাঠামশাই?'

গৌরমোহনের সিল্যুট মূর্তিটা আবছা আঁধারে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তখন দৌড়ে গিয়ে ওঁকে কতে থাকলাম, 'জ্যাঠামশাই! জ্যাঠামশাই!'

কোনো সাড়া এল না। তাঁকে আর দেখতেও পাচ্ছিলাম না। কয়েক মুহূর্ত হতবাক হয়ে ড়িয়ে থাকার পর রাস্তায় ফিরে এলাম। যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। ভদ্রলোকের মাথায় গোল আছে।

কিন্তু আমার অবস্থা শোচনীয়। এই সন্ধ্যাবেলা অজানা জায়গায় এসে বিপদে পড়া গেল খছি। কদমতলা আর কতদূর কে জানে! পথে একজনও লোক নেই যে জিজ্ঞেস করব। অগত্যা সোজা হাঁটতে শুরু করলাম। অনেকদূরে একটা আলো দেখা যাচ্ছিল।

*   *   *   *   *

কীভাবে কদমতলা গ্রামে সুমোহনের কাছে পৌঁছলাম, বলার প্রয়োজন নেই। সুমোহন ল, বাসটা দেখে ফিরে এসেছিলাম। ভাবলাম তুই আসিস নি। যাক্ গে, কষ্ট না করলে কেষ্ট লে না। এক্সপিরিয়েন্স হল বল্।'

'তা হল। কিন্তু তোর জ্যাঠামশাই গৌরমোহনবাবুর সঙ্গে স্টেশনে দেখা না হলে কি এই চ মাইল হেঁটে তোর বাড়ি আসতাম ভাবছিস?'

আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল সুমোহন। বলল, 'এক মিনিট। কী বললি? আমার ঠামশাই গৌরমোহনের সঙ্গে... কী বলছিস যা তা?'

'কেন?' ভড়কে গিয়ে প্রশ্ন করলাম!

সুমোহন গলা চেপে বলল, 'ভুল করছিস না? চেহারা কেমন বল তো?'

চেহারার বর্ণনা দিলাম। তারপর আগাগোড়া সব বললাম।

শুনে সুমোহন একটু গুম হয়ে রইল। তারপর বলল, 'বর্ণনা আর ওইসব কথাবার্তা—মি রঙ্গবতীর গল্প—সব মিলে যাচ্ছে অবশ্য। জ্যাঠামশাই স্টেশন অব্দি পায়ে হেঁটে যাতায়া করতেন বিকেলবেলা। তাও সত্য। কিন্তু ...'

'কিন্তুটা কী?'

সুমোহন শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'কিন্তু জ্যাঠামশাই তো বেঁচে নেই। তিন বছর আ মারা গেছেন।'

'অসম্ভব!' আমি জোর প্রতিবাদ করলাম।

দরজার আড়াল থেকে সুমোহনের বউ বলে উঠল, 'কবে থেকে বলছি, ওঁর পিণ্ডদানে ব্যবস্থা করে এস গয়া গিয়ে—কথা কানে নিচ্ছ না। আমার দাদাকেও তুমি পাত্তা দাওনি। অ দাদার বেলাতেও ঠিক এমনি ঘটেছিল!'

সুমোহন হতাশভাবে হাসল। 'কিছু বোঝা যায় না! ভ্যাট্! জ্যাঠামশাইয়ের ব্যাপা বেঁচেও যেমন, মরেও তাই। যখন বেঁচেছিলেন, তখনও এমনি করে অচেনা লোককে ধি রঙ্গবতীর গল্পটা শোনাতেন। মরে গিয়েও শোনাতে ছাড়ছেন না।'

ক্লান্তিতে আমার শরীর বিধ্বস্ত। কোনো কথা বললাম না। সে মুহূর্তে এক কাপ চা ছা আর কিছু ভাবতেও ইচ্ছে করছিল না।

ফৌজী জুতো

কানো-কোনো মানুষকে দেখলে জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্য জাগে। যেমন বাবুরাম সাহানী। বাক হয়ে ভাবতাম, লোকটা খৈনি-তামাক বেচেই জীবনটা কাটিয়ে দিল। সেই একই পোশাক, চহারা, পা ফেলার ভঙ্গি, অতিশয় নম্র আচরণ। অথচ দেখতে দেখতে পৃথিবীর কত দ্রুত দবদল ঘটে গেল।

আমাদের এই সীমান্ত এলাকায় তখন প্রায়ই দুদেশের ফৌজী লোকেদের সংঘর্ষ বাধত। ত্তেজনা থমথম করত কিছুদিন। কারফিউ, ফৌজী আনাগোনা, মাঝে মাঝে পদ্মার দিকে লির আওয়াজ। তার মধ্যেও দেখতাম খৈনিওয়ালা বাবুরাম নির্লিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফৌজী ক্যাম্পে গিয়ে খৈনি বেচছে। তার বেলা কারফিউ নেই।

আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় গঙ্গাধর খৈনি খেতেন। বাড়ির সবাই ওঁকে বলতাম ঙ্গাখুড়ো। ঢ্যাঙা সিড়িঙে রাগী চেহারা। তর্কাতর্কি গালমন্দ করে খৈনি কিনতেন। তবু বাবুরাম াসিমুখে এসে দরজায় হাঁক দিত নিয়মিত—'বুড়াবাবু বাবুরাম আসলো-ও-ও।' একজন রাশ্রিত ব্যর্থ মানুষ গঙ্গাধরের এই সময়টুকু ছিল উত্তেজনা ও সুখের।

লোকের পায়ের দিকে তাকানো আমার স্বভাব নয়। কিন্তু বাবুরামের পায়ের কাঁচা চামড়ায় তরি ধ্যাবড়া নাগরাজুতো আমার চোখ টানত। আসলে ওই বিস্ময়। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা দুটো বর্ণ নাগরা থপথপিয়ে হাঁটছে আর হাঁটছে দিকপাতহীন পরিবর্তনহীন—ক্ষেতখামারে, রাস্তার লোয়, গাঁয়েগঞ্জে, ফৌজীআড্ডায় এবং কিনারায় বহতা ধুধু আদিগন্ত পদ্মা।

বাবুরাম বলত, রাজমহলের ওদিকে নওলপাহাড়ীতে তার জন্ম। গঙ্গাখুড়োর মেজাজ ভাল াকলে খুব মন দিয়ে নওলপাহাড়ীর গল্প শুনতেন। মুচকি হেসে বলতেন, লেকিন জরু! বুরাম বিনীতভাবে বলত, জরুকী ক্যা কাম বুড়াবাবু? জরু মানেই ঝামেলা। তাছাড়া একটা খের রুটি ঠিকমতো জোটে না, দুটো মুখ হলে তিনটে হবে—কালক্রমে চার পাঁচ ছয়ভি হবে। বুরাম শ্বাস ফেলে বলত, দশভি হতে পারে। কী দরকার!

কিন্তু সবাই ভাবত, বাবুরামের এটা ওজর। এতকাল খৈনি বেচে ভেতর-ভেতর টাকা মিয়েছে। লালগোলায় সময়মতো মহাজনের গদি খুলে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসবে। ংলামুল্লুকে এটাই নাকি ওদের ট্রাডিশন।

হঠাৎ একদিন বাবুরামের পায়ে নাগরার বদলে দেখি অবিশ্বাস্য একজোড়া বুটজুতো। াব্দাগোব্দা ঝকমকে প্রায় আনকোরা বুটজুতো। গঙ্গাখুড়ো চোখ-টেরচে দেখে বললেন, —ভাল করেছ বাবুরাম। হাঁটাহাঁটির, পক্ষে জিনিসটা মজবুত।'

বাবুরাম লাজুক হেসে বললেন, 'ফৌজী জুতো বুঢ়াবাবু। সীমান্ত নীলামে কিনলাম।'

প্রতিবার সীমান্ত-সংঘর্ষের পর এ ধরনের জিনিসপত্র ক্যাম্প থেকে নীলামে বেচা হত।

গঙ্গাখুড়ো সেবারই একটা কম্বল কিনেছিলেন তিন টাকায়। মুড়ি দিয়ে গঞ্জের বাজারে চা খেতে যেতেন প্রতি সন্ধ্যায়। বাবুরামের বুটজুতোর শতমুখে তারিফ করে বললেন, 'এই এক জোড়া ছিল বুঝি, দেখতে পেলে নিশ্চয় কিনতাম।'

আমার ছোটভাই ছোটকু বাঁকা ঠোঁটে বলল, 'আমি বেট রেখে বলছি, ওই বুটে রক্তের ছাপ আছে।'

আমি অবাক। বাবুরাম ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। গঙ্গাখুড়ো রুষ্ট হয়ে বললেন 'মানে?'

'পদ্মার চরে কোন সোলজারের ডেডবডি থেকে খুলে এনেছে।' ছোটকু মুচকি হাসল 'কম্বলটা বেছে নেবেন।'

বাবুরাম গম্ভীর হয়ে চলে গেল। দুপুরবেলা জানলা থেকে দেখলাম, পুকুরপাড়ে ঝোপের আড়ালে গঙ্গাখুড়ো বসে আছেন। খুঁজে কারণ আবিষ্কার করলাম। ঘাসের ওপর খাকিরঙের কম্বলটা মেলে দেওয়া আছে। হঠাৎ দেখে মনে হবে, শীতের প্রকোপে বিবর্ণ একটুকরো ঘাসেঢাকা মাটি। মানুষের রক্তের প্রতি মানুষের এ কী অদ্ভুত সংস্কার।

ক'দিন পরে বাবুরাম খৈনি বেচতে এল ফের। গঙ্গাখুড়ো কোথায় যেন গিয়েছিলেন। তাঁ হয়ে খৈনিটা আমিই রাখলাম। তারপর লক্ষ্য করলাম, বাবুরাম কী যেন বলবে-বলবে করছে মুখটা কেমন বিষণ্ণ, থমথমে, বললাম, 'কী বাবুরাম?'

'দাদাবাবু, একটা বাত বলব।'

বাবুরামের কথা শুনে হাসি পাচ্ছিল—কিন্তু ওর কাছে এই হাসি কোনো যুক্তি নয় ছোটকুটা যত নষ্টের গোড়া। বাবুরাম বলল, এই ফৌজীজুতো তাকে বহুৎ ঝামেলায় ফেলেছে দিনভোর কিছু টের পায় না। কিন্তু দিনশেষে যখন গাঁওয়াল করে ফেরে, সুনশান ফাঁকা রাস্তা জুতোজোড়া যেন জ্যান্ত হয়ে ওঠে। তার দুপায়ে টাল বাজে। দেমাগ বদলে যেতে থাকে বিগড়ে যায়। বাবুরামের খালি রাগ হয়, মাথার ভেতর হু-হু করে আগুন জ্বলে। ইচ্ছে করে দিই হারামী দুনিয়াটার মুখে দো-দশ লাথি। আর অচানক পায়ের টান বাজতে তাকে কা তোলে টাট্টু ঘোড়া—পায়ের আওয়াজ শুনে টহলদার ফৌজী লোকেরা কাল সন্ধ্যায় খুব ধমকে দিয়েছে।

তার চেয়ে আজীব ঘটনা, রাতে বারবার নিঁদ টুটে গেছে আর বাবুরাম দেখেছে ঘ কোনায় রাখা জুতোর ভেতর পা গলিয়ে যেন এক বন্দুকবাজ ফৌজী আদমি দাঁড়িয়ে তাকে হুকুমদার হাঁকছে। এ জিনিস সামলানোর হিম্মত বাবুরামের মতো নাদান আদমির নেই। যে বুড়াবাবু হিম্মতওয়ালা আছেন—জিনিস তাঁর খুব পছন্দও বটে। আড়াই রুপেয়ায় কেনা হলে দু রুপেয়ায় তার আপত্তি নেই।

এসব শুনে হাসতে হাসতে বললাম, গঙ্গাখুড়ো আর নেবেন বলে মনে হয় না। কম্বলটা ওপর ওঁর আর তেমন রুচি দেখছি না। বাবুরাম, তুমি অন্য কোথাও চেষ্টা করো।'....

পরদিন দেখি, আমাদের মহিন্দার গণেশ সেই বুট জোড়া পায়ে দিয়ে থপথপিয়ে ঘুরছে চোখে হেসে বলল, 'দেড় টাকায় গছিয়ে দিল সালানী। কী করি? তবে বাবুদা, খুব কাজে

জিনিস। মাঠেঘাটে ঘুরতে—তার ওপর রেতের বেলা ধানচুরি ঠেকাতে এর জুড়ি নেই। আওয়াজ শুনেই ক্ষেতে কাস্তে ফেলে চোর পালাবে।'

তারপর গণেশ গণ্ডগোল বাধাল। ক্ষেতের মুনিশ এসে নালিশ করে, গণশা মেরেছে। যাঁতনবাবু ডাক্তার পর্যন্ত বাবার কাছে ছুটে এলেন—'ওই ষণ্ডটাকে সামলান তো মশাই! নদুপুরে তারা দেখেছে? ছোটমুখে বড় কথা—যা না হয় তাই বলল একশো লোকের সামনে।' গণেশ একটু তেজী ছোকরা বটে; কিন্তু এমন নালিশ কখনও দেখা যায় নি। ব্যাপারটা ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছল, যখন গণেশ কেন কে জানে ইবাদত খান কাবুলীর মাথা ফাটিয়ে দিল। পুলিশের হ্যাপা সামলাতে বাবা অস্থির। গণেশ গা ঢাকা দিয়ে রইল কয়েকটা দিন। আর সেই সময় দেখি, মড়াইয়ের তলা থেকে গঙ্গাখুড়ো সেই বুটজোড়া কখন টেনে বের করেছেন। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'নিধিরাম সেপাই! মামদোর পো! বাপের জন্মে জুতো পরেনি—মেজাজ বিগড়ে গেছে মরামানুষের জুতো পরে। ধরাকে সরাজ্ঞান করেছে।'

বুট দুটোর ফিতে আলগোছে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি পরবেন কি?'

গঙ্গাখুড়ো আরও খাপ্পা হয়ে বললেন, 'চোখ টাটাচ্ছে! মিলিটারি জিনিস পরার হিম্মত আছে যে পরবে?

বেরিয়ে গেলে ভাবলাম আঁস্তাকুড়ে নয় তো পদ্মার জলে ফেলতে যাচ্ছেন। তারপর পরিস্থিতি হল আগের মতো। গণশাও আণ্ডারগ্রাউন্ড থেকে বেরিয়ে এল। জুতোর কথা ভুলেও জিজ্ঞেস করল না। তাছাড়া গঙ্গাখুড়ো এ ব্যাপারে নির্বাক, তবে গণেশ আগের চেয়ে ভালমানুষ হয়ে গেল দেখে অবাক লাগছিল।

এক বসন্তরাতের জ্যোৎস্নায় পদ্মার ধারে ঘুরতে বেরিয়েছি। হঠাৎ একটু তফাতে বটতলার কোন কে চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাবাউট টার্ন!' তারপর 'লেফ্‌ট রাইট্‌ .... লেফট্‌ রাইট .... লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌' ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ মার্চের আওয়াজ। ফৌজী লোকেদের প্যারেড হচ্ছে বুঝি। কয়েক পা এগিয়ে দেখি, কালো ভূতের মতো এক মূর্তি আপন মনে ওই কাণ্ড করছে। লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌ হতে-হতে বাজখাঁই চিৎকার 'হল্ট'—তারপর হতভম্ব হয়ে গেলাম। গঙ্গাখুড়ো!

বটতলার ছায়ায় দাঁড়িয়ে শুনলাম, গঙ্গাখুড়ো চাপা গর্জনে কাউকে বলছেন, 'আর একপা এগোলেই ফায়ার!' আরও কীসব বলে শাসাতে, শুরু করলেন—সামনে কাউকেও দেখলাম না। জ্যোৎস্নায় গঙ্গাখুড়োর ছায়ামূর্তি খুব দাপাদাপি করে অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে যেন ফৌজী কায়দায় লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

লজ্জা পাবেন ভেবে সামনে গেলাম না। কিন্তু তারপর থেকে গঙ্গাখুড়োর মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলাম। মেজাজ আগেও একটু তিরিক্ষি ছিল। ক্রমশ তা আরও তিরিক্ষি হয়ে উঠল। বাড়িতে কানাকানি শুনতাম, গঙ্গাধরের মাথার গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। ওঁর বাবারও নাকি তাই ছিল। শেষে পাগল হয়ে মারা যান। আমার সন্দেহ হত ভুতুড়ে ওই বুটজোড়াই এর কারণে। কিন্তু আমার কথা কেউ বিশ্বাস করছে বলে মনে হত না।

তবু কেন যে অভিশপ্ত জুতোজোড়া গঙ্গাগুড়ো ছাড়লেন না কে জানে। একবার এক

ভদ্রলোক গঙ্গাখুড়োর মেজাজী কীর্তিকলাপ বরদাস্ত করতে না পেরে যাচ্ছেতাই অপমা করেন। আর দুপুরে গঙ্গাখুড়ো পদ্মার ধারে সেই বটগাছে ঝুলে পড়েন। পায়ের ঠিক তলা বুটদুটো রাখা। কেউ নিতে সাহস পায়নি।

শ্মশানকৃত্যের পর জিনিসটা আমিই ফেলতে গেলাম। রাত প্রায় নটা বেজে গেছে দা করতে। চাঁদটা সবে পদ্মার মাথায় উঠেছে। হঠাৎ মনে হল সত্যি এই জুতোদুটো ভুতুড়ে—না নেহাত মনের ভুল আমার, বাবুরাম খৈনিওয়ালার মতো? সে নিরক্ষর মানুষ। আমি লেখাপড়াজানা ছেলে। আমার কেন কুসংস্কার থাকবে? চরে দাঁড়িয়ে জেদ করে জুতোজো পায়ে ঢোকালাম। কিছুক্ষণ বালির ওপর মসমস শব্দ করে হেঁটে বেড়ালাম। জুতোজো আমার পায়েও জুতসই খাপ খেয়ে গেছে। কিন্তু যখন ভাবছি, এ কোন মৃত সৈনিকের জুতো তখনই বুকটা ধড়াস করে উঠছে। নির্মল জ্যোৎস্নার চরে এই আগামী ভয়কে কিছুতে তাড়াতে পারছিলাম না। অথচ ও আমার একটা লড়াই মরণপণ। মরিয়া হয়ে উঠছিলাম ক্রম এ লড়াইয়ে আমাকে জিততেই হবে। ধুপ ধুপ শব্দ তুলে চরটার এ-প্রান্ত থেকে সে-প্রান্ত আ দাপটে হাঁটতে শুরু করলাম। তারপর টের পেলাম, যেন আমি অন্যের অনুগত—এ হাঁটাহাঁটি, এই লড়াই, কোনো কিছু আমার নয়। ভীত বিপন্ন কোণঠাসা প্রাণীর মতো আমা মাথার ভেতর আমি গুটিয়ে বসে আছি এবং আমার শরীর অন্যের হুকুম তামিল করছে লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌ .... লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌ ..... অ্যাবাউট টার্ন এবং লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌ ..... লেফ্‌ট্‌ রা ....আমার হাতে অদৃশ্য রাইফেল। আমার পরণে ফৌজী পোশাক মাথায় ইস্পাতের হেলমে আমার সামনে ঘাপটি মেরে এগিয়ে আসছে ফৌজী দুশমন, আমি গুলি না করলেও সে গু করবে এবং গুলি করবেই। 'ফায়ার'। আমার সারা শরীরের ভেতর গমগম করে উঠল নি চিৎকার 'ফায়ার!'

অমনি পা হড়কে ধপাস করে পড়ে গেলাম এবং জুতোদুটো এক ঝটকায় খুলে জলে ছু ফেলে দৌড় দিলাম। নিজের স্যান্ডেল কোথায় পড়ে রইল, খুঁজে দেখার সাহস ছিল না।

এর কিছুদিন পরে বাবুরাম সাহানী খৈনিওয়ালার পায়ে আমার এই স্যান্ডেল দুটো দে কোন মুখে বলি এ দুটো আমার? জিজ্ঞেস না করলেও বাবুরাম বলল, বাবুদাদা যা ভাবছেন নয়। এ জিনিস ফৌজী নয়। এক রাখালছেলের কাছে আঠান্নি দিয়ে কিনে পায়ে পরে জেনেশুনে ফৌজী জিনিস পরার হিম্মত তার নেই বলেই বাবুরাম খৈনি বেচে জীবন কাটা আমিও অবশ্য ভাবতে গেলে তাই। তার চেয়ে জোরালো আর কী করব? কী করতে পার এতকাল পরেও!.....

ফাঁদ

াত অনেক হলে বাগানের দিক থেকে ক্র্যাঁও-ক্র্যাঁও করে একটা পেঁচা ডেকে ওঠে। মল্লিকদের কুরটা সন্দিগ্ধভাবে দু-একবার ডেকেই সপ্রশ্ন চুপ করে যায়। আমি জানি, এবার তার আসার ময় হয়েছে।

আমাদের বাড়িটা বেশ বড়। লোকজন তত কিছু নেই। ওপরে-নিচে চারটে করে ঘর। জের দুটো ঘরে থাকেন দূর সম্পর্কের আত্মীয় আর তাঁদের মেয়ে শ্রাবন্তী। একটা ঘরে রনো আসবাবের আবর্জনা। বাকিটাতে বাড়ির সাবেক আমলের চাকর ষষ্ঠীদাস।

তার বয়সও প্রায় সত্তর হয়ে এল। সারারাত খক খক করে কাশে আর একটু শব্দ হলেই ড়ঘড়ে গলায় বলে, যাঃ! যাঃ! আমি জানি কাকে সে এমন করে তাড়াতে চায়।

ওপরের চারটে ঘরে আমার জীবনযাত্রা। আমার আর শ্রুতির। শ্রুতি বড় ঘুমকাতুরে। সে ছু টের পায় না। এই যে আমি কাকে এত রাতে দরজা খুলে দিই, কার সঙ্গে কথা বলি, কিচ্ছু। আমার আদরের ভেতর কখন গভীর ঘুমে এলিয়ে যায়। তার শরীরের শ্বাসপ্রশ্বাস শুনতে নতে হঠাৎ চমক ভাঙে প্রাকৃতিক সংকেতের মতো পেঁচার চিৎকারে। তারপর বাগানের দিকে শন করে ওঠে বাতাস। গাছপালা দুলতে থাকে. পুরনো জানলাটা খট খট করে শব্দ করে। রপর সিড়িতে যেন পায়ের শব্দ। সে আসছে। উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠি। সিড়িতে যেন য়ের শব্দ। সে ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না।

দরজা খুলে আমি একটু সরে দাঁড়াই। টের পাই তার ঘরে ঢোকা .... তার শরীরের গন্ধে। টা ছেঁড়া ঘাসের মত কিংবা ভিজে মাটির মত, অথবা পাখির বাসার মত ঈষৎ ঝাঁঝাল, ঠক বলা কঠিন। কারণ তার গন্ধটা যেন খুবই প্রাকৃতিক। হয়তো সে প্রকৃতির খুব তরদিকে চলে গেছে বলেই। জীবজগতের অবচেতনায় ওই গন্ধ থাকে কি? বুঝতে পারি। তার অশরীরী শরীরের কোন গন্ধ থাকার কথা নয়। তাকে প্রশ্ন করলে সে বলে, তাই ঝি? জানি না তো।

তাকে বলি, তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে।

সে বলে, আমি তো এরকমই।

না। তুমি এরকম ছিলে না।

সে একটু হাসে। তা ঠিক। ছিলাম না।

কেমন ছিলে সে তো মনে পড়ে তোমার, নাকি পড়ে না?

বোকা! মনে পড়লে এলাম কেন?

তাহলে তুমি নিজেকে দেখাও। আমারও তো তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে।

তুমি ভয় পাবে।

তোমাকে আমি ভয় পাবো না স্মৃতি ! তুমি আমার অপরাংশ ছিলে একসময়।

একটু পরে বলে, পারছি না। আমার কষ্ট হচ্ছে।

তাহলে থাক।

বরং চল আমরা বাগানে যাই। ....

আমরা বাগানে গিয়ে বসে থাকি। কথা বলি। পুরনো সব কথা .... স্মৃতি থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে। দুঃখের কথা। সুখের কথা। কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই ষষ্ঠীদাসের ডাক শুনতে পাই। সে লণ্ঠন হাতে আমাকে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে আসে। সে বড় ধূর্ত মানুষ। সব টে পায়। আমাকে বকাবকি করে। বলে, ঘুম হয় না তো ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন? এমনি ক হিমে বসে থাকলে যে উল্টে অসুখে পড়বে। ....

হতচ্ছাড়া ষষ্ঠীদাসের দৌরাত্ম্যে অবশেষে বাগানে গিয়ে কথা বলা ছাড়তে হল। কি বুঝতে পারলাম, কেন স্মৃতি ঘরে বেশিক্ষণ থাকতে চাইত না। শ্রুতিকে ও ঈর্ষা করত ঘুম শ্রুতির পাশে গিয়ে দাঁড়ালে আমার খুব ভয় হত। বলতাম, ওখানে কী করছ? এখানে এস শ্রুতি জেগে যেতে পারে।

জাগলেও তো আমাকে দেখতে পাবে না।

কে জানে! মেয়েরা হয়তো সব টের পায়।

সে হাসত। হুঁ, পায়ই তো! তুমি যখন শ্রুতিকে আদর কর, দূর থেকে টের পাই। মনে আমার যদি শরীর থাকত !

ওকে মেরে ফেলতে তো?

হুঁ।

এখন পার না?

না। .... একটু পরে বলল ফের, আমি আর কিছু পারি না। শুধু যাওয়া-আসা ছাড়া।

মনে হল, ও কাঁদছে। বললাম, ওকে ঈর্ষা কোর না! ও তোমারই সহোদরা।

শোন!

বল।

তুমি কাকে বেশি ভালবাস এখন ... শ্রুতিকে না আমাকে ?

দুজনকেই।

মিথ্যা! আমি তোমার চারঘরের সংসার ঘুরে দেখেছি এখন যা যা যেমন হয়ে আ আমার সময়ে তেমন কিছুই ছিল—না। ওই ড্রেসিং টেবিলটা পর্যন্ত নতুন! আর শ্রুতির শাড়ি ! কত বিদেশী সেন্ট ! কত .....

শ্রুতি একটু বিলাসী প্রকৃতির মেয়ে। আর তুমি জান, তুমি ছিলে সাদাসিধে .... সাজ ভালবাসতে না। টাকাকড়ি খরচ করতে দিতে না। মানে, সেবার তোমার জন্য অত সু একখানা কাঞ্জিভরম কিনে আনলাম! তুমি শ্রুতিকে পরতে দিলে। আর একবার ....

হঠাৎ থেমে গেলাম। টের পেলাম। ও নেই। চলে গেছে। এখনকার মত। মাথা ভাঙ আর ফিরে আসবে না। কোথায় যায় ও? জীবজগতের সীমানা পেরিয়ে প্রকৃতির

গভীরতর স্তরে গিয়ে বসে থাকে ও? আমি যদি ওকে অনুসরণ করে যেতে পারতাম সেখানে! ....

একরাতে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টি থামল না। মধ্যরাতে একটু কমল মাত্র। তারপর তার আসার সংকেত শুনতে পেলাম বাগানের দিকে। দরজা খুলে দিলাম। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

সেই মুহূর্তে শ্রুতি জেগে গেল! চমকে ওঠা গলায় বলল, কোথায় গেলে?

এই তো!

অন্ধকারে দরজা খুলে কোথায় যাচ্ছ?

সে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে দিল। দরজা আটকে দিয়ে বললাম, বৃষ্টি দেখতে যাচ্ছিলাম বারান্দায়।

শ্রুতি একটু চুপ করে থাকার পর বলল, জানলা থেকে দেখা যায় না?

ছাঁট আসছে যে!

তোমার কী হয়েছে?

কই, কিছু না।

আমার ধারণা, তুমি সারারাত জেগে থাক।

যাঃ! কে বলল?

আমি জানি। তুমি .... তোমার শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না আমার পাশে! শ্রুতি শ্বাসপ্রশ্বাস মিশিয়ে বলল, কতবার হাত বাড়িয়ে তোমাকে খুঁজি পাই না।

আশ্চর্য! আমি তো তোমার পাশেই থাকি, না।

শ্রুতি বালিশে মুখ গুঁজে বলল, কোথায় থাক তুমিই জান।

ওর কাছে এসে পিঠে হাত রেখে বললাম, ঘুমোও।

তুমি?

আমার ঘুম পাচ্ছে না! আর বৃষ্টিটা কী সুন্দর—শোন!

আমি জানি, কেন ঘুম হয় না তোমার। দিদির কথা মনে পড়ে তো?

হঠাৎ ওকথা কেন শ্রুতি ?

হাসতে হাসতে বললাম, ছিঃ! যে মরে গেছে তাকে ঈর্ষা করতে আছে?

কে মরে গেছে? দিদি মরেনি দিব্যি বেঁচে আছে।

পাগল! কী সব বলছ শ্রুতি ?

শ্রুতি ঝকঝকে চোখে তাকিয়ে বলল, বেঁচে নেই—তোমার মনে? ষষ্ঠীদা বলে, তুমি রাতে বাগানে গিয়ে বসে থাক—কেন আমি যেতে দিই এমন করে? কেন বাগানে যাও তুমি? বল!

ঘুম আসে না।

এত ভাবলে ঘুম তো আসবেই না। শ্রুতি আবার পাশ ফিরে শুল। ফের আরম্ভ করে বলল, আরও অনেক কথা জানি। বলব না।

কী জানে, সে কিছুতেই বলল না। কিছুক্ষণ সাধাসাধি করে ছেড়ে দিলাম। মনে হচ্ছিল শ্রুতি কেঁদে ফেলবে—অথবা এক নেপথ্যের কান্না ওকে ভিজিয়ে দিচ্ছে ভেতর থেকে। অবশ্য

খুব শক্ত মেয়ে সে জানি। স্মৃতির একেবারে উল্টো। সে প্রচণ্ড সাহসী। বেপরোয়া। স্পষ্টভাষী মেয়ে। কিন্তু স্মৃতির মতো জেদি নয়।

পরের রাতে আমার উৎকণ্ঠা ছিল স্মৃতির আসা না টের পেয়ে যায় সে। এরাতে বৃষ্টি ছিল না। নরম চেহারার একটুকরো চাঁদ ছিল বাগানের মাথায়। পোকামাকড় ডাকছিল বৃষ্টির স্মৃতি নিয়ে। ফিকে জ্যোৎস্নায় ভিজে গাছপালা আর ঘাসের গন্ধের সঙ্গে মিশে রাতের ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল ঘরে। ভাবছিলাম, কাল রাতে ফিরে গেছে অমন বাধা পেয়ে, আজ কি আর আসবে স্মৃতি?

এল—কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নয়। জানালার ওধারে দাঁড়িয়ে বলল, এসেছি।

এ রাতে কোন প্রাকৃতিক সংকেত শুনলাম না। কোন পূর্বাভাস না। মল্লিকদের কুকুরটাও বুঝি অগাধ ঘুমে লীন। বললাম, ভেতরে আসছ না কেন?

একটা কথা বলতে এলাম শুধু।

কী কথা?

আমি আর আসব না।

জানালার রড শক্ত করে ধরে বললাম, না। তোমাকে আসতেই হবে—আমি যতদিন বেঁচে আছি। আমার রাতগুলো তোমার জন্যেই রেখেছি, আর দিনগুলোকে শ্রুতির জন্যে।

সে একটু হাসল। তুমি বড়লোক মানুষ। তোমার কত খেয়াল!

না, না। খেয়াল নয়। এমনটা হয়ে গেছে—তুমি বুঝতে চেষ্টা কর লক্ষ্মীটি! চিরকাল আমার বরাতটাই এরকম। কিছু নিয়ন্ত্রণে থাকে না আমার। আরও দেখ, আমার সব বাস্তব অর কল্পনাও আমার হাতে বাইরে চলে গেছে। ওরা দুটো দিকে, মধ্যিখানে আমি। টাগ অফ ওয়ারের নিষ্ঠুর খেলা।

ওসব কথা আমার মাথায় ঢোকে না আমি যাই!

শোন, শোন! একটা কথা বলে যাও।

কী?

তুমি কেন আর আসবে না? শ্রুতির জন্যই কি?

শ্রুতির জীবন আমার মত নষ্ট হয়ে যাক, তা চাইনে। আমি তার দিদি।

শোন, শ্রুতির বদলে তোমাকেই চাই।

এমনি করে একদিন আমার বদলে শ্রুতিকে চেয়েছিলে, মনে পড়ে? কী? চুপ করে গেলে যে?

আমি অনুতপ্ত। ক্ষমা কর।

দেখ আমি যেখানে আছি, সেখানে ক্ষমা বা অনুতাপ বলে কোন কথা নেই। তোমার মনে পড়ে? ওই খাটে আমি শুয়ে ছিলাম। আমার শ্বাসকষ্ট। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। তখন তুমি আর শ্রুতি পাশের ঘরে ছিলে। একটু পরে শ্রুতি এল। ওকে দেখেই চমকে উঠলাম। তার শরীরে তোমার ছাপ পড়েছিল। জলের গ্লাস তার হাতে কাঁপছিল।

তুমি ধাক্কা মেরে গ্লাসটা ফেলে দিলে। শব্দ শুনে দৌড়ে এলাম।

জানালায় কী করছ?

শ্রুতির চমকে ওঠা প্রশ্নে আমিও খুব চমকে উঠলাম। সে টেবিলল্যাম্প জ্বেলে বিছানায় উঠে বসল। তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আবার তুমি জেগে আছ?

ঘুম আসছে না। দেখ অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠেছে।

শ্রুতি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আস্তে বলল, তুমি চাও, আমিও দিদির মত মরে যাই, তাই না?

আঃ কী বলছ শ্রুতি !

তুমি বুঝি ভাবছ আমি কিছু টের পাই না? শ্রাবন্তীর দিকে এবার তোমার চোখ পড়েছে।

ছিঃ! চুপ কর।

শ্রুতি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। না—চুপ করব না। তুমি চাইছ, আমিও দিদির মত সুইসাইড করি, আর তুমি শ্রাবন্তীকে বিয়ে কর।

শ্রুতি ! চুপ কর। কী বলছ তুমি? স্মৃতি সুইসাইড করেনি।

করেছিল। আমি জানি। শ্রুতি নিষ্ঠুর কণ্ঠস্বরে বলল। ক্যাপসুলটা খেয়ে রিঅ্যাকশন হচ্ছিল, ডাক্তার সেটা বন্ধ করতে বলেছিলেন। দিদির বালিশের তলায় কৌটোটা দেখেছিলাম। কৌটোটা খালি ছিল।

আশ্চর্য। তুমি বলনি! কেন বলনি শ্রুতি ?

তুমি কষ্ট পাবে ভেবে। শ্রুতি মুখ নামিয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকল।

তার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকলাম। কিছুক্ষণ পরে সে শুয়ে পড়ল। টেবিলল্যাম্প নিভিয়ে দিল। জানলার বাইরে বাগানের দিকে জ্যোৎস্নার ভেতর কুয়াশার মত কী একটা দাঁড়িয়ে আছে। স্মৃতিই কি ? শ্রুতি কে ডাকলাম, শ্রুতি, শোন।

কী?

শ্রাবন্তীর কথা তোমার মাথায় এল কেন? তার সঙ্গে তো আমার দেখাও হয় না। তেমন কিছু আলাপও নেই। তাছাড়া সে তো তোমার কাছেও আসে না।

বাইরে কী হয় তুমিই জান। সারাদিন কোথায় থাক, কী কর, আমি কি দেখতে যাই?

শ্রুতি, ফ্লাড রিলিফের কাজে আমাকে খুব ব্যস্ত থাকতে হয় আজকাল। অন্যকিছুতে মন দেবার সময় কোথায়।

তুমি লিডার মানুষ। তোমার মনে কত দয়া। এমনি করে সেবার ফ্লাডের সময় তুমি আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলে। তখন বুঝিনি, এই বাড়িটা তোমার একটা ফাঁদ।

ক্ষুব্ধ হয়ে বললাম, ঠিক আছে। ওদের চলে যেতে বল। ওদের এরিয়া থেকে ফ্লাডের জল নেমে গেছে। কিন্তু আমার অবাক লাগছে শ্রুতি। নিজের ওপর রাগ হচ্ছে। কাল রাতে তুমি বললে, স্মৃতিকে ভুলতে পারিনি। আজ রাতে বলছ, শ্রাবন্তীর জন্য .....

কথা কেড়ে শ্রুতি বলল, তাই ভেবেছিলাম। পরে মনে হয়েছিল, যে মরে গেছে তার পেছনে কেন তুমি ছুটবে? যে বেঁচে আছে রক্তমাংসের শরীরে, তার পেছনে ছোটাই স্বাভাবিক। নয়? বল তুমি।

কিন্তু তুমি তো আছ! তুমি তো জীবিত।

আমি বাসি হয়ে গেছি। দিদিও তোমার কাছে বাসি হয়ে গিয়েছিল। তাই তুমি আমার পেছনে ছুটেছিলে। কিন্তু জেনে রাখ, আমি দিদির মত বোকা নই।

তর্ক করে লাভ নেই। ফেমিনিন লজিক। আমি চুপ করে থাকলাম। শ্রুতিও চুপ করে থাকল। কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলাম। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। শ্রুতি আমাকে বাধা দিল না।

বাগানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম কতক্ষণ। স্মৃতি কি আর কোনদিন আসবে না কথা বলতে? জ্যোৎস্নায় হেমন্তের গাঢ় কুয়াশা জড়ানো। ঘুমজড়ানো গলায় খুব গভীর থেকে পোকামাকড় গান গাইছে। সামনে শীত—তখন ওরা আরও গভীরে দীর্ঘ ঘুমের দিকে যাবে। কোথায় সেই প্রাকৃতিক অভ্যন্তর—জঠরের উষ্ণতা যেখানে বাইরের পৃথিবীর হিমকে পৌঁছতে দেয় না? সেখানে কি স্মৃতিও ঘুমোতে চলে গেল জীবজগতের অবচেতনায়?

আমার কষ্টটা বাড়ছিল। স্মৃতিকে আমি ভালবাসতাম। শ্রুতিকেও হয়ত ভালবাসি—চেষ্টা করি। পেরে উঠি না। খালি মনে হয়, শ্রুতি আমার জন্য নয়, আমার সংসারের জন্য। একটি প্রয়োজনীয় ফিলার শ্রুতি। আর স্মৃতি ছিল আমার জন্য—আমার সংসারের বাইরে একটি নিজস্বতার প্রতীক। স্মৃতি, কেন গেলে?

যাইনি। সে ফিসফিস করে বলল। এই তো আছি!

কিন্তু কোথায় আছ? আগের মত কাছে আসছ না কেন?

পারছি না। আমার কষ্ট হচ্ছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছি ক্রমশ। নিজেকে কুড়িয়ে বড়ো করা যাচ্ছে না।

মনে হল, চারদিকে ঘাস, গাছপালা, পোকামাকড়, শিশির, কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্না আর কুয়াশার ভেতর থেকে স্মৃতির শ্বাসপ্রশ্বাস জড়ানো কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। সে বলছে, আমি আছি। আমি আছি!

আর চারপাশ থেকে আবছা এক গন্ধ—ছেঁড়া ঘাসের পাতা অথবা শেকড়ের, বৃষ্টিভেজা মাটির, জলের, পাখিদের বাসার গন্ধের মতো কটু—স্মৃতির দ্বিতীয় জীবনের গন্ধ। প্রকৃতির নিজস্ব গন্ধ।

লণ্ঠনের আলো ফুটে উঠল। দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছিল। ষষ্ঠীদাসের ডাকাডাকি শুনতে পাচ্ছিলাম। সে সব টের পায়। ....

মোতিবিবির দরগা

কী এক শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। যেন দরজা খোলার শব্দ। চোখ খুলে দেখি, ঘর অন্ধকার। একটু অবাক লাগল। আমার অভ্যাস জানালা খুলে রাখা। কেন জানলা বন্ধ করে শুয়েছি কয়েকমুহূর্ত ভেবেই পেলাম না। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল সব কথা। অমনি ওঠার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। শরীরে এতটুকু জোর নেই। মাথার ভেতরটা শূন্য লাগছে। তেষ্টাও পেয়েছে তাই ওঠা দরকার। মনে পড়ছে, কোনার দিকে কুঁজোয় জল রেখে গেছে দরবেশ সায়েব। বলে গেছে, অসুবিধে হলে ডাকবেন। পাশের ঘরেই আছি। কিন্তু ডাকতে গিয়ে টের পেলাম, গলায় আওয়াজ বেরুচ্ছে না।

কেন যে সেই অলুক্ষণে বাসটায় চেপেছিলাম! অত ভিড়ের বাসে চাপার অভ্যাস নেই। পারি না। ইচ্ছে করলে বন্ধুর বাড়িতে রাতটা আরামে কাটিয়ে আসতে পারতাম। ভোরের বাসটা নাকি খালিই যায়। অথচ কী এক ভুতুড়ে জেদ আমাকে পেয়ে বসেছিল। সন্ধ্যার দিকে আগাপাছতলা লোখে ঠাসা বাসটা এসে দাঁড়াতেই নির্বোধের মতো গুঁতো মেরে ঢুকে গেলাম। পাদানিতে অনেকগুলো পায়ের ওপর পা রেখেছিলাম। ওরা আপত্তি করছিল। বাসটা স্টার্ট দিয়ে খুব জোরে চলতে শুরু করল। প্রায় মাইলটাক ঝগড়াঝাঁটি চলতে থাকল গেঁয়ো লোকগুলোর সঙ্গে। তারপর কে যেন আমাকে হ্যাঁচকা টানে চলন্ত বাস থেকে টেনে নামাল। অর্থাৎ আমি ছিটকে পড়ে গেলাম। ভাগ্যিস পীচের ওপর পড়িনি। রাস্তার ধারে পুরু ঘাসের ওপর পড়ে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।

যখন জ্ঞান হল, টের পেয়েছিলাম সামনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে অদ্ভুত একচোখো একটা লণ্ঠন। লণ্ঠনটার আলোর রঙ নীল। এমন নীল কাচে ঢাকা বাতি নিয়ে মানুষ ঘোরাঘুরি করে, কস্মিনকালে দেখিনি। আলোর পেছনে আবছা দেখতে পাচ্ছিলাম লোকটাকে। দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড। সে আলোটা আমার পাশে রেখে গম্ভীর গলায় বলেছিল—কে আপনি? এভাবে রাস্তার ধারে শুয়ে আছেন কেন? নেশা করেছিলেন বুঝি?

অত কষ্টের মধ্যে হাসি পেয়েছিল।—মাতাল নই। বাস থেকে পড়ে গেছি। তারপর কী হয়েছে, জানি না।

—সে কী! বলে লোকটা আমার পাশে ঝুঁকে এসেছিল। তারপর লণ্ঠনটা তুলে পা থেকে মাথা অব্দি দেখে নিয়ে বলেছিল—জখম হয়নি তো?

—বুঝতে পারছি না। রক্তটক্ত দেখতে পেলেন কি?

—না। তবে হাড়ে আঘাত লাগতেও পারে। টের পাচ্ছেন না কিছু?

কে জানে!

—ওঠার চেষ্টা করুন তাহলে। কাছেই আমার ডেরা।

এখন যেমন শরীরের অবস্থা, তখনও ঠিক এমনি ছিল। লোকটা শেষে আমাকে দুহাতে শূন্যে উঠিয়েছিল। তারপর ফের জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

দ্বিতীয়বার জ্ঞান ফিরে দেখেছিলাম, এই ঘরে শুয়ে আছি। খাটিয়ায় বিছানার ওপর। সেই নীল আলোর লণ্ঠনটা নেই। ঘরের মেঝেয় একটা হেরিকেন রয়েছে। আর আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আলখাল্লাধারী নীল লম্বাচওড়া এক দরবেশ। কালো আলখাল্লা। গলায় লাল-নীল পাথরের মালা। কাঁচাপাকা চুল ও দাড়ি। খাড়া নাক। লালচে টানাটানা চোখ। তার হাতে একটা গেলাস। আমাকে চোখ খুলতে দেখে বলেছিল—সরবতটা খেয়ে নিন। কই, হাঁ করুন। খাইয়ে দিচ্ছি।

একটু ঝাঁঝালো সুগন্ধ সেই সরবত কয়েক ঢোক গেলামাত্র আমার শরীর যেন বিদ্যুতের খেলা শুরু হয়েছিল। ভয় পাওয়া গলায় বলেছিলাম—এ কিসের সরবত ?

দরবেশ হেসেছিল—ভয় পাবেন না। বিষ নয়। খুব উপকারী দাওয়াই আছে ওতে। এক্ষুণি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

একেবারে সুস্থ হতে না পারলেও উঠে বসার শক্তি ফিরে পেয়েছিলাম। তারপর ওঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয়েছিল। জানতে পেরেছিলাম, বিশাল মাঠের মধ্যে এক দিঘির ধারে নির্জন দরগায় আমি আশ্রয় পেয়েছি। এর নাম মোতিবিবির দরগা। এক তপস্বিনীর কবর আছে এখানে। তার ওপর একটা পাথরের ঘর আছে। সেই ঘরে দরবেশ থাকে। পিদিম জ্বালে। আগরবাতি পোড়ায়। সাধনা-টাধনা কী সব করে। এই ঘরটা পরে ইট দিয়ে বানানো হয়েছিল। ভক্ত বা দৈবাৎ বিপদে পড়ে কেউ এলে তাকে এ ঘরে থাকতে দেওয়া হয়।

কিছুক্ষণ পরে দরবেশ আমাকে খান দুই মোটা রুটি আর খানিকটা গুড় দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—মেহেরবানী করে এই দিয়েই খিদে মিটিয়ে নিন। আমি ফকির। বুঝতেই পারছেন....

—এই যথেষ্ট। তবে খিদে আমার বিশেষ নেই। আপনি এগুলো ....

দরবেশ আপত্তি করেছিল।—না, না। আপনার কিছু খাওয়া দরকার। খেলেই গায়ে জোর হবে। আল্লার দয়ায় আপনি বেঁচে গেছেন। ওভাবে চলন্ত বাস থেকে পড়লে মানুষ বাঁচে না। যদি বা বাঁচে, হাড়গোড় আস্ত থাকে না।

আমার হাড়গোড় আস্ত আছে, তা ঠিক। কিন্তু শরীর এত দুর্বল হয়ে গেছে কেন বুঝতে পারছি না। দরবেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাতেই রুটির টুকরো ছিঁড়ে মুখে পুরেছিলাম।

ফের সেই শব্দটা হল।

খুব পুরনো জংধরা লোহার কপাট খোলার মতো শব্দ। কিন্তু কিছুটা চাপা। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার ঘর। অন্ততঃ তেষ্টা মেটানোর জন্যে যথাশক্তি চেষ্টা করলাম উঠে বসতে। তারপর মনে পড়ল, পানজাবির পকেটে দেশলাই আর প্যাকেটটা আছে। সিগারেটও আছে। পানজাবিটা মাথার কাছে রেখেছিলাম। অতিকষ্টে হাত বাড়িয়ে দেশলাই আর প্যাকেটটা বের করলাম। দেশলাই জ্বেলে কুঁজোর কাছে গেলাম। মাথা ঘুরছে। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছে, আবার জ্ঞান হারাব। কুঁজোর মুখে গেলাস আছে। দেশলাই কাঠিটা নিভে গেল। আন্দাজ করে জল ঢেলে চোঁ-চোঁ করে গিলে ফেললাম। তারপর খাটিয়ায় ফিরে এসে সিগারেট ধরালাম।

তৃতীয়বার দরজা খোলার মতো বিশ্রী চাপা শব্দটা শোনা গেল। তারপর মনে হল, বাইরে এইমাত্র যেন ঝড় এসে পড়েছে। শন-শন শোঁ-শোঁ আওয়াজ বাড়তে থাকল। ছোট্ট দুটো জানলা আছে দুদিকে। একটা জানলা আচমকা খুলে গেল। ঘরে হু-হু করে ঢুকে পড়ল ঝড়টা। কষ্ট করে উঠতেই হল। জানলাটা বন্ধ করার জন্যে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াতে পারলাম। কিন্তু জানলাটা কিছুতেই আটকানো যাচ্ছে না। ঘরের ভেতর খড়কুটো ধুলোবালি ঢুকে পড়ছে ঝড়ের সঙ্গে। বাইরের ঘরে ঘন কালো অন্ধকারে কী এক প্রাণী যেন হুলস্থুল বাধিয়েছে। তারপর বিদ্যুৎ ঝিলিক দিতে থাকল। বাজ পড়ল কাছাকাছি কোথাও। তখন ভাঙা গলায় ডাকার চেষ্টা করলাম—দরবেশ সায়েব। দরবেশ সায়েব!

কোনও সাড়া এল না। দরজা অনুমান করে পা বাড়ালাম। দরজাটা খুঁজে পাওয়ার পর যেই ছিটকানি খুলতে গেছি, কানে এল চেরা গলায় সুর ধরে কেউ গান করছে বাইরে।

এই দুর্যোগের রাতে নির্জন দরগায় দরবেশের হঠাৎ গান করার ইচ্ছে কেন, জানি না। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঝড় যেন হাত বাড়িয়ে আমাকে টেনে নিল। বারান্দায় ছিটকে পড়লাম। দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে বললাম—আমার জ্ঞান হারালে চলবে না। মাথা ঠিক রাখতেই হবে।

বারান্দার সামনে বিদ্যুতের আলোয় ছোট্ট একটা উঠোন আর ইঁদারা চোখে পড়েছিল। দরবেশের ঘরের দিকে দেওয়াল ধরে এগোতে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল, বিদ্যুতের আলোয় মুহূর্তের জন্যে একটা সাদা ঝলসানো মূর্তি এবং মূর্তিটি স্ত্রীলোকর তাতে ভুল নেই—ইঁদারার ধারে দাঁড়িয়ে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে ভয় পাওয়া গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম—কে? কে ওখানে?

ফের বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল। ফের দেখতে পেলাম মূর্তিটা। কিন্তু এবার সে ইঁদারার দিকে ঝুঁকে রয়েছে। ভূতে বিশ্বাস নেই। কিন্তু ভয়ঙ্কর রাতে নির্জন দরগায় সেই বিশ্বাসের ভিত্তিটা নড়বড়ে হতে বাধ্য। ওদিকে সেই চেরা গলায় গানটা সমানে শোনা যাচ্ছে। আমি মরিয়া হয়ে ফের দরবেশকে ডাকলাম। তারপর দরবেশের ঘরের দরজায় জোরে ধাক্কা দিলাম।

দরজাটা খুলে গেল। ভেতরে পিদিম জ্বলছে কালো একটা বেদির শিয়রে। দরবেশ নেই। এ দিকটা ঝড়ের উল্টোদিকে। তাই ঘরে ঝড়টা ঢুকছে না। ইঁদারার ধারে মেয়েটিকে ভূত ধরে নিয়েই আমি আক্রান্ত প্রাণীর মতো ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং কাঁপতে কাঁপতে দরজা বন্ধ করে লাম।

হ্যাঁ, বেদিটাই কবর এবং সম্ভবত কষ্টিপাথরে তৈরি। ফার্সিতে কী সব লেখা আছে। কিন্তু রক্ষণে চমকে উঠলাম। বেদির ওপাশে তিনটে মড়ার মাথা রয়েছে। আবছা আলোয় াথাগুলো বিকট দেখাচ্ছে। আরও ভয় পেলাম।

এমন সময় বাইরে সেই গানটা থেমে গেল এবং মনে হল প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

বেদি থেকে একটু তফাতে কম্বলের আসন পাতা ছিল। সেখানে গিয়ে বসে পড়লাম। ারপর আশ্চর্য, বন্ধ করে রাখা দরজাটা হঠাৎ মচ মচ করে উঠল। তারপর খুলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে বেদির পিদিমটা নিভে গেল!

দরজার সামনে সেই নীল একচোখো লণ্ঠন হাতে দরবেশ দাঁড়িয়ে আছে। সে আলোটা ঘরের ভেতর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিঃশব্দে কিছু দেখে নিল। তারপর বেদির দিকে ঘুরিয়ে রাখল।

দরবেশ আমাকে লক্ষ্যও করল না। তার সিল্যুট মূর্তি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতক্ষণে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দারুণ চমকে উঠলাম। এ কি কোনও জীবিত মানুষের মুখ হতে পারে? দৃষ্টি কেমন অদ্ভুত—নিষ্পলক, শূন্য। হাঁটু ভাঁজ করে পুতুলের মতো বসে পড়ল সে কবরের সামনে। তেমনি মৃতের চোখে তাকিয়ে বসে রইল। বাইরে বৃষ্টির শব্দ। ঝড়ের শব্দ। বজ্রপাতের ভয়ঙ্কর শব্দ। মনে হচ্ছে, পৃথিবীর শেষ মুহূর্তটি আসন্ন। এদিকে বেদির মতো কবরের ওপর লম্বাটে নীল আলো থেকে ক্রমশ ধূপের ধোঁয়ার মতো ধূসর বা নীল কী আবছায়া ঘনিয়ে উঠেছে। তারপর নাকে তীব্র হয়ে ঝাপটা দিল একটা কড়া সুগন্ধ। সুগন্ধটা অসহ্য লাগছিল। চেতনা অবশ করে দিচ্ছিল।

তার আতঙ্কে কাঠ হয়ে দেখলাম, ইঁদারার ধারের সেই মেয়েটি যেন শূন্যে ভেসে এল এবং ধোঁয়ার মতো দরবেশকে ভেদ করে এগিয়ে বেদির ওপর স্থির হয়ে দাঁড়াল।

নীলাভ শরীর তার—হয়তো নীল আলোটাই এর কারণ হতে পারে। সে সুন্দর, না কুৎসিত, না সাধারণ—বুঝতে পারছি না। হয়তো সেই বোধও হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু সে একেবারে নগ্ন।

আমার তন্ময়তা ভেঙে গেল। দরবেশ ফের চেরা গলায় গান গেয়ে উঠল কিন্তু এবার সুরটা অনেকটা মিঠে এবং চাপা। ঘুমঘুম আচ্ছন্নতায় দুর্বোধ্য কী এক গান গাইছে সে। সুরটাও অপরিচিত। একটু একঘেয়েও। কিছুক্ষণ পরে নগ্ন নারীমূর্তিটি বেদির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার দিকে তাকাল এবং তার চমকও টের পেলাম। সে অস্ফুটস্বরে একেবারে মানুষের গলায় আমার দিকে আঙুল তুলে বলে উঠল—ও কে?

সঙ্গে সঙ্গে দরবেশ ঘুরল আমার দিকে। প্রচণ্ড গর্জন করে বলল—বেরিয়ে যান। বেরিয়ে যান বলছি। কেন এ ঘরে ঢুকেছেন আপনি?

নীল আলোটাও নিভে গেল। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার এখন। বাইরে ঝড়বৃষ্টি সমানে চলেছে। অন্ধকারে একটা হাত এসে আমার কাঁধে খামচে ধরল। তারপর দরবেশ আমাকে টেনে ওঠাল এবং একটা থাপ্পড়ও মারল গালে।

ব্যাপারটা অপমানজনক। কিন্তু বাধা দেবার বা প্রতিবাদের ক্ষমতাও ছিল না এতটুকু। অসহায়ভাবে তার হ্যাঁচকা টানে কতকটা শূন্যে ভেসে চললাম। এই দৈত্যের কাছে আমি নেহাত বামন।

ভেবেছিলাম, আমাকে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বের করে দেবে। কিন্তু তেমন কিছু করল না। পাশের সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় ফেলে দিল। তারপর ধমক দিয়ে বলল—খবর্দার, আর বেরুবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে আপনাকে বাঁচাতে পারব না। হুঁশিয়ার!

সে বাইরে থেকে দরজা আটকে দিল। আমি ভাবতে থাকলাম, ব্যাপারটা কি স্বপ্নে ঘটছে নাকি সেই উগ্র আরক মেশানো সরবতের নেশায় যত সব উদ্ভট কাণ্ড দেখতে পাচ্ছি?

কিন্তু না তো! আমি সজ্ঞান পুরোপুরি—যদিও শরীরে প্রচণ্ড দুর্বলতার দরুন মাথাটা ঝিমঝিম করছে। দেশলাই আর সিগারেটের প্যাকেট বিছানায় রেখেছিলাম। খুঁজে নিয়ে প্রথমে ঠনটা জ্বালালাম। তারপর সেই জানলাটা বন্ধ করে দিলাম। ঘরের মেঝেয় যথেষ্ট বৃষ্টির ছাঁট সে পড়েছে ততক্ষণে। বিছানার একটা পাশ ভিজে গেছে।

সিগারেট টানতে টানতে সেই দৃশ্যটা আগাগোড়া ভাবতে থাকলাম ফের! যা দেখলাম, তা স্তব, না অবাস্তব? সত্যি দেখেছি, না স্নায়ুবিকার?

শেষে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে না পেরে লণ্ঠনটা নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাইরে তখন ড়বৃষ্টির জোরালো ভাবটা অনেক কমেছে। শীতবোধ হচ্ছে! পানজাবিটা পরে ধুতির চাটাও খুলে গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম।

একটু পরে ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে এল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, ফের কি একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

এবারকার শব্দটা দরজা খোলার মতো নয়। কেউ কি আর্তনাদ করল কোথাও? ঘুম ভাঙার র কয়েক সেকেন্ড তার জের ছিল। দৃঢ় বিশ্বাস হল, একটা প্রচণ্ড আর্তনাদই শুনেছি।

দরবেশকে ডাকা বৃথা। তাছাড়া লোকটার অমন ভুতুড়ে ব্যাপার-স্যাপার এবং আমার প্রতি মন আচরণ—মন বিষিয়ে গেল।

কান পেতে থাকলাম। আর কোনও আর্তনাদ নয়। কিন্তু কে যেন চাপা গলায় কাঁদছে হিরে। বৃষ্টি পড়ার শব্দ হচ্ছে। নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও বড় গাছ আছে। তার পাতা থেকে ল ঝরছে। ঝড়টা থেমেছে।

বন্ধ ঘরে দম আটকে আসছিল। লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। ঘরে বিষাক্ত স জমার ভয়ে। এবার উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে দিলাম। বৃষ্টি টিপটিপ করে পড়ছে। দূর ন্তে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে। কিন্তু মেঘ ডাকছে না।

লণ্ঠনটা আর জ্বাললাম না। কান্নার শব্দ সমানে শোনা যাচ্ছিল। পা টিপেটিপে এগিয়ে বধানে নিঃশব্দে দরজা খুললাম। তারপর বারান্দায় গেলাম। তেমনি অন্ধকার হয়ে আছে ান্দা। কান্নার শব্দটা কবরের ঘর থেকেই আসছে।

নিঃশব্দে ও-ঘরের দরজায় উঁকি দিলাম। সেই নীল আলোটা তেমনি লম্বাটে হয়ে বেদির র পড়ে আছে। তারপর যা দেখলাম, আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেলাম। এত ভয়ঙ্কর দৃশ্য কখনও খিনি।

বেদির ওপর মাথা রেখে দরবেশ চিত হয়ে দুহাত ছড়িয়ে শুয়ে আছে। এবং তার গলাটা াই করা। চাপ চাপ টাটকা রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে। চোখ দুটো তেমনি নিষ্পলক।

সেই মেয়েটির সিল্যুট নগ্ন মূর্তি বেদির পাশে এবং সে দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কালো একরাশ চুল সামনের দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। দু হাঁটু ভাঁজ করে একটু ঝুঁকে বসে বিলাপ করছে।

কয়েক মুহূর্ত হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। মাথা ঘুরতে থাকল। যা দেখতে পাচ্ছি, তা স্বপ্নে, না বাস্তবে? কী করা উচিত ভেবে পেলাম না। আতঙ্কে কাঠ হয়ে তাকিয়ে থাকলাম।

তারপর কী একটা আমার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল।

একটা কালো প্রকাণ্ড বেড়াল।

বেড়ালটা নিঃশব্দে এগিয়ে বেদির ওপর উঠল এবং দরবেশের মুখ চাটল। তারপর জিভ বাড়িয়ে দিল। আতঙ্ক বেড়ে গেল, যখন দেখলাম সে দরবেশের গলায় কাটা জায়গা থেকে রক্ত চেটে খাচ্ছে।

বেড়ালটা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি কান্না থামিয়েছিল। সে মুখ তুলে বেড়ালটা দেখতে থাকল। বেড়ালটা রক্ত চাটতে চাটতে ভয়ঙ্কর মুখ তুলে যেন আমাকেই লক্ষ্য করছি মাঝে মাঝে। এর ফলে স্নায়ুর ওপর বারবার আঘাত আসছিল। অসহ্য লাগায় একটু স গেলাম।

এইসময় ডাইনে ঘুরে আরেক বিচিত্র দৃশ্য দেখলাম।

অন্ধকারে একটু দূরে তিনটে আলো আসছিল। হঠাৎ তিনটে আলো মিলেমিশে একটা হ গেল এবং প্রকাণ্ড আলোটা হলুদ বলের মতো ভাসতে ভাসতে এসে স্থির হল। তার আলোটা বুদবুদের মতো অনেকগুলো ভাগ হয়ে গেল।

এদিকে আসছে দেখে আমি দ্রুত পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম এবং দরজা নিঃশব্দে ভেজি কপাটের ফাঁকে চোখ রাখলাম।

আলোগুলো বুদবুদের ঝাঁকের মতো এবং এত চঞ্চল যে গোনা যাচ্ছে না। অনু করলাম এক ডজনের কম নয়।

আলোগুলোর কিন্তু একটুও ছটা নেই। অর্থাৎ কোন কিছুকে আলোকিত করছে না।

আলোগুলো নাচতে নাচতে এসে বারান্দায় উঠল এবং কবরের ঘরেই ঢুকল, তা ঠি তারপর ওঘরে চাপা গলায় কারা কথা বলছে শুনলাম।

কয়েক মিনিট পরে দেখি, মেয়েটি সেই নীল লণ্ঠন নিয়ে বেরুল। আবছা দেখা যাচ্ছি তার পরনে এখন শাড়ি রয়েছে। তার পেছন পেছন অনেকগুলো সিল্যুট মূর্তি যেন শূন্যে যাচ্ছে। বেড়ালটাকে দেখতে পেলাম না।

ওরা অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন লণ্ঠনটা জ্বেলে নিয়ে বেরিয়ে এল কবরের ঘরের দরজা খোলা। আলো তুলে ধরে দেখি, দরবেশের জবাই করা শরীরটা তে পড়ে আছে এবং গলার ফাঁকটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এক ফোঁটা রক্ত নেই। বেড়ালটা চেটে-পুটে খেয়ে ফেলেছে।

ঘরের ভেতর লণ্ঠনটা ঢোকাতেই কালো বেড়ালটা কোনার দিকে বসে আছে দেখ পেলাম। সে নীল উজ্জ্বল চোখে তাকাল। মুখে রক্ত লেগে আছে।

তারপর সে দ্রুত আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বেদির কাছে গিয়ে দরবেশের গায়ে হাত রাখলাম। আলখাল্লাটা ভিজে রয়েছে। নাড়ি-স্পন্দন নেই। বরফের মতো হিম শরীর।

হঠাৎ সেইসময় চোখ গেল, সেই তিনটে মড়ার মাথার দিকে।

তিনটে মুণ্ডু নড়তে শুরু করছে।

নড়তে নড়তে বলের মতো তারা আমার দিকে গড়িয়ে আসতে থাকল। আর সহ্য করতে ারলাম না! লণ্ঠনটা তাদের ওপর ছুঁড়ে মারলাম। কাচ ভেঙে গেল। তেল ছড়িয়ে আগুন রে গেল। তার মধ্যে মুণ্ডু তিনটে নাচতে থাকল।

একলাফে আমি বারান্দায় পৌঁছুলাম। তারপর অন্ধকারে কীভাবে যে এগোলাম, বলার য়। আছাড় খেলাম কতবার। কাদায় জলে জামাকাপড় আর শরীর যাচ্ছেতাই মাখামাখি হল। কছুটা এগিয়ে আবছা ধূসর আলোয় ভরা মাঠে পৌঁছুলাম।

বৃষ্টি থেমেছে। আকাশের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে একটুকরো ভাঙা চাঁদ বেরিয়ে এসেছে। ামনে পিচের পথটা দেখা যাচ্ছিল। সেখানে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। দরগার এদিকটা বিশাল াহাড়ের মতো দেখাচ্ছে। কালো হয়ে আছে। বুঝলাম জায়গাটা ঘন জঙ্গলে ভরা।

রাস্তায় পৌঁছে সাহস বেড়ে গেল। হাঁটতে থাকলাম। শরীরের সেই দুর্বলতাটা আর নেই। একটা আলো দেখা যাচ্ছিল। মনে পড়ল, ওধারে সেই ছোট্ট চটি। যেখানে থেকে বাসে পেছিলাম কাল সন্ধ্যায়।

আলোটা লক্ষ্য করে চলতে থাকলাম।

লোহাগড়া ব্লকে নিশীথ—আমার বন্ধু নিশীথ রায়চৌধুরী কৃষি অফিসার। ভোরবেলা ামাকে জলকাদামাখা ভুতুড়ে চেহারায় দেখে ভীষণ অবাক হয়েছিল।

সংক্ষেপে তাকে মোটামুটি সবটাই বললাম। সে কিছুক্ষণ নিষ্পলক চোখে আমার দিকে কিয়ে থাকার পর বলল—ঠিক আছে। আগে বাথরুমে ঢোক। আমার বউ বড্ড ঘুমকাতুরে। লা করে ওঠে। তোকে এ অবস্থায় দেখলে হুলস্থূল ঘটাবে।

কাপড়-চোপড় ছেড়ে স্নান করে এবং নিশীথের পাজামা-পাঞ্জাবি পরে আরামে বসলাম। তক্ষণে সূর্য উঠেছে। নিশীথ চা করে আনল।

চা খেতে-খেতে বললাম—এতক্ষণে কোমরে ব্যথা করছে একটু একটু।

নিশীথ বলল—ফিরে গিয়ে এক্সরে করাস্। কিন্তু কথা হচ্ছে, ঝড়জলের সময় মোতিবিবির গায় নিশ্চয় তুই ভীষণ রকমের দুঃস্বপ্ন দেখেছিস। তাছাড়া এর কোনো ব্যাখ্যা হয় না।

—অসম্ভব! দরবেশের ডেডবডিটা নিশ্চয় এখনও আছে। বরং পুলিশে খবর দেওয়া যাক্।

নিশীথ হাসল।—কী বলছিস! ওখানে কেউ থাকে না। সে রকম কোনও ঘর-টরই নেই। একটা কবর আছে বটে এবং সেটা কষ্টিপাথরে তৈরি। তুই বাস থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে য়ছিলি—তা ঠিক। জ্ঞান ফেরার পর নিশ্চয়ই ঝড়ের সময় আশ্রয় নিতে দরগায় ঢুকেছিলি। পর আঘাত পাওয়ার রিঅ্যাকশনে জ্বর-টর এসে গিয়েছিল। তারপর লম্বা চওড়া একটা প্ন দেখেছিস।

রেগে গিয়ে বললাম—ঘর নেই তো ঝড়বৃষ্টিতে ছিলাম কোথায়?

নিশীথ বলল—নিশ্চয় দরগার বটতলায় গিয়ে ফের অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলি।

—অসম্ভব। এক্ষুণি আয় আমার সঙ্গে। স্বপ্ন হতেই পারে না। আমার ব্যাগ-ট্যাগ সব [illegible] আছে।

নিশীথ একটু হেসে বলল—ঠিক আছে। তোর ভুলটা ভাঙানো দরকার। একটু পরে ব্লকের টা নিয়ে বরং বেরুব।

মুর্শিদাবাদ-সাঁওতাল পরগনা সীমান্তের এই দরগাটার নাম লোহাগড়া—বরমডি রোড বরমডিতে রেলস্টেশন আছে। সেখান থেকে আমার বাড়ি পৌঁছুনোর অসুবিধে নেই। ত নিশীথের বউয়ের কাছে দ্বিতীয় দফা বিদায় নিয়ে বেরুলাম। হাসতে হাসতে বলল—আপ আবার ভূতের পাল্লায় পড়ে ফিরে আসুন! তবে আপনার বন্ধুর সাহসটা বড্ড বেশি। দেখবে সেই মেয়েটির প্রেমে পড়ে দরগায় না থেকে যায়। ও ভীষন ভক্ত ন্যুডের। দেখছেন না, ক ন্যুড আর্ট টেবিলে সাজিয়ে রেখেছে?

মিনিট পঁচিশ এগিয়ে রাস্তার ধারে জিপ রেখে আমরা দরগার দিকে পা বাড়ালাম।

তারপর থমকে দাঁড়ালাম। নিশীথ বলল—কী হল?

বললাম—দেখ্, দেখ্! সেই কালো বেড়ালটা!

একটা কালো বেড়াল ভাঙাচোরা প্রকাণ্ড চত্বরে বসে একটা থাবা তুলে গাল চুলকোচ্ছে চত্বরের মাঝখানে কষ্টিপাথরের কবর। বেড়ালটা থাবা নামিয়ে আমাকে দেখতে থাকল।

কিন্তু কী আশ্চর্য! সেই কবরটা! ফার্সিতে লেখা ফলকটাও! কিন্তু এ তো ফাঁকা জায়গা রয়েছে। ওপাশে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ। নিশীথ এগিয়ে গিয়ে জলকাদায় পড়ে থাকা আমা ব্যাগ কুড়িয়ে নিয়ে বলল—তোর ব্যাগ নিশ্চয়?

এই সময় ড্রাইভার একটু কেসে বলল—স্যার, শুনেছি এখানে এক ফকির থাকতেন। পা তাঁকে কারা মার্ডার করেছিল। মেয়েমানুষ নিয়ে গণ্ডগোল।

শুনে আমার মাথা ঘুরতে থাকল। ব্যস্ত হয়ে বললাম—নিশীথ, চলে আয়.....

হাওয়া কল

সই কবে হাতিদহে ওলন্দাজ বণিকরা কুঠি করেছিল এবং বাগানে জলসেচের জন্য একটা াওয়াকল বানিয়ে ছিল। তিরিশ ফুট উঁচুতে লোহার ফ্রেমের মাথায় প্রকাণ্ড একটা চর্কি হাওয়ায় ন বন করে ঘুরত আর নিচের গভীর ইঁদারা থেকে বিচিত্র কৌশলে জল উঠে নালা দিয়ে য়ে যেত বাগানের ভেতর।

ষোল শতকের এক প্রাযুক্তিক কীর্তি। সেই কুঠি আর হাওয়াকল আজ থেকে নারায়ণ য়ের হাতে। উনিশশ বিয়াল্লিশের ঝড়ে হাওয়াকলের চর্কি ভেঙে পড়েছিল। তারপর পাঁচের শকে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ঘটল স্বাধীনতার যুগে। কুঠিবাড়ির অবস্থা ততদিনে জরাজীর্ণ য়ে উঠেছিল। হাওয়াকলের লোহার মঞ্চটা ভেঙেচুরে নিয়ে গিয়েছিল চোরেরা। প্রকৃতি ন্যতা সহ্য করে না। গজিয়ে উঠল ঘন জঙ্গল। প্রকৃতিই বুক পেতে ঢাকল ভূলুণ্ঠিত াভিজাত্যের ইজ্জত এবং একটি পুরনো ইতিহাসকে।

হাতিদহ রেলস্টেশন থেকে ভাগীরথীর তীরে এই কুঠিবাড়ির জঙ্গলের দূরত্ব প্রায় ইলখানেক। স্টেশনটা ছোট। কদাচিৎ দুচারজন যাত্রী নামে ট্রেন থেকে। এবড়ো-খেবড়ো স্তায় যানবাহন বলতে এখন গরুর গাড়ি। কয়েকটা যোজনাতেও এই এলাকার চেহারা খনও আধুনিক হতে পারেনি।

হাতিদহ বেশ বড় গ্রাম। সেখানে যেতে স্টেশন থেকে ওই কদর্য রাস্তা হয়ে কুঠিবাড়ির লের নিচে ভাগীরথীর খেয়া পেরুতে হয়। জুলাইমাসের এক সন্ধ্যায় ট্রেন থেকে নামার ঙ্গে সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি। একা থাকলে কথা ছিল না। সঙ্গে বউ। তার বাপের বাড়ি হাতিদহ। রাং আমার পরনে দস্তুরমতো জামাই বাবাজীর পোশাক—সাবেক রীতি অনুযায়ী। আব র্মিও সেজেছে প্রচণ্ড রকমের। সঙ্গে কিছু বোঁচকাও আছে।

স্টেশনের বারান্দায় পৌঁছতেই ভিজে দুজনে ন্যাতা হয়ে গেলাম। বুড়ো স্টেশনমাস্টার ভে চুকচুক শব্দ করে বললেন, 'এ হে হে হে! কী অবস্থা!'

শ্বশুরমশাই হাতিদহের অঞ্চলপ্রধান। একমাত্র কন্যার জনক। যাইহোক, কথা ছিল গরুর ড়ি আসবে এবং সঙ্গে একজন চৌকিদারও। আলাপি স্টেশনমাস্টার খবরাখবর নিয়ে ফের চুকচুক করে বললেন, 'এই গাড়ি পৌঁছানোর কথা ছিল দুপুর বারোটা পাঁচে। ছ ঘণ্টা । তাই আপনার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ফিরে গেছে। দাঁড়ান, জিজ্ঞেস করি।' বলে তিনি লেন, 'গিরিয়া! অ গিরিয়া! শোন এদিকে।'

নীল উর্দিপরা এক রেলকর্মী একচোখো ভুতুড়ে রেললণ্ঠন হাতে কোত্থেকে এসে বলল, য়ে টিশানবাবু!

'হ্যাঁ রে, দুকুরবেলা গরুরগাড়ি নিয়ে কেউ প্যাসেঞ্জার নিতে এসেছিল?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' গিরিয়া আমাদের দেখে নিয়ে বলল। 'চোহলে গেল পাঁচটার সময়ে। শুনলা কী, আর ওয়েট করলে খেয়া লৌকা মিলবেক নাই। বলদগাড়ি পার হবেক নাই। ফির ক সুবামে লৌকা মিলবেক। ইস্‌লিয়ে চোহলিয়ে গেল।'

বেচারী ঊর্মির মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হল। নৈলে পরের ট্রেনেই ফিরে যেতাম। এ ক অদ্ভুত কারবার। ট্রেনটা না আসা পর্যন্ত অন্তত কাউকে স্টেশনে রেখে যেতে পারত স্টেশনবাবু অবশ্য আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'ভাববেন না। রাত্তিরটা আমার কোয়ার্টারে আতি করুন বরং। সকালে—'

ঊর্মির তর সইছিল না। কথা কেড়ে বলল, 'মোটে এক মাইল রাস্তা। তুমি বড় স্যুটকেস নেবে, আমি ছোটটা।'

স্টেশনবাবু হাসলেন। মেয়ের মন। বাপের বাড়ির কাছে এসে আর ধৈর্য ধরছে না। কি বৃষ্টি যে!

ঊর্মি শক্তমুখে বলল, 'বৃষ্টি এক্ষুনি ছেড়ে যাবে।'

'কিন্তু খেয়া?'

'আমাকে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে পার করে দেবে। ঈশান মাঝি আমাকে চেনে।'

অগত্যা স্টেশনবাবু হার মানলেন। আমিও ঊর্মিকে সায় দিলুম। শুধু ভয় থেকে গেল ম পাড়াগাঁয়ে আজকাল চোর-ডাকাতের যা উপদ্রবের কথা কাগজে পড়ি, ঊর্মির গায়ে কিছু গয় আছে—তাছাড়া স্যুটকেসের ভেতরও দামী কিছু জিনিসপত্র রয়েছে।

বৃষ্টি কিন্তু ছাড়তেই চায় না। কিছুক্ষণ পরে একটা মালগাড়ি এল। একটু দাঁড়িয়েই চ গেল। তখন দেখলুম, বর্ষাতিপরা এক পুলিশ ভদ্রলোক সাইকেল আর টর্চ নিয়ে গার্ডসায়ে কামরা থেকে নেমে এলেন। স্টেশনবাবু সোল্লাসে বললেন, 'আর ভাবনা নেই আপনাদে হাতিদহ থানার দারোগাবাবু এসে গেছেন।'

দারোগাবাবুর নাম নীলমাধব চক্রবর্তী। গিয়েছিলেন পরের স্টেশনের দিকে একটা গ্র দাঙ্গাহাঙ্গামার এনকোয়ারিতে! আমাদের পরিচয় নিয়ে বললেন, 'কোনো চিন্তার কারণ নে শুধু মামণি কষ্ট করে একটু হাঁটতে পারলেই হল।'

ঊর্মি বলল, 'খুব পারব। আমি গ্রামের মেয়ে।'

বৃষ্টিটা কমতে কমতে ছেড়ে গেল। তখন রাত সাড়ে নটা বাজে। তারপর আমাদের অ করে মেঘের ফাঁকে ঝলমলে একখানা চাঁদও বেরিয়ে এল। ভিজে পৃথিবীর ওপর জ্যোৎস্নার চমক দারুণ রহস্যময় দেখাচ্ছিল। আমরা রাস্তায় পা বাড়ালাম।

দারোগাবাবু সাইকেল ঠেলে চলেছেন আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে। ঊর্মি পে হাঁটছে। মাঝে মাঝে দারোগাবাবু সাবধান করে দিচ্ছেন, 'দেখবেন, কাদা!' কখনও দিচ্ছেন, 'জল আছে —সাবধান।' দুধারে ফাঁকা মাঠে জল চকচক করছে। হাল্কা নীল কুয়া মতো একটা আবরণ আবহমণ্ডলে ছড়িয়ে রয়েছে। তুমুল চিৎকার করে ব্যাঙ আর পে মাকড় ডাকছে। রাস্তার ধারে কদাচিৎ একটা গাছ। সেই গাছে জোনাকির মালা। দূরে কো শেয়াল ডাকছিল।

সৌভাগ্যক্রমে আর বৃষ্টি পড়ল না। টুকরো টুকরো মেঘ চাঁদটার ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল। তাই কখনও জ্যোৎস্না কখনও আবছা আঁধারের খেলা চলছিল। আধমাইল হাঁটার পর দূরে একটা লণ্ঠন দেখা গেল। লণ্ঠনটা কাছে আসতেই দারোগাবাবু টর্চ জ্বেলে হ্যা হ্যা করে হাসলেন।' রতু চৌকিদার আসছে। তা যাই বলুন মশাই, এরিয়ার লোকগুলো বেসিক্যালি ভালো। এই দেখছেন রতুকে—মাসে পাঁচটা টাকা মাইনে পায়। কিন্তু কী কর্তব্যজ্ঞান দেখুন। আমার জন্য বেরিয়ে পড়েছে।'

নীল উর্দিপরা চৌকিদার সেলাম বাগিয়ে দাঁত দেখাল 'বড়বাবু নাকি ? তা ভালই হয়েছে। বাবুমশাইরা আমাকে পেঠিয়ে দিলেন। গরুর গাড়ি পেঠিয়েছিলেন শেষে—'

বুঝলাম দারোগাবাবুর জন্য নয়, আমাদের জন্যই ওর আগমন। দারোগাবাবু মুহূর্তে সেটা আঁচ করেই খাপ্পা হয়ে বললেন, 'দাঁত কেলাচ্ছিস যে! ব্যাটা ভূত কোথাকার। এনাদের স্যুটকেস দুটো নিতে কী হচ্ছে?'

আমার আপত্তি সত্ত্বেও স্যুটকেস দুটো মাথায় তুলে নিল বেচারা রতু চৌকিদার। একহাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে আমাদের আগে হাঁটতে থাকল। কিছুক্ষণ পরে উঁচু কুঠিবাড়ির জঙ্গলের উত্তরপ্রান্ত ঘুরে আমরা ঘাটে পৌঁছলুম। বর্ষার নদী এখন কূলে কূলে ভরে গেছে। খুব চওড়া দেখাচ্ছে। পাড়ে ঈশান মাঝির কুঁড়েঘর। রতু তাকে ডাকাডাকি করতে থাকল। দারোগাবাবুর নাম করে শাসাল পর্যন্ত। কিন্তু তার সাড়া নেই।

একটু পরে আবিষ্কৃত হল, চৌকিদারকে পার করেই ঈশান মাঝি বাড়ি চলে গেছে। তার গ্রামটা কুঠিবাড়ির জঙ্গলের দক্ষিণপ্রান্তে। নদীর এপারেই।

দারোগাবাবু মহা খাপ্পা হয়ে বললেন, 'ও ব্যাটার ব্যবস্থা কালই হবে। রতু, নৌকা বেয়ে নিয়ে চল, তুই।'

রতু ভড়কে গিয়ে বলল, 'বড়বাবু! আমি তো লৌকো বাইতে পারিনে। তার ওপর এই ভরা গাং। জোরালো তুফান দিচ্ছে। সেবারকার মতো মাঝগাঙে তলিয়ে যাব যে বড়বাবু।'

দারোগাবাবু আরও চটে গিয়ে কী বলতে যাচ্ছেন, সেইসময় আচমকা চড়বড় করে আবার বৃষ্টি এসে গেল। মাঝির কুঁড়েঘর মানে একদিক খোলা একটুখানি খড়ের ডেরা। সেখানে ঢুকে দেখলুম, জল পড়ছে ঝাঁঝরা চালের ফুটো দিয়ে। তারপর ক্রমশ হাওয়াটা বাড়তে লাগল। অপ্রশস্ত জায়গায় চারজন লোক, দুটো স্যুটকেস। চাল মচমচ করতে থাকল বাতাসের ধাক্কায়। রতু চৌকিদার বলল, 'বড়বাবু বরং কুঠিবাড়িতে ঢুকলে ভাল হয়। সেখানে একখানা ঘর আছে। এক সাধুবাবা সেখানে কিছুদিন থেকে এসেছেন দেখেছি। চলুন, সেখানেই যাই।'

ছাতি আনতে খেয়াল হয়নি। চৌকিদার এনেছিল ভাগ্যিস। আমি ও উর্মি সেই ছাতির তলায়, দারোগাবাবু বর্ষাতির ভেতর এবং সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে পেছনের উঁচু ঝোপঝাড়ের ভেতর টর্চের আলোয় এবং চৌকিদার আমাদের বোঁচকা নিয়ে পাহাড়ে চড়ার মতো অনেক কষ্টে কুঠিবাড়িতে পৌঁছলুম। তখন আবার আকাশ কালো হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে। মেঘ ডাকছে। টর্চের আলোয় সামনের ঘরটায় ঢুকে পড়লুম।

এই ঘরটা মোটামুটি টিকে আছে। বারান্দাটুকুও আস্ত। দারোগাবাবুর টর্চের আলোয়

ভেতরে একটা সিঁদুর মাখা ত্রিশূল, মা কালীর বাঁধানো ছবি, পুজোর চিহ্ন এবং একধারে চটে গোটানো ছোট্ট একটা বিছানা দেখতে পেলুম। কিন্তু সাধুবাবা নেই।

দারোগাবাবু বিছানাটা উল্টে দেখে সরিয়ে রাখলেন। নাক বাঁকা করে বললেন, 'সাধুটি বড্ড নোংরা।'

চৌকিদার নিভে যাওয়া লণ্ঠন জ্বালানোর চেষ্টা করছিল। কিছুতেই জ্বলল না। জল ঢুকে গেছে। দপ করে নিভে যাচ্ছে। মেঝেয় বর্ষাতিটা বিছিয়ে দারোগাবাবু বললেন, 'অন্তত মামণিকে বসতে দিন। আমরা মেঝেয় বসছি। কী আর করব।'

চৌকিদার দরজার ভাঙা চৌকাঠে বসে বৃষ্টি আঁচ করতে থাকল।

দারোগাবাবু খ্যা খ্যা করে হাসলেন হঠাৎ। 'কপালে দুর্ভোগ আছে আরও। কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলেন বলুন তো? কোথায় এখন শ্বশুরবাড়ির পালঙ্কে শুয়ে জামাইগিরি ফলাবেন, তা নয়—এই পোড়োবাড়ির ভূতের আড্ডায় ঝড়ে জলে ভোগান্তি। অবশ্য সাধুর ডেরা—মা কালী আছেন, একটা ত্রিশূলও আছে —'

উনি মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালছিলেন। টর্চের আলোয় ত্রিশূলটা দেখার পর ভক্তি ভরে মাকালী ও তাঁর বরের উদ্দেশে কপালে হাত ছুঁইয়েছেন, পাশেই কোথায় খড় খড় দমাশ করে শব্দ হল।

দারোগাবাবু চমকে উঠে বললেন, 'কী রে রতু?'

চৌকিদার বলল, 'পাশের ভাঙা ঘরে কী যেন ঢুকেছে মনে হচ্ছে।'

দারোগাবাবুকে দেখলুম, সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল বের করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে উঁকি মারতে গেলেন। আমার বুকের ভেতর আতঙ্ক ছলকে উঠল। ঊর্মির কাছে কুঠিবাড়ির জঙ্গলে বিস্তর বাঘের গল্প শুনেছি।

হঠাৎ খড় খড় .... দমাস ... ধুপ ধুপ শব্দ করে কে যেন দৌড়ে গেল। দারোগাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কোন ব্যাটা রে?' তারপর তিনিও বৃষ্টির মধ্যে ঝাঁপ দিলেন। তাঁকে আর দেখতে পেলুম না।

চৌকিদার হি-হি করে হেসে বলল, 'আমাদের নতুন বড়বাবুর এইরকম স্বভাব।'

বললুম, 'কী ব্যাপার চৌকিদার?'

চোরের গন্ধ পেয়েছেন দারোগাবাবু। দেখবেন, এক্ষুণি ঘাড় ধরে নিয়ে আসছেন।'

কড় কড় কড়াৎ করে মেঘ গর্জাচ্ছে। বিদ্যুতের আলোয় ধ্বংসস্তূপ আর জঙ্গল ভেসে উঠেই অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি ঝমঝমাচ্ছে। তারমধ্যে চোরের পেছনে ছোটাছুটির কোনো মানে হয়? তাছাড়া চোরেরও আর কাজ ছিল না, এখানে কী মতলবে এসে ওত পেতেছিল? বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা একেই বলে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। তবু দারোগাবাবু ফিরলেন না। উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, 'ও চৌকিদার, দারোগাবাবু যে ফিরছেন না এখনও?'

চৌকিদার আগের মতো হি-হি করে হেসে বলল, 'ওনার নাম নীলু দারোগা। আসা অবধি ওনার দাপটে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খাচ্ছে। দেখুন না কী হয়!'

বললাম, 'তোমার একবার খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল!'

রতু চৌকিদার হঠাৎ চাপা গলায় বলল, 'বাবু, একটা কথা বলব? ভয় পাবেন না যেন।'

চমকে উঠলাম। ওর কথার ছিরি দেখে রাগও হল। বললাম, 'ভয় পাবার কী আছে।'

'বাবু, আপনি তো জামাই মানুষ। এলাকায় বিশেষ আসেন-টাসেন নি। তবে দিদি ভালই জানেন।' চৌকিদার তেমনি চাপা গলায় বলল, 'এই জায়গাটা বিশেষ সুবিধের নয়। দারোগাবাবু মরুক। আপনারা চুপটি করে বসে থাকুন।'

এবার টের পেলুম, ঊর্মি আমার গা ঘেঁষে এল। হাসবার চেষ্টা করে বললাম, 'ভ্যাট! ওসব আমি মানি না, বুঝলে চৌকিদার? যত ভূত প্রেত, সে তোমাদের পাড়াগাঁয়েই।'

চৌকিদার বলল, 'দোহাই জামাইবাবু, দয়া করে আর নাম করবেন না। বেগতিকে পড়ে আমরা এখানে আশ্রয় নিয়েছি। নৈলে—বুঝলেন তো? কুঠিবাড়ির জঙ্গলের নিচেই শ্মশান। আগে এই ঘরটাতে মড়া নিয়ে শ্মশানযাত্রীরা এসে—'

এ পর্যন্ত শুনেই ঊর্মি অন্ধকারে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'চুপ করতে বলো তো ওকে।'

চৌকিদার ঊর্মির আতঙ্ক টের পেয়ে বলল, 'না না। আর ভয়ের কিছু নেই। দেখলেন না? এখন এ ঘরে সাধুবাবা এসে আস্তানা করেছেন। মাকালীর পট আর ত্রিশূলও দেখলেন। কিচ্ছু ভয় নেই।'

বৃষ্টিটা একটু কমেছে মনে হচ্ছিল। কিন্তু মেঘ ডাকছিল সমানে। দারোগাবাবুর সাইকেলটা দরজার পাশে রাখা। বিদ্যুতের আলোয় চকমক করে উঠছিল। দারোগাবাবুর হল কি?

হঠাৎ চৌকিদার বলল, 'বড়বাবু ফিরলেন নাকি?'

বিদ্যুতের আলোয় যে আবছা মূর্তিটা দেখতে পেলুম, সেটা দারোগাবাবুর বলে মনে হল না। কারণ মূর্তিটা শাদা পোশাক পরা। দ্বিতীয়বার বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল। তারপর দেখি, রতু চৌকিদার উঠে দরজার ধারে সেঁটে দাঁড়িয়েছে। তৃতীয়বার বিদ্যুতের আলোয় রতু চৌকিদারকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে দেখলুম। তারপর তার দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলুম। হকচকিয়ে গিয়ে বলে উঠলুম, 'চৌকিদার! চৌকিদার!'

কেউ ঘরের ভেতর ভারি গলায় খু-খু করে হেসে বলল, 'পালিয়েছে। আমাকে ভেবেছে ইয়ে।'

চমকে উঠে বললাম, 'কে?'

'আমি।'

'আমি মানে? বলবেন তো মশাই কে আপনি?'

'যার ঘর, সেই আমি। আবার কে?'

'আপনি সাধুবাবা?'

'সাধু বলুন, সাধু—চোর, বলুন চোর।' সেইরকম ভারি গলায় খুঃ খুঃ করে অদ্ভুত হেসে লোকটা কোনার দিকে বসল মনে হল। ঘুরঘুটে অন্ধকারে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে—কিন্তু ঘরের ভেতর পৌঁছুচ্ছে না আলো কেন কে জানে! বৃষ্টিটা আরও কমেছে। ব্যাঙ আর পোকামাকড়ের ডাকও শোনা যাচ্ছে এবার। ঊর্মি আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঠ হয়ে বসে আছে।

বললুম, 'আপনার কাছে দেশলাই আছে?'

'কেন?'

'চৌকিদারের লণ্ঠনটা জ্বালানোর চেষ্টা করতাম।'

লোকটা সেই বিদঘুটে খুঃ খুঃ হেসে বলল, 'কী দরকার? তার চেয়ে আঁধারে বসেই গল্পগুজবে আপত্তি কী? আমার আবার একটু মুশকিলও আছে। নীলু দারোগাকে ভড়কি দেখিয়ে হাওয়াকলের দিকে জঙ্গলে ঢুকিয়ে এসেছি। ওনার টর্চও গেছে বিগড়ে। যদি ফিরে আসেন, আঁধারে আমাকে দেখতে পাবেন না। দয়া করে বলবেন না যে আমি আছি। কেমন?'

অবাক হয়ে বললুম, 'সে কী? দারোগাবাবু কী আপনাকে তাড়া করেই—'

'আজ্ঞে। তবে এ নিয়ে চারবার ফস্কালাম নীলু দারোগার হাত থেকে। শুধু দুঃখ ওনার হাতে আমার জটাচুল আর গোঁফদাড়িটা থেকে গেল।'

বুঝলাম, সাধুবাবার ছদ্মবেশে এই লোকটা এখানে আস্তানা করেছিল—এ একজন চোর আসলে। সম্ভবত দরোগাবাবুকে এখানে আসতে দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে পাশেই কোথাও আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু ধড়িবাজ দারোগাবাবুকে ফাঁকি দিতে পারেনি। টর্চের আলোয় ঠিক চিনতে পেরে তাড়া করেছিলেন। ধরেও ফেলেছিলেন। কিন্তু পরচুলো আর নকল গোঁফদাড়ির জন্য ফস্কে গেছে।

ভয়টা বেড়ে গেল। অন্ধকারে চোরের হাতের কাছে দুটো স্যুটকেস রয়েছে। সে দুটো হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিতেই চোর বলল, 'কিসের শব্দ হচ্ছে যেন?'

'কিছু না। মশাইয়ের নামটা জানতে পারি?'

'আজ্ঞে পাঁচকড়ি নাম। লোকে পাঁচু সিঁদেল বলে ডাকে।' বলে সেইরকম খুঃ খুঃ করে হাসতে লাগল সে।

এবার আরও হাসি পেল। দারোগা চৌকিদার, চোর। বৃষ্টির রাতে জমেছে ভাল। কিন্তু দারোগাবাবু ফিরছেন না কেন? একটু হেসে বললাম, 'দারোগাবাবু এখনও জঙ্গলে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাহলে। তা পাঁচুবাবু—'

'বাবু শুনলে লজ্জা পাই বাবুমশাই। পাঁচু বলেই ডাকুন।'

'বেশ। তা পাঁচু, সিঁদেল পদবীটা তো কখনও শুনিনি।'

'আজ্ঞে, আমি লোকের ঘরে সিঁদটা ভালই কাটতে পারি কি না, তাই সিঁদেল।'

'সিঁদ কীভাবে কাটো একটু বলবে?'

'দিদিমণি আছেন যে। লজ্জা করে বলতে।'

অবাক হলাম তার অন্ধকারে দৃষ্টিশক্তির পরিচয় পেয়ে। আমি তাকে বলিওনি ঊর্মির কথা। ঘর অন্ধকার। তার জানারও কথা না। অথচ ঠিক টের পেয়ে গেছে। এই না হলে চোর? বুঝলাম চোর হতে গেলেও প্রতিভা দরকার। ঘরে চুরি করার মতো জিনিস আছে, না জেনে তো পাঁচু সিঁদ দেয় না। মিছিমিছি পরিশ্রমে লাভ কী? ওর যেন তৃতীয় চক্ষু আছে—তাই দিয়ে আড়ালের সবকিছু দেখতে পায়। আবার আমার আতঙ্ক জাগল। ঊর্মির গায়ে গয়না আছে এবং স্যুটকেসে কিছু দামী জিনিসপত্রও আছে। পাঁচু নিশ্চয় সব দেখতে পাচ্ছে।

এদিকে পাঁচুর কথা শুনে উর্মির এবার মুখ ফুটল। ফোঁস করে উঠল, 'লোকের ঘরে সিঁদ কাটতে লজ্জা করে না? বলতে লজ্জা!

আমি প্রমাদ গণলাম। ওখানে কোথাও ত্রিশূলটা আছে। কে জানে, সিঁদকাঠি চালানো হাতে ত্রিশূলটা ধরতে কতক্ষণ লাগবে। অন্ধকারে আমাদের দুজনকে ত্রিশূল মেরে খুন করে গয়নাগাঁটি জিনিসপত্র নিয়ে পালালেই হল! বললাম, 'না ভাই পাঁচু, তুমি বল। উর্মি তুমি চুপ করো।'

তারপরই উর্মির কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। উর্মি একেবারে গ্রাম্য অশিক্ষিতা মেয়েদের মতো অশালীনভাবে বিকৃত কণ্ঠস্বরে বলে উঠল, 'কে উর্মি? আমি মঙ্গলা। উর্মি টুর্মি এখন ভিরমি খেয়ে পড়ে আছে।'

পাঁচু বলল, 'তাই বল্! আমি ভাবি, বাবুমশাইয়ের কাছ ঘেঁসে বসে ওটা কে। হ্যাঁ রে মংলি তুই অ্যাদ্দিন ছিলিস কোথায়? তোর মাই বা কোথায়?

আমি হতবাক। অন্ধকারে কাঠ হয়ে শুনতে লাগলাম এই কথাবার্তা।

যা দেখগে, ওই হাওয়াকলের কাছে শ্যাওড়াগাছে ঝুলছে।

'সর্বনাশ কেন, কেন?'

'পেটের জ্বালায়।'

'আর তুই কোথায় ছিলিস রে বাছা?'

'আম্মো পেটের ধান্দায় শহরে গেসলাম। কী করব? কিন্তু তাতেও পেট ভরল না। শেষে ফলিডল খেয়ে—

পাঁচু ফোঁস ফোঁস করে নাক ঝেড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমার মরণ ভাল রে মা! আমি মরতে গঙ্গায়—'

'বাবা! যেও না শোনো।'

আমার পাশ দিয়ে পাঁচুর সিল্যুট মূর্তি বেরিয়ে গেল। বাইরে বৃষ্টি বন্ধ। মেঘের স্তর ছাপিয়ে এখন আবছা আলো নেমেছে। দেখলুম পাঁচুর পেছন পেছন একটি মেয়ে দৌড়ে গেল—খোলা চুল। আর ঠিক এই সময় একটা প্যাঁচা আচমকা ডেকে উঠল ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও! তারপর শেয়ালের ডাক শুনতে পেলাম।

প্রচণ্ড ভয় পেয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'উর্মি! উর্মি!'

সঙ্গে সঙ্গে পিঠের কাছে সাড়া পেলাম, 'কী হল?'

'তুমি কোথায় ছিলে উর্মি?' ওকে ছুঁয়ে বললাম। 'কী অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল দেখলে?' উর্মি আস্তে বলল, 'হ্যাঁ। আমি ভয়ে চুপ করে ছিলাম! মেয়েটা আমার পাশে এসে বসতেই টের পেয়েছিলাম। তারপর যেমনি ও আমার গলায় কথা বলে উঠল, অমনি বুঝলাম ও কে!'

'ওকে চেনো নাকি?'

'হ্যাঁ। আমাদের গ্রামের মেয়ে। চিনব না কেন? ফলিডল খেয়ে গতবছর স্যুইসাইড করেছিল।'

'পাঁচু ওর বাবা বুঝি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু পাঁচুও তো—ওই। আমার ভয় করছে। চলো, বৃষ্টি ছেড়েছে। আমরা ঈশানের

কুঁড়েঘরে গিয়ে বরং রাতটুকু কাটাই। বলতাম না তোমাকে? কুঠিবাড়ির জঙ্গল খারাপ জায়গা।'

দুজনে বোঁচকা দুটো নিয়ে বেরুতে যাচ্ছি, এতক্ষণে মেঘের ফাঁকে জ্যোৎস্না আবার উপচে পড়েছে; ঝলমলে জ্যোৎস্নায় দারোগাবাবুর আবির্ভাব ঘটল। আরে! চললেন কোথায়? মোটে তো বারোটা বাজে। পাঁচটার আগে ঈশানদাকে পাবেন ভাবছেন?

সব কথা চেপে বললাম, 'চৌকিদার হঠাৎ পালিয়ে গেল। আমরা একা থাকতে আর সাহস পেলাম না। তাই—'

দারোগাবাবু খ্যা খ্যা করে হাসলেন। 'রতে পালিয়েছে? বড্ড ভিতু ব্যাটাছেলে! বসুন, বসুন। আমি এসে গেছি। আর ভয়ের কারণ নেই।'

অগত্যা আবার ঘরের ভেতর ঢুকতে হল।...

বাইরে এবার জ্যোৎস্নায় জঙ্গল আর ধ্বংসাবশেষ কালো হয়ে ফুটে আছে। দারোগাবাবু বললেন, 'ভিজে একসা হয়ে গেছি। আর বলবেন না—পাঁচুর জ্বালায় অস্থির। ব্যাটা সিঁদেল আজও জোর করে গেল। ওর জটা আর পরচুলো হাওয়াকলের ইঁদারায় রাগ করে ফেলে দিয়ে এলুম।'

উর্মি বলল, 'কিন্তু দারোগাবাবু, পাঁচু তো গঙ্গায় ডুবে মরেছে শুনেছি। মায়ের চিঠিতে খবর পেয়েছিলাম, পাঁচু গলায় ইঁট বেঁধে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিল।'

নীলু দারোগা হাসতে হাসতে বললেন, 'মরেও মরে না ওরা—মানে পেঁচো ব্যাটাচ্ছেলেরা। সে জন্যেই তো এই নীলমাধব চক্কোত্তিরা আছে। গভর্নমেন্ট পয়সা দিয়ে পুষছে। যেমন বাঘা ওল, তেমনি বুনো তেঁতুল। চোর আছে, তো দারোগাপুলিশও আছে। ওরা না থাকলে আমাদের থাকাই বৃথা—বুঝলেন না। যেমন—ওই আলো আর আঁধার। কিংবা আঁধার আর আলো। বুঝলেন কিছু?'

এই সময় বাইরে জ্যোৎস্নায় সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক, হাতে ছড়ি আর টর্চ, গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, 'কারা কথা বলছে? কে গো সব?'

দারোগাবাবু বেরিয়ে গিয়ে বললেন, 'নমস্কার স্যার! আমি নীলু।'

'অ-নীলুদারোগা! তুমি এখানে কী করছ হে। অ্যাঁ।

'আর বলবেন না স্যার! পেঁচো ব্যাটার জন্যে ওত পেতে আছি।' দারোগাবাবু হাই তুলে ফের বললেন, 'আপনি স্যার ঘুমোননি দেখছি।'

'নাঃ, ঘুম আসছে না! তাই বেরিয়েছিলুম হাওয়াকল দেখতে। জলে বাগান ভাসিয়ে একাকার করছে—এদিকে তুমুল বৃষ্টি।'

'হাওয়াকল! উনিশশো বাহাত্তর সালের জুলাই মাসে? সে তো পঞ্চাশ বছর আগে ভেঙে পড়ে গেছে। ইঁদারাটাও দেখছি। আবার হাওয়াকল করেছেন বুঝি এই ভদ্রলোক? কিন্তু এতরাতে—

উর্মি আমাকে জোর করে খিমচি কাটল। অমনি পাথরের মতো অনড় হয়ে গেলাম।

ভদ্রলোক ছড়ি ঠুকঠুক করতে করতে টর্চ জ্বালতে জ্বালতে চলে গেলেন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। দারোগাবাবু বাইরে থেকে ডাকলেন, 'ও মশাই! হাওয়াকল দেখেছেন কখনও?'

ভয়ে-ভয়ে বললাম, 'ছবিতে দেখেছি।'

'বাস্তবে দেখে যান। ওই দেখুন, কেমন বনবন করে ঘুরছে।'

দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, একটু দূরে জঙ্গলের মাথায় জ্যোৎস্নাভরা আকাশে প্রকাণ্ড একটা চর্কি সত্যি বনবন করে ঘুরছে। বললাম, ঊর্মি! ঊর্মি! দেখে যাও! দেখে যাও!

ঊর্মি উঁকি মেরে দেখেই বলল, 'চোখ ঢাকো। দেখো না—দেখতে নেই।'

দারোগাবাবু এই সময় স্থির দাঁড়িয়ে কী যেন শুনছিলেন কান খাড়া করে। আপন মনে বললেন, 'জমিদারবাবু দেখছি মারা পড়বেন এবার। একাদোকা রাতবিরেতে এমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বর্ষার রাত! পোকামাকড় বেরোয়।'

বলেই নড়ে উঠলেন। 'ওখানে কে রে?'

'আজ্ঞে, আমি রতু, বড়বাবু।'

'অ্যাই ব্যাটা! এতক্ষণ ছিলিস কোথায় তুই?'

'আজ্ঞে, আপনাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম।'

'চল আমরা রোঁদে বেরোই।'

রতু চৌকিদার হি-হি করে হেসে বলল, 'ইঁদারার তলায় আপনার মড়াটা ফুলে ঢোল হয়ে আছে দেখে এলুম। একটা বিহিত করবেন নাকি বড়বাবু?'

'ছেড়ে দে। মরদেহ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আয়, বেরিয়ে পড়ি। এতক্ষণ সিঁদেল পেঁচো কোথায় কী করে বসে আছে। চলে আয়।'

'দাঁড়ান, আমার ছাতি আর লণ্ঠনটা নিয়ে আসি।'

'তাই তো! আমার সাইকেল আর বর্ষাতিটা রয়ে গেল যে।'

আমি ও ঊর্মি কোণে সেঁটে গেলাম। ওরা যে যার জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমাদের অস্তিত্ব বেমালুম ভুলে গেল কেন কে জানে! ভুলে গেল বলেই নিশ্চিন্তি অবশ্য।

দুটি সিল্যুট মূর্তি জ্যোৎস্নায় বৃষ্টিভেজা প্রকৃতির ভেতর লীন হয়ে যেতেই ব্যস্তভাবে ডাকলাম, 'ঊর্মি! এক্ষুণি!'

ঊর্মি তৈরি ছিল। দুজনে স্যুটকেসদুটো নিয়ে ঝটপট করে বেরিয়ে পড়লাম। আবার প্যাঁচা ডাকল ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও। শেয়াল ডাকতে থাকল। ঈশান মাঝির কুঁড়েঘরে এখন আমাদের নিরাপদ দুর্গ। রাতটা কাটিয়ে দিতে পারলে বেঁচে যাব।

পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। দক্ষিণপূর্ব কোণে জঙ্গলের আকাশে জ্যোৎস্নারাতে সেই উঁচু হাওয়াকলের প্রকাণ্ড চর্কি এখন আস্তে ঘুরছে। বৃষ্টিধোয়া জ্যোৎস্নায় কালো এক অসম্ভব অলীক হাওয়াকল?

ঊর্মি ডাকল, 'আঃ! কী দেখছ? চলে এস।'

ওর কথায় সম্বিৎ ফিরল। হন্তদন্ত চলতে থাকলাম নদীর ঘাটের দিকে।....

সামুদ্রিক

পূর্ব উপকূলে চন্দনপুর-অন-সির মতো নির্জন সমুদ্রতীর আর কোথাও নেই। সেবা:
শরতকালে সেখানে বেড়াতে গিয়ে এরকম নির্জনতা দেখে প্রথমে খুব অবাক লেগেছিল। কিন্ত
ক্রমশ ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম। প্রথমত, এখানে সমুদ্রের চেহারায় আদিম ধরনের রাগি
ভাব এবং অসংখ্য ডুবো পাথরে ভর্তি ! তাই স্নান করা প্রায় অসম্ভব। যে সমুদ্রে স্নান করা যা:
না, সেখানে ভ্রমণবিলাসীরা যেতে চায় না। দ্বিতীয়ত, চন্দনপুর-অন-সিতে কোনো বাজার নেই
হোটেল নেই। ছোট্ট একটা জেলেবসতি আর এখানে ওখানে কয়েকটা বড়লোকে:
বাড়ি—এবং সেই বড়লোকেরা কদাচিৎ মোটরগাড়ি চেপে নেহাত স্ফূর্তি লুঠতেই আসেন
সঙ্গে থাকেন একদঙ্গল ইয়ারবন্ধু। আদিম ধরনের এই ছোট্ট জনপদে সেইসময়টায় যা কি
হইহল্লা, তারপর আবার সেই স্তব্ধতা, সেই নির্জনতা। অসংখ্য কালো কালো পাথরে প্রতিহ
সমুদ্রের ক্রুদ্ধ গর্জন, সংকীর্ণ বিচের ওপর শাদা কার্পেট মুহুর্মুহু। ধু-ধু বালিয়াড়িতে সমুদ্রে
শ্বাসপ্রশ্বাস প্রতিধ্বনিত হতে থাকে দিনরাত্রি সারাক্ষণ।

প্রথম দর্শনেই টের পেয়েছিলাম এ সমুদ্র কারুর নয়, তার নিজের। এ সমুদ্রকে বুঝি ভ
পাওয়া সহজ, ভালবাসা সহজ নয়। বালির বিচে যত কালো-কালো পাথর ছড়ানো, ত
সমুদ্রের বুকে—হঠাৎ দেখে মনে হয়, যেন কেমন করে ফিরে গেছি প্রাক-ইতিহাসের কোনে
এক শরতকালে, আর পেছনের অরণ্য থেকে হাজার হাজার ম্যামথ এসে স্নান করতে নেমে
সমুদ্রে। ভুল হয়, যেন তারাই বিকট গর্জন করছে স্নানের আনন্দে, যেন তারাই ঘন নীল জলকে
আলোড়িত করছে, ছড়িয়ে দিচ্ছে, ডুবছে, ভাসছে—আদিম ধরনের এ বুঝি এক খেলা।

এই নির্জন সমুদ্রতীরে আমি যাঁর অতিথি, তাঁর নাম ডঃ প্রভুদয়াল পাণিগ্রাহী। ড
পাণিগ্রাহীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল কলকাতায় একটা সেমিনারে। কথায়-কথা
বলেছিলেন, যদি নির্জনতায় কয়েকটা দিন কাটাতে চান, চন্দনপুর-অন-সিতে চলে যাবেন
ওখানে আমার একটা বাড়ি আছে। শরতকালটা ওখানেই আমি থাকি। সমুদ্র নিশ্চয় দেখেছেন
কিন্তু চন্দনপুর-অন-সিতে সমুদ্রের স্বরূপ দেখে অবাক হবেন।

ডঃ পাণিগ্রাহী ইতিহাসের অধ্যাপক। চন্দনপুর-অন-সিতে যাঁদের বাড়ি আছে, তাঁদের মতে
অবশ্য বড়লোকও নন, স্ফূর্তিবাজও নন। বরং স্বভাবে একেবারে সাদাসিধে, নীরস এব
সবসময় কেমন যেন গম্ভীর। বাড়িটা মাঝারি আয়তনের, একতলা, একটুকরো বাগানও আছে
জানালা থেকে সমুদ্র দেখা যায়। আমার বেশ ভালই লাগছিল। বাড়িতে ডঃ পাণিগ্রাহী ছাড়
আর জনমানুষটি নেই। উনি নিজেই রান্নাবান্না করেন। বেশির ভাগ সময় পড়াশোনা নি
থাকেন। সব ঘরে কাঁড়িকাঁড়ি বই। বুঝতে পারছিলাম, ইতিহাসের গবেষকের পক্ষে হয়তো
এমন একটা পরিবেশই খুব বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু সমুদ্রের স্বরূপ কতটা দেখতে পেলাম জানি না, একটা দিনেই আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। পরের দিনটা কাটিয়ে কেটে পড়ব ভাবছিলাম। নির্জনতা আমার ভাল লাগে—কিন্তু এ যেন বড় বেশি রকমের নির্জনতা। তাছাড়া আগেই বলেছি, এ সমুদ্রকে ভয় পাওয়া যতটা সহজ, ভালবাসা ততটা সহজ নয়। অবশ্য ভয় পাওয়ার মধ্যেও একটা আনন্দ থাকে। কিন্তু এখানে সমুদ্র শুধুই ভয়ের, শুধু চোখ রাঙানো এক ভয়ঙ্করের আদিম রূপ।

পরদিন বিকেলে সেই আদিম ভয়ঙ্করের দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটল যে প্রায় তখনই সমুদ্রের সেই ভয়ঙ্কর রূপ মুছে গিয়ে জেগে উঠল বিপরীত একরূপ—স্নেহপ্রবণ পিতামহের মুখে সুন্দর হাসির মতো। মুহূর্তে আমার মনে হল, তাহলে আমারই দেখার ভুল—এই সমুদ্রকে ভালবাসা যায়, তাকে আপন করা যায়।

ডানদিকে উঁচু বালিয়াড়ির ওপর থেকে ফ্রকপরা এক বালিকা দৌড়ে নেমে আসছিল।—তার সঙ্গে একটা ছোট্ট শাদা কুকুর তার মতো করে নামতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল। বালিকা খিলখিল করে হেসে তাকে বুকে তুলে নিল। তারপর একটুখানি দৌড়ে এসে কুকুরটাকে নামিয়ে দিল বিচে এবং স্কিপিং খেলতে থাকল। কুকুরটা এগিয়ে গেল সমুদ্রের কাছে। যেই একটা ঢেউ এসেছে, সে সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে এল। শাদা ফেনার স্তর তার পায়ের কাছে আসতেই সে মুখ নামিয়ে শুঁকলো। মেয়েটি স্কিপিং করতে করতে আবার খিল খিল করে হেসে উঠল। বিকেলে গোলাপী রোদ্দুরে নির্জন বিচে দুটি প্রাণীর আপনমনে ওই খেলা দেখতে দেখতে প্রকৃতি আমার কাছে ততক্ষণে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছিল!

সমুদ্রের ওপর শেষবেলার সেই গোলাপী আলো পড়েছে। সমুদ্রকে আমার তখন আর ভয়ঙ্কর লাগছে না। এক সুন্দর বালিকা আর তার ছোট্ট সঙ্গীটি এসেই সমুদ্রকে বদলে দিয়েছে? আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওদের খেলা দেখছিলাম। ওরা আমাকে গ্রাহ্য করছিল না। বালিকা স্কিপিং করতে করতে আমার কাছাকাছি চলে আসছিল। কুকুরটাও তাকে অনুসরণ করছিল। ভাবছিলাম কুকুরটাকে একটু আদর করব। ফুটফুটে শাদা, নরম, যেন এক পুতুল কুকুর। আর ওই বালিকাও যেন এক সুন্দর পুতুল। কিন্তু ওরা আমার দিকে তাকাচ্ছিল না। কাছাকাছি এসে আবার দূরে সরে যাচ্ছিল। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও ওরা থামছিল না। ওরা কি ক্লান্ত হচ্ছে না? আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। বললাম, খুব হয়েছে। এবার একটু থামো তো, দেখি। আমার কাছে এস। গল্প করি। হুঁ, নাম কী তোমার? আর এই খুদে প্রাণীটারই বা কী নাম?

আমার দিকে তবু তাকাল না ওরা। তখন হাসতে হাসতে আমি এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে। তখন ওরা বিচের ওপর দৌড়তে শুরু করল। এও কি একটা খেলা ওদের কাছে? নাকি ওরা ভয় পাচ্ছে আমাকে? চেঁচিয়ে বললাম, ভয় কোরো না—আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

কিন্তু ওরা কথা কানে নিল না। আমি থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম, দুটিতে তখনও দৌড়চ্ছে। কতদূরে গিয়ে ওরা থামল। তারপর সেখানে আগের মতো মেয়েটি স্কিপিং শুরু করল। কুকুরটাও তাকে কেন্দ্র করে ছুটোছুটি করতে থাকল। আবছা ধূসর একটা পটের গায়ে দুটি ছোট্ট প্রাণী ক্রমশ মিলিয়ে গেল দেখতে দেখতে।

আমার মন খারাপ হয়ে গেল। বেশ তো ওরা দেখছিল। কেন ওদের এমন করে বিব্রত করলাম—অচেনা মানুষকে ওরা ভয় পেতেই পারে। একটা পাথরের ওপর বসে রইলাম। সূর্য ডুবে গেলে ধূসরতা ক্রমশ ঘন হল সমুদ্রের দিকে। নির্জন বিচে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর উঠতে যাচ্ছি, হঠাৎ ধুপ ধুপ শব্দে চমকে উঠলাম। তারপর দেখি সেই বালিকা আর তার কুকুর ফিরে এসে আগের মতো খেলছে।

এবার কোনো কথা বললাম না। আবছায়ার ভেতর দুটি কালো মূর্তির নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছি। ওদের এই খেলা আর কতক্ষণ চলবে? ওরা কি বাড়ি ফিরবে না? একটু পরে সমুদ্রের শিয়রে একটুকরো চাঁদ উঠে এল। সমুদ্রের জলে ঝলমলিয়ে উঠল নরম সোনালী জ্যোৎস্না—সারা সমুদ্র যেন তখন সোনার কারুকার্য। বালিকা সমানে স্কিপিং করছে। এতক্ষণে আমি উঠে দাঁড়ালাম। তারপর ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম। বললাম, কী? আর কতক্ষণ খেলবে তোমরা? বাড়ি যাবে না?

বালিকা থমকে দাঁড়াল। কুকুরটা তার পায়ের কাছে এসে আমার দিকে মুখ তুলল। তার চোখে জ্যোৎস্না চকচক করতে থাকল। আশ্চর্য নীল দুটি চোখ প্রাণীটা আমাকে দেখছে যেন। বালিকার চোখেও তেমনি জ্যোৎস্নার উজ্জ্বলতা। বললাম, কী? কথা বলছ না কেন? কী নাম তোমার?

কী যেন বলল। বিচে এতক্ষণে বাতাস বইছে জোরাল হয়ে। সমুদ্রের গর্জন আর প্রবল বাতাসে কথাটা শোনা গেল না। আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, কী নাম? কোথায় থাকো।

সে একটু হাসল। তারপর হঠাৎ আগের মতো দৌড়তে শুরু করল। জ্যোৎস্নায় ধু-ধু শাদা বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে বালিকা আর তার প্রিয় সঙ্গীকে ক্রমশ মিলিয়ে যেতে দেখলাম। এতক্ষণে সন্দেহ হল, মেয়েটি বোবা, নয়তো আমার ভাষা বুঝতে পারেনি।

কিন্তু বোবারা কি খিলখিল করে হাসে? সন্দেহটা থেকে গেল। ফিরে গিয়ে দেখি, ডঃ পাণিগ্রাহী চুপচাপ বারান্দায় বসে আছেন। বললেন, বেড়ানো হল? কেমন লাগল চন্দনপুর-অন-সি?

বললাম, অপূর্ব।

ডঃ পাণিগ্রাহী একটু হেসে বললেন, এখানে সমুদ্র সবসময় মানুষকে কিছু ছবি উপহার দিতে চায়। আপনি কী ছবি পেলেন বলুন?

বললাম, এক বালিকা আর তার খেলার সাথী ছোট্ট শাদা কুকুর। বড় সুন্দর ছবি।

ডঃ পাণিগ্রাহী আমার দিকে নিষ্পলক চোখে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, বসুন, কফি তৈরি করি ....

সত্যি বলতে কী, পরদিনই যে যাব ভাবছিলাম, যেতে তো ইচ্ছে করলই না বরং চন্দনপুর-অন-সির সমুদ্রকে ভীষণ ভালবেসে ফেললাম। সারাক্ষণই সমুদ্রতীরে গিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। যতক্ষণ বসে থাকি, সেই ফুটফুটে সুন্দর ফ্রকপরা বালিকা আর তার শাদা কুকুরটা সমুদ্রের জল ছুঁয়ে খেলা করে বেড়ায়—কখনও দূরে, কখনও কাছে। বালিকা স্কিপিং করে কখনও কখনও বা বালিয়াড়ির দিকে দৌড়ে যায়। কিছুক্ষণ অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার ফিরে

আসে। আমি তাকে ডাকি। কথা বলতে চাই। সে শুধু নিঃশব্দে হাসে। আবার ছুটে যায়। তার কুকুরটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে যেন অবাক চোখে আমাকে দেখতে থাকে। কিন্তু সেও তার সঙ্গীর মতো নিঃশব্দ।

একদিন বিচের সেই পাথরটাতে বসে বিকেলের সামুদ্রিক পটে সুন্দর দুটি প্রাণীর আপন মনে খেলা দেখছিলাম। সন্ধ্যা হয়ে গেলে সমুদ্র থেকে বিশাল লাল গোলার মতো চাঁদ লাফ দিয়ে আকাশে উঠল। কিছুক্ষণ পরে সেই চাঁদের রঙ বদলে সোনালী হয়ে গেল। ঝলমলে জ্যোৎস্নায় দুটি চঞ্চল মূর্তি তখনও ক্লান্তিবিহীন খেলায় মেতে আছে। হঠাৎ টের পেলাম, সমুদ্র আমার পায়ের কাছে এসে পড়েছে। পাথরে একটা প্রকাণ্ড ঢেউ এসে প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে পড়ল। আমি ভিজে গেলাম একেবারে। তারপরই কানে এল সমুদ্রের অস্বাভাবিক গর্জন। বাতাসও হঠাৎ বেড়ে গেল। ঝড় বইতে শুরু করল। সমুদ্রের দিকে আতঙ্কে তাকিয়ে দেখলাম, বিশাল উঁচু হয়ে বিকট গর্জন করতে করতে ছুটে আসছে যেন এক দীর্ঘ কালো পাহাড়, তার মাথায় ভয়ঙ্কর শাদা ফেনা। আমি বিচ থেকে দৌড়ে গিয়ে উঁচু বালিয়াড়িতে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় এল, আজ বুঝি ভরা কোটাল। পূর্ণিমার রাতে সমুদ্র এমনি করে উত্তাল হয়ে ওঠে।

অমনি মনে পড়ল বালিকা আর তার কুকুরের কথা। সর্বনাশ! কোথায় গেল ওরা? বালিয়াড়ির বুকে এসে মুহুর্মুহু আছড়ে পড়ছে উন্মত্ত লোনাজল। সারা বিচ তলিয়ে গেছে। ওরা কোথায়! আমি ভীষণ ভয় পেয়ে ডঃ পাণিগ্রাহীর বাড়ির দিকে ছুটে চললাম।

ডঃ পাণিগ্রাহী বারান্দায় আলো জেলে বসেছিলেন। আমার অবস্থা দেখে একটু হেসে বললেন, সমুদ্র আপনাকে আজ কী উপহার দিয়েছে, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। যান, কাপড় বদলে আসুন।

দম-আটকানো গলায় বললাম, ডঃ পাণিগ্রাহী, সেই মেয়েটি আর তার কুকুর হয়তো ....

আমার কথা কেড়ে ডঃ পাণিগ্রাহী বললেন, ওই দেখুন—ওরা এখনও খেলছে।

ভীষণ অবাক হয়ে দেখি, আজ টেবিলে একটা ফ্রেমে আটকানো ছবি রেখেছেন ডঃ পাণিগ্রাহী, আর সেই ছবিতে সেই বালিকা আর তার শাদা ছোট্ট কুকুর খেলার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে আছে। বললাম, এ কী! ডঃ পাণিগ্রাহী বললেন, আমার মেয়ে পিংকি আর তার প্রিয় সাথী রুলি। গতবছর ওদের দুজনকেই সমুদ্র নিয়ে গেছে—হয়তো ছবি আঁকবে বলেই....।

আমি ও বিপাশা

মেয়েটির দিকে অবাক হয়ে চেয়েছিলাম কতক্ষণ। খুব চেনা লাগছিল, অথচ সাহস ক
জিজ্ঞেস করতে পারিনি। তবে অবাক হবার কারণ, নির্জন নদীর ধারে সভ্যতা খুব কদাচি
দেখা যায়—যদিও খানিকদূরে একটা হাইওয়ে, বিশাল ব্রিজ আর উঁচু উঁচু বিদ্যুতবাহী ফ্রে
রয়েছে।

শরতে এই নদী এখন বেগবতী। কাশফুল ফোটা দুই পাড়ও ভারি চঞ্চল। বাঁ
জামগাছটার ছায়ায় দাঁড়িয়ে মেয়েটির মুখোমুখি হতেই চিনলুম।—বিয়াস নাকি? কখন এলে

সে প্রথমটা একটু হকচকিয়ে পড়েছিল। পরমুহূর্তে চিনতে পেরে হেসে উঠল।—পারুদ
আমরা কাল এসেছি। তোমার শাট্‌লেজও এসেছেন। দেখা হয়নি?

—না তো? কেমন আছ সব? বাবা-মা ভাল আছেন? সামাজিক প্রাণীর পক্ষে এসব বল
রীতি আছে বলেই অনর্গল কিছুক্ষণ বলে গেলুম!

সে ভুরু নাচিয়ে বলল—কিন্তু বিয়াস নামটা এখনও আপনার মনে আছে দেখছি।

—আছে। কত কী মনে আছে।

—যেমন?

—শুনবে? বলে গলার স্বর একটু চাপা করলুম। এক খরার দুপুরে ওই জামবনে তোম
ভয় পাইয়ে দিয়েছিলুম। তারপর কী ভীষণ কাণ্ড হল। তুমি মাছের মতো ছটফট করছি
অথচ সে যেন সুখ তোমার।

তার মুখ রাঙা হয়ে গেল শুনতে শুনতে। মুখ ঘুরিয়ে শুধু বলল—যাঃ!

—লজ্জা পাবার কী আছে? সে বিয়াস তো আর তুমি এখন নও। রীতিমতো বিপ
চৌধুরী!

বিপাশা হঠাৎ যেন সামলে নিল। তার সভ্যতাময় সপ্রতিভ চেহারায় হাসতে হা
বলল—আর দাদাও এখন শতদ্রু চাউড্রি হয়ে গেছেন জানেন তো?

—বল কী!

হবে না আবার? ওড়িশার একটা প্রজেক্টের বড়কর্তা হয়েছেন।

—জানতুম শতদ্রু উন্নতি করবে।

একটা মেটুলি ঝোপের পাতা ছিঁড়ে বিপাশা বলল—উন্নতি না হাতি! তোমার মনে
পারুদা, দাদা বলতেন—এয়ার ফোর্সের পাইলট হবো? আকাশে আকাশে ঘুরব। আর
নামবই না। মাটির ওপর গুলিগোলা বোমা ছুঁড়ে পৃথিবীর বারোটা বাজাব।

—হ্যাঁ, শতদ্রুদা তাই বলত বটে। তখন যেন তোমার বাবার সঙ্গে তোমার জ্যাঠার
মামলা চলছিল।

বিপাশা শান্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—হঠাৎ এখানে কোত্থেকে হাজির হলেন? জানেন—আপনাদের বাড়িতে খোঁজ নিয়েছিলুম এসেই। শুনলাম ....

—শুনলে পারু মানুষ খুন করে ফেরারী হয়েছে?

বিপাশা চমকে উঠল।—যাঃ তা কেন বলবে? বলল—নেই। ব্যস।

—বলল নেই—আর হঠাৎ এই সকালে আমাকে নদীর ধারে দেখতে পেলে। এতে তোমার কিছু অবাক লাগছে না?

বিপাশা সরল মুখে বলল—না তো!

—আমার চেহারায় কিছু টের পাচ্ছ না?

সে আমাকে কয়েক মুহূর্ত খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বলল—নাঃ!

—আমার ময়লা শার্ট, ভিজে ধুতি, খালি পা, লাল রুক্ষ চোখ দেখেও কিছু আঁচ করতে পারছ না?

বিপাশা এবার সন্দিগ্ধ স্বরে বলল—কিছু বুঝতে পারছি না পারুদা।

—বিপাশা, তুমি কি গ্রাম থেকে হেঁটে এতটা পথ এসেছ?

—না গাড়িতে। ওই যে ব্রিজে আমার গাড়ি।

—তুমি নিজে ড্রাইভ করো?

—উঁহু।

—বিপাশা, তোমার পরনের ওটাকে কী বলে যেন? বেলবটস?

বিপাশা একটু অপ্রতিভ হল।—হঠাৎ আমার পোশাক নিয়ে পড়লেন কেন? নিজের কথা বলুন।

—বিপাশা, তুমি সভ্যতার অন্তর্গত!

—ইস্! আপনি যেন নন!

—আচ্ছা বিপাশা, তবু কেন তোমার এখানে আসতে ইচ্ছে করল? এখানে তো শুধু কাশফুল, নদীর ঘোলা জল, পাঁক, জঙ্গল, পোকামাকড়। .... বিপাশা! সরে দাঁড়াও। ঝোপে একটা লাউডগা সাপ!

বিপাশা চমকে সরে এল। —কই? কোথায়?

ওকে দেখিয়ে দিলুম। তারপর বললুম—ভীষণ বন্যা হল তো! সব পোকামাকড় এসে বাঁধের ঝোপঝাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। এখনও ফিরে যায়নি যে যার এলাকায়। এমন কি শামুকগুলো এখানেই ডিম পেড়েছিল। আর .....

—আপনি ওভাবে কথা বলবেন না পারুদা! কেমন ভয় করে।

—তবু তুমি এখানে এসেছ!

—বা রে! ছেলেবেলার চেনা সব জায়গা। মনে পড়ছিল, তাই এলুম। .... ও কী! ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

—চুপ। লুকোচ্ছি। ব্রিজে পুলিশ যাচ্ছে।

বিপাশা ব্রিজটা দেখে নিয়ে বলল—ওরা সাইকেলে কোথাও যাচ্ছে। কিন্তু ওদের দেখে

লুকোচ্ছেন কেন?

—বললুম না, ফেরারী আসামী, মানুষ খুন করেছি।

—তুমি... আপনি কি নকশাল, পারুদা?

—উঁহু। আমি কোন দলের মানুষ নই। পৃথিবীকে বদলানো দুঃসাধ্য।

সকৌতুকে বিপাশা বলল—ভাল। কাকে খুন করেছেন?

—শোননি? গ্রামে কেউ বলেনি?

—নাঃ। কেউ বলেনি। খুন-টুন করলে নিশ্চয় বলত।

—বিপাশা!

—উঁ?

—তুমি চলে যাও এখান থেকে। তোমাকে দেখে আমার ভীষণ লোভ হচ্ছে।

বিপাশা প্রায় হইচই করে বলল—এই! আপনি এখনও বড্ড অসভ্যতা করতে পারেন সত্যি। যা ছিলেন, তাই একেবারে। যাঃ!

—বিপাশা, তুমি এত সুন্দর হয়ে উঠেছ!

—মেরে ফেলব পারুদা! একেবারে খুন করে ফেলব কিন্তু। বাজে কথা বলবেন না।

এগিয়ে গিয়ে ওর একটা হাত ধরলুম। —বিপাশা, চলো না ঐ জামবনটায় গিয়ে কথ বলি। এখানে দাঁড়ানো নিরাপদ নয়। চলো না!

বিপাশা অনিচ্ছাসত্ত্বেও পা বাড়াল। যেতে যেতে ব্রিজে নিজের গাড়িটা একবার দেখে নিল টের পাচ্ছিলুম যে ও খুব সতর্কভাবে হাঁটছে। ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বন্দ্বে চঞ্চল হয়েছে। তবু আমাে এড়াতে পারছে না। কারণ, আমি ওর ছেলেবেলার এক ভয়ঙ্কর দিন। অন্তত বিগত সময়ে তের বছর বয়সের মেয়ের জীবনের একটি অমোঘ সত্য। আর ও যা অনুভূতিপ্রবণ মেয়ে নিজের রক্তকে যে একবার বুঝেছে, তার মুক্তি নেই।

বাঁধটা নদীর পাশাপাশি ঘুরে জামবনে ঢুকেছে। এই জঙ্গলটা সিকি মাইল একটানা চলেছে এক সময় দুপাশে বিশাল খড়ের জঙ্গল ছিল। এখন আবাদ হয়েছে। সবুজ ধানের মাঠ। অব সদ্য বন্যার গাঢ় ঘোলাটে জল নেমে গিয়ে সবুজ রঙটা হলদে দেখাচ্ছে। ভাগ্যিস শিগগি বন্যার জল নেমে গেল। তাই মাঠটার বিশেষ ক্ষতি হয়নি। কয়েকটি দিনের রোদেই ধা গাছগুলো আবার সামলে নিয়ে মাথা তুলেছে। কোথাও কোথাও একটুকরো পোড়ো জমি ওপর বাবলাবন। সেখানে দূরে, গয়লারা একদঙ্গল গরু মোষ নিয়ে গেছে। বাবলাফল পে খাওয়াচ্ছে প্রাণীগুলোকে। কোথাও কোন ধানের ক্ষেতে একটা চাষী হাঁটু দুমড়ে আগা ওপড়াচ্ছে। দূরে গাছপালার গায়ে ধোঁয়াটে ভাব—কুয়াশার! শিশির শুকিয়ে যাবার প ঘাসফড়িং লালপোকা নীলপোকারা দলে দলে বেরিয়ে পড়েছে। মাকড়সার জালগুলো এখ শুকনো। কোথাও সাপ দেখতে পেয়ে শালিক আর ফিঙ্গে পাখির ঝাঁক তুমুল চেঁচামেচি করছে জামবনে ঢোকার পর ঘন ছায়া এসে আমাদের ঢাকল এবং আমরা দাঁড়িয়ে গেলুম।

বিপাশা সব দেখতে দেখতে বলল—এখানে কোথাও একটা বটগাছ ছিল যেন?

—সেটা কবে উপড়ে গিয়েছিল। তোমার জ্যাঠামশাই তার কাঠ বেচে অনেক টা

পেয়েছিলেন! অবশ্য তোমার বাবার হিস্যেও ছিল।

বিপাশা হাসল। —দায় পড়েছে বাবার! সম্পত্তির লোভ থাকলে গ্রাম ছেড়ে যেতেনই না।

—তা ঠিক। তবে তুমি তখন ছোট ছিলে, জানো না। তোমার জ্যাঠার অত্যাচারেই চলে যান কলকাতা। তোমার মামাই প্ররোচিত করেন, জানতুম। মামা বেঁচে আছেন তো?

—ভীষণ বেঁচে আছেন। এখন তো পাড়ার কাউন্সিলার। রাজনীতির পাণ্ডা। নিউজ পেপারে ওঁর অনেক কীর্তির কথা পেতে পারেন—এখনও।

—খবরের কাগজ কতদিন পড়া হয় না। বনে জঙ্গলে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি।

—যাঃ! ফের বাজে কথা।

—সত্যি বিপাশা, আমি খুনী আসামী।

—মেরে ফেলব পারুদা। আপনি করবেন মানুষ খুন? ইস্! .... আচ্ছা পারুদা ফ্লাডের জল এই উঁচু জায়গাটা নিশ্চয় ডোবাতে পারে না?

—না। কেন?

জানেন? আমার হঠাৎ হঠাৎ ভারি ইচ্ছে করত—নদীর ধারে একটা বাংলো মতো বাড়ি থাকলে কী ভালো লাগত! অবশ্যি, ঘাটশীলা আর নেতারহাটে বাবা দুটো কটেজ কিনেছেন। আমরা মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে থাকি। পাহাড়, পাহাড়, আর পাহাড়! অপূর্ব লাগে! তুমি গেছ কখনও নেতারহাট?

—না।

—এই! আবার তুমি এমন করে তাকাচ্ছ, পারুদা!

—আমাকে 'তুমি' বলছ, বিপাশা! সেই ছেলেবেলার মতো!

সে জিভ কাটল। —সরি! স্লিপ অফ টাং!

—তোমার অবচেতনা থেকে তের বছরের বিপাশা উঠে আসতে চেয়েছে। তুমি তাকে বাধা দিও না।

—কই দিচ্ছি? ... বিপাশা সোৎসাহে বলে উঠল। —তাই তো এবার পুজোয় বাবার পিছনে লেগে লেগে গাঁয়ে নিয়ে এলুম। জানো, সারারাত ঘুমোইনি। শুধু ভেবেছি, কখন সকাল হবে—কখন নদীর ধারে যাবো!

—আশ্চর্য! তোমাকে সভ্যতা এতটুকু বদলাতে পারেনি!

—না, তো বললে ভুল হবে। পেরেছে বইকি। প্রায় সবটাই পেরেছে। এ একটা জাস্ট কৌতূহল বলতে পারেন। প্রিমিটিভ ব্যাপারগুলোর প্রতি কৌতূহল। সভ্যতা মাঝে মাঝে পিছু ফিরে তাকায়।

ওকে খুব সিরিয়াস মনে হল। বললুম—হুঁ। বলে যাও।

—কৌতূহল কী? শুধু স্মৃতির টানে একবার হাত বুলিয়ে দেখতে আসা—কতটা কী বদলেছে। তার মানে—কতটা এগোতে পেরেছি এবং ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছি।

—কোথায় দাঁড়িয়ে আছ, বিপাশা?

—কে জানে। কিছু বুঝতে পারছি না।

—বিপাশা, তোমাকে আমি ওই গাছটার তলায় এক খরার দুপুরে ....

এবার যেন লজ্জায় রাঙা হল না। তবু বাধা দিল। —আমি ভাবিই নি যে আপনি ট্রেচারি করবেন। তা না হলে কি একলা আসতুম? ইস্! কি ভয় না পেয়েছিলুম!

—আর কিছু যন্ত্রণাও।

সে মুখ ঘুরিয়ে বলল — হ্যাঁ। প্রথম কুমারীত্বের স্খলন। খুব কেঁদেছিলুম।

—আনলাকি তেরো! নাকি লাকি থারটিন!

—আপনি কী সাংঘাতিক ছেলে না ছিলেন! ভাগ্যিস, পালিয়ে গিয়েছিলুম।

—আবার আপনি বলছ?

—অ্যাঁ? সরি। .... জানেন—সরি, জানো পারুদা, যার হাতে কুমারীত্ব যায়—তাকে মেয়েরা সারাজীবন মনে রাখে? না—সে ভাবে নয়, ইন দা সেন্স, যন্ত্রণায়—কতকটা গোপন পাপ কিংবা অসুখের ক্ষতচিহ্ন যেমন।

—তোমার সাথে পাপ করেছি সেই তো আমার পুণ্য!

—কী বললেন, কী বললেন?

—তোমার সাথে পাপ করেছি, সেই তো আমার পুণ্য!

—বাঃ! কার লাইনটা?

—নাম বললে তুমি চিনবে কি? তুমি তো হ্যারাল্ড রবিন্স পড়ো।

—মোটেও না। আমি বাংলা বই পড়ি। পারুদা, তুমি কবিতা লেখ না আর?

—না। .... বিপাশা, আমার ভীষণ লোভ জাগছে।

অন্যমনস্ক ভাবে সে বলল—কিসের?

—তোমাকে এখানে আবার একলা পেয়ে—সাতবছর পরে।

সে হঠাৎ জ্বলে উঠল। মুখ ঘুরিয়ে তীব্র দৃষ্টে তাকাল। বলল—তোমার লজ্জা করবে না? এখন তো তুমি বয়স্ক মানুষ! আমিও। সেন্স এবং রেসপনসিবিলিটি দু জনেরই প্রচণ্ড থাকা উচিত।

—তোমার কাছে আমার লজ্জা নেই। আর দায়িত্বজ্ঞান! আমি নির্বিকার—প্রকৃতির মধ্যে আছি, তাই।

মুখ ঘুরিয়ে নিল সে অন্যদিকে। তার নাসারন্ধ্র কাঁপছিল। ঠোঁটও। দীর্ঘ তিন মিনিট সে চুপ করে থাকল। আমিও চুপচাপ তাকে লক্ষ্য করলুম—। তারপর বললুম—শুনেছি, মেয়েরা যাকে ভালবাসে না, তাদের শরীর দিতে পারে না। ভাবে, শরীরই তাদের সব। পুরুষেরা তা কোনদিন ভাবেনি। আজও ভাবে না। অবশ্য মেয়েদের সন্তান ধারণ করতে হয়—সেটাই বড় রিস্ক্। প্রকৃতির রক্ষাকবচ। তবে আজকাল—প্রকৃতির নিয়মকে ফাঁকি দিতে মানুষ পারে। সভ্যতা মানেই তো তাই।

—তুমি আমার সব সুখ নষ্ট করে দিলে, পারুদা।

—কাঁদছ কেন? এতে কান্নার কি আছে?

—কেন? সেক্স্ ছাড়া কি আর কিছু পেলে না এখানে?

—তুমি কান্না থামাও, বিপাশা! আমার অসহ্য লাগছে!

—তুমি আজও তেমনি জানোয়ার! ব্রুট! কাওয়ার্ড! যাও, আমি তোমার কাছে থাকব না।

সে পা বাড়াল। আমি তার সামনে দাঁড়ালুম।—যেও না বিপাশা।

—গায়ের জোরে আজ আমাকে পাবে না! সরে দাঁড়াও।

—না।

—আমি চেঁচাব। লোক ডাকব।

—তোমার মুখ চেপে ধরব।

—তুমি এত অভদ্র আর নীচ হয়ে গেছ? ছিঃ!

—বিপাশা! আমি নিজেকে থামাতে পারছি না। কারণ, তুমি আমার ছিলে একদিন—আজ আবার আমার হাতেই এসেছ।

—না, না। আপনি সরুন।

ওর দুকাঁধে হাত রাখলুম। ছাড়াবার চেষ্টা করল। পারল না। দৃষ্টি মাটির দিকে রেখে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—এখনও বলছি, ছেড়ে দিন। বাঁদরামি করবেন না।

তারপর আচমকা আমার গালে চড় মারল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল প্রকৃতিতে একটা তুমুল হইচই পড়ে গেল। লক্ষ লক্ষ পাখি, প্রজাপতি, ঘাসফড়িং, লালপোকা চঞ্চল হল। নীচে নদীর পাড় ভাঙল প্রচণ্ড শব্দে। একটা হাওয়া এসে পড়ল শনশন করে। দূরে মোষের ডাক শুনতে পেলাম—আঁ-ক্ আঁক ? আমার আদিম অবচেতন শ্রুতির তারে আরও হাজার হাজার শব্দপুঞ্জ প্রতিধ্বনিত হল। সারা শরীরে চোখ ফুটল। আমার দিকে তাকিয়ে অনেক কিছু টের পেতে পেতে বিপাশা অব্যক্ত বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল। তারও ঠোঁট কাঁপতে থাকল। আমাকে সে দেখছিল : একটা ঘনডালপালাওলা হিজল গাছ; পাতায় পাতায় পাখির গু, পোকামাকড় আর জড়িয়ে থাকা সবুজ সাপ, খসখসে ধূসর গুঁড়ি—পলির হলুদ দাগে বিকীর্ণ—শিসের মতো চিরোল ফুলে প্রজাপতি উড়ছিল। এই গাছ বছরের পর বছর কোন গূঢ় প্রতীক্ষায় বেঁচে থেকেছে। মাটির তলায় শেকড়বাকড় শেকলের মতো তাকে বেঁধে ফেলেছে—তবু, হায়, বন্য আদিম বৃক্ষ, একটা কিছু ঘটবে বলে দাঁড়িয়ে আছে এবং দাঁড়িয়েই আছে :...

পরস্পর তাকিয়ে ছিলুম কতক্ষণ। তারপর বিপাশা নড়ে উঠল। কোত্থেকে একটা রুমাল বর করে চোখ মুছে বলল—দাদা আসছেন।

ঘুরে দেখলুম, গ্রামের বাঘা জোতদার সাবির আলির সঙ্গে বাঁধের পথে শতদ্রু আসছে। বির শতদ্রুর আগে আগে কথা বলতে বলতে আসছে। ওর হাতে একটা বন্দুক। শয়তানটা ই সময়ে মনিবের ছেলেকে শিকারে নিয়ে আসছে। কী করব, ভেবে পেলুম না।

শতদ্রুদাকে আমি শাটলেজদা বলতুম। বয়সে আমার চেয়ে অন্তত আট-ন বছরের বড়। ইচ্ছে করছিল তুমুল চেঁচিয়ে বলি—শাটলেজদা। আমি এখানে আছি। কিন্তু সঙ্গে এই পদ।

বিপাশা হাসতে হাসতে বলল—ওকী। লুকোচ্ছ যে আবার?

আশ্চর্য। কত সহজে ও হাসতে পারল। আমি ঠোঁটে আঙুল রেখে বললুম—চুপ। বোল না যে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

একটু তফাতে ঘন ঝোপের আড়ালে গিয়ে দেখতে থাকলুম, কত সহজে মেয়েরা পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে। বিপাশা কোত্থেকে একটা ভিউফাউন্ডার বের করল। চোখে রেখে ওপারের দূর মাঠে কী দেখতে থাকল। তারপর কথা বলতে বলতে এসে পড়ল লোক দুটি। শতদ্রুদা কী মারাত্মক ভোল ফিরিয়েছে। চেনাই যায় না। চুলে পাক ধরেছে দেখে অবাক হলুম। চমৎকার পোশাক পরেছে। স্বাস্থ্যে সভ্যতার রঙ জ্বলজ্বল করছে। শয়তান জোতদারটাও প্যান্ট-বুশশার্ট পরেছে। মোটর সাইকেলেই এসেছে নিশ্চয়।

—হুঁ। গাড়ি দেখেই বুঝেছি, দিদি এখানে আছেন। ... সাবির বলল।

শতদ্রু বলল—শিকারে যাবি তো চলে আয় বিয়াস!

বিয়াস! আমার দেওয়া নামটা এখনও ওরা চালু রেখেছে। গায়ে কাঁটা দিল।

সাবির বলল—এমন করে একাদোকা আসবেন না দিদি। জায়গাটা ভাল নয়।

বিপাশা কোন জবাব দিল না।

শতদ্রু বলল—সব জঙ্গল খতম দেখছি। ওই জমিগুলো কাদের সাবিরদা?

—আপনারা থাকলে আপনাদেরই হত। এখন আপনার জ্যাঠার—স্বনামে বেনামে। আমারও খানিকটা আছে। তবে ফসল ফলানোর রিস্ক আছে। বাঁধ ভাঙলেই তো গেল। দিদি, আসুন। হরিয়াল মারব দেখবেন।

বিপাশা বলল—না।

শতদ্রু বলল—তাহলে চলে যা। গাড়ি চুরি হয়ে যাবে।

বিপাশা দাঁড়িয়েই থাকল। কথা বলতে বলতে ওরা দুজনে চলে গেল। গাছপালার আড়ালে ওরা অদৃশ্য হলে বেরিয়ে এলুম।—এখনও দাঁড়িয়ে আছ, কেন বিপাশা?

—তোমার লাস্ট সিন যে বাকি।

—হুঁ। কিন্তু আমি মেক আপ মুছে ফেলেছি। পোশাক ফেলে দিয়েছি।

—তুমি কি কোনদিনই স্বাভাবিক হবে না পারুদা?

—আমি ভীষণ স্বাভাবিক। বরং তুমিই অস্বাভাবিক। আমাকে চড় মেরেছ।

—এস, গালে হাত বুলিয়ে দিই।

—থাক, তুমি চলে যাও বিপাশা।

—তুমি কোথায় যাবে?

—অজ্ঞাতবাসে। পরিচয়হীন দুর্গমতায়।

—আবার হেঁয়ালি করছ?

ঠিক এসময় আমাদের পিছনে শুকনো পাতার খসখস শব্দ হল। কার পায়ের চাপে একটা কাঠি ভাঙল। ঘুরে দেখি, একটা কাঠকুড়োনি মেয়ে। সে হাঁ করে তাকিয়ে বিপাশাকে দেখছিল

বিপাশাও তাকে দেখছিল। মেয়েটি কাছে এসে বলে উঠল—বাবুদিদি. ইখেনে কী করছেন গো?

—দাঁড়িয়ে আছি।

—কার সঙ্গে কথা বলছিলেন যেন?

—এই যে এঁর সঙ্গে। কেন?

—কার সঙ্গে?

—এই তো। পারুদার সঙ্গে।

—পারু.... মেয়েটির চোখ বড় হয়ে উঠল। পারুবাবু! ও বাবুদিদি, কী বলছেন গো? পারুবাবু যে এই হিজলগাছে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল! শোনেননি?

আমি হাসবার চেষ্টা করলুম। পারলুম না। দেখলুম, বিপাশার ঠোঁট কাঁপছে আবার। হিজলগাছটার দিকে তাকিয়ে আছে নিষ্পলক। তার পা দুটো কাঁপছে, তাও দেখলুম। পার্থিব জড়তার বিপুল চাপে ওর চেতনার কালো স্নিগ্ধ নদী আঁটো হয়ে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ গো। বিশ্বেস না হয়, জিজ্ঞেস করবেন। গত বছর এমনি মাসে বাড়িতে ঝগড়া আর খুনোখুনি করে এসে আত্মহত্যা করেছিল। খুব দেমাকি লোক ছিল যে। বউয়ের সঙ্গে বনত না। দিনরাত অনাছিষ্টি কাণ্ড চলত। শেষ অবধি মনের দুঃখে বউকে খুন করে নিজের প্রাণটা নিলে। ... ওকী বাবুদিদি, আপনার কি হল?

হো হো করে হেসে ফেললুম। কিন্তু আশ্চর্য, আমার হাসি আর মানুষের ভাষা পেল না। সে হাসি বাতাস হল। গাছপালা দুলে উঠল। কিছু হলুদ পাতা ঝর ঝর করে খসে পড়ল। নদীতে আবার পাড় ধসল। লক্ষ লক্ষ পোকামাকড় চঞ্চল হল।

আর বিপাশা টলতে টলতে গাছটা আঁকড়ে ধরল। বিড়বিড় করে বলল—আমি জানতুম! আমি জানতুম! তবু ভুল হয়।

—বাবুদিদি, আপনাকে ধরব?

—না। তুমি যাও!

—আপনি শিগগির বাড়ি যান গো!

—যাচ্ছি। তুমি যাও, চলে যাও তো এখান থেকে!

মেয়েটি তবু দাঁড়িয়ে রইল। আর বিপাশা হু-হু করে নির্লজ্জের মতো কাঁদতে থাকল। তার কুমারীত্বের স্খলন ঘটেছিল এই বনে। আর সেই ঘটনার নায়কটিকে তার মনে জীবিত রেখেছিল। খুনী যেমন খুনের জায়গায় অনিবার্য অবচেতন টানে ফিরে আসে, আসতেই হয়—তেমনি ও এসেছে—আমিও যেমন এসেছিলুম। কিন্তু, এতক্ষণ পরে ওই কাঠকুড়োনি জংলী মেয়েটা আমাকে আবার মৃতদের চিরকালের অতীতে ঠেলে দিল।

বিপাশার অশ্রু আমি নিলুম সারা গায়ে। আমার ডালপালা আর শিষের মতো ফুল সুখে দুলতে লাগল। আমার শ্বাসপ্রশ্বাসে বিপাশার চুল উড়তে থাকল।

হরির হোটেল

স্টেশনে ট্রেন থামতে না থামতেই যাত্রীদের মধ্যে হুলস্থূল বেধে গিয়েছিল। ভিড়ে ঠাসা কামরা। পিছন থেকে প্রচণ্ড চাপ আর গুঁতো টের পাচ্ছিলুম। তারপর দেখলুম, কেউ কেউ আমার কাঁধের ওপর দিয়ে কসরত দেখিয়ে সামনে চলে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে চ্যাঁচামেচি চলেছে। অবশেষে ঠেলা খেতে খেতে যখন প্ল্যাটফর্মে পড়লুম, তখন আমার ওপর দিয়ে অসংখ্য জুতোপরা পা ছুটে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টার পর উঠে দাঁড়িয়ে দেখি, অন্য সব কামরা থেকেও পিলপিল করে মানুষ বেরিয়ে স্টেশনের গেটের দিকে ছুটে চলেছে।

রাগ করে লাভ নেই। কার ওপরই বা রাগ করব! নিমেষে প্ল্যাটফর্ম নির্জন নিঝুম হয়ে গেল। কাঁধের ব্যাগ আর পোশাক ঝেড়েঝুড়ে রুমালে মুখ মুছলুম। ট্রেনটা হুইসল বাজিয়ে আস্তেসুস্থে চলে গেল। সেই সময় হঠাৎ মাথায় এল, ট্রেনে ডাকাতি হচ্ছিল সম্ভবত। তাই অত সব যাত্রী প্রাণভয়ে ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালিয়ে গেল!

এতক্ষণে ভয় পেলুম। রাত আটটা বাজে। প্ল্যাটফর্মে আর স্টেশনঘরে আলো জ্বলছে। গেটে মানুষজন নেই। সেখানে গিয়ে একটু দাঁড়ালুম। ডাকাতরা ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনঘরে ঢুকে হামলা করেছে কি না দেখবার জন্য উঁকি মারলুম।

নাঃ। স্টেশনঘরে উর্দিপরা এক ভদ্রলোক চেয়ারে বসে চোখ বুজে ঝিমোচ্ছেন। তাঁকে বললুম—একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

তিনি চোখ না খুলেই বললেন—পারেন। তবে আপনার বরাতে হরির হোটেল আছে।

অবাক হয়ে বললুম—হরির হোটেল মানে?

—হুঁ। এ তল্লাটে নতুন এসেছেন। যাবেন কোথায়?

—কাঞ্চনপুর।

—সেখানে কার বাড়ি যাবেন?

একটু বিরক্ত হয়ে বললুম—সেখানে আমার বন্ধুর বাড়ি।

রেলকোট পরা ভদ্রলোক এবার চোখ খুলে একটু হেসে বললেন—হুঁ। আপনার বন্ধু আপনাকে এখানকার হালহদিস কিছুই জানাননি দেখছি। তা কী আর করবেন? হরির হোটেল এখন আপনার ভবিতব্য।

কথা না বাড়িয়ে বললুম—গেটে টিকিট নেওয়ার লোক নেই। টিকিটটা নেবেন কি?

—টিকিট কেটেছেন? তা এ তল্লাটে নতুন প্যাসেঞ্জার। টিকিট কাটবেন বৈকি। ইচ্ছে হলে দিন। না হলে দেবেন না।

বুঝলুম, এই ভদ্রলোকই স্টেশনমাস্টার। মাথায় হয়তো ছিট আছে। টিকিটটা ওঁর সামনে টেবিলে রেখে বললুম—আচ্ছা, এবার বলুন তো, অতসব যাত্রী ট্রেন থেকে ওভাবে মরিয়া হয়ে নেমে দৌড়ে পালাল কেন?

—আজ যে শনিবার। তাতে ট্রেন চার ঘণ্টা লেট।

—বুঝলুম না।

—বুঝতে পারবেন। গেট পেরিয়ে নিচের চত্বরে যান।

গেট পেরিয়ে গিয়ে দেখি, কয়েক ধাপ সিঁড়ির নিচে একটা খোলামেলা জায়গা। একপ্রান্তে কিছু দোকানপাট। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় লক্ষ্য করলুম, চত্বর একেবারে জনহীন। আমার সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু নির্মল বলেছিল, স্টেশন থেকে নামলেই বাস, সাইকেল রিকশো বা এক্কা ঘোড়ার গাড়ি একটা কিছু পেয়ে যাব। কিন্তু কোথায় তারা?

একটা চায়ের দোকানে আলো জ্বলছিল। সেখানে গিয়ে বেঞ্চে বসে বললুম—পরের বাস কটায় দাদা?

চা-ওয়ালা আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল—বাবুমশাইয়ের আসা হচ্ছে কোত্থেকে ?

—কলকাতা।

—ঠিক. ঠিক। তা যাওয়া হবে কোথায়?

—কাঞ্চনপুর। পরের বাস কখন আসবে?

—বাবুমশাই! এ রাত্তিরে আর বাস আসবে না। আসবে সেই ভোরবেলা। কেননা রাত্তিরে তো এই স্টেশনে আর কোনও ট্রেন থামে না।

—সাইকেল রিকশো বা এক্কাগাড়ি ?

চা-ওয়ালা হাসল। —আজ্ঞে না। খামোকা কেন রাত্তিরবেলা ওরা আসবে? বাবুমশাই! আপনি বড্ড ভুল করেছেন। আসবার সময় দেখেননি সোনাগড় জংশনে হঠাৎ ট্রেনের কামরায় বেজায় ভিড় হয়েছিল?

মনে পড়ে গেল। বললুম—তুমি ঠিক বলেছ। কামরা একেবারে ফাঁকা ছিল। হঠাৎ ওই জংশনে ভিড়ের চাপে কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিলুম।

—ব্যাপারটা হলো, এ তল্লাটের অসংখ্য লোক সোনাগড়ে কলকারখানায় চাকরি করে। তারা প্রতি শনিবারে বাড়ি ফেরে। রোববারটা কাটিয়ে আবার সোমবার সোনাগড় যায়। আপনি যদি ট্রেন থেকে নেমেই ওদের সঙ্গে দৌড়ে আসতেন, তা হলে হয়তো বাসে বা সাইকেল রিকশো, নয়তো এক্কাগাড়িতে ঢুকে যেতে পারতেন। হ্যাঁ—সহজে পারতেন না। একটু কসরত করতে হতো, এই যা!

এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম। নির্মলের ওপর রাগ হল। এই ব্যাপারটা আমাকে তার খুলে বলা উচিত ছিল।

কিন্তু আর রাগ করে লাভ নেই। তাছাড়া নির্মলের মেয়ের অন্নপ্রাশন কাল রবিবার। আমি কবে যাব, নির্দিষ্ট করে তাকে তো বলিনি! শুধু বলেছিলুম—নিশ্চয় যাব। শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করিস।

বললুম—এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা করা যায় না দাদা?

চা-ওয়ালা গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল—না বাবুমশাই! উনুনে আমার রাতের রান্না শেষ করে জল ঢেলে দিয়েছি। আর চা করার কোনও উপায় নেই।

—আচ্ছা, এখানে হরির হোটেলটা কোথায়?

লোকটা যেন চমকে উঠল।—হরির হোটেল? এর আগে কখনও হরির হোটেলে খেয়েছিলেন নাকি?

—না। আমি এই প্রথম এখানে আসছি। হরির হোটেলের কথা স্টেশনমাস্টারের মুখে শুনলুম।

—ও। হরির হোটেলে যখন যাবার ইচ্ছে হয়েছে, চলে যান। তবে একটু দেখেশুনে যাবেন।

বলে চা-ওয়ালা আমার মুখের সামনেই দোকানের ঝাঁপ ফেলে দিল। এখানে দেখছি সবই অদ্ভুত। লোকজনও অদ্ভুত! হরির হোটেলে যেতে দেখেশুনে যাব কেন? কিছু বোঝা গেল না।

এতক্ষণে চাঁদ আরও উজ্জ্বল হয়েছে। সব দোকানপাট বন্ধ। শুধু শেষদিকটায় আলো জ্বলছে। সেখানে গিয়ে দেখলুম, একটা ঘর খোলা আছে। দরজার কাছে টেবিলের সামনে একজন রোগাটে গড়নের কালো রঙের লোক বসে আছে। পরনে ধুতি আর হাতকাটা ফতুয়া। ভেতরে দু'সারি লম্বা বেঞ্চের সঙ্গে উঁচু ডেস্ক আঁটা। দেখেই বোঝা যায় এটা একটা হোটেল।

এই তা হলে হরির হোটেল? লোকটি আমাকে দেখেই কেন যেন সবিনয়ে করজোড়ে নমস্কার করল। আমিও নমস্কার করে বললুম—এটাই কি হরিবাবুর হোটেল?

সে জিভ কেটে মাথা নেড়ে বলল—আজ্ঞে স্যার, দয়া করে আমাকে বাবু বলবেন না। আমি একজন সামান্য লোক। বাইরে টাঙানো সাইনবোর্ড দেখুন! লেখা আছে অন্নপূর্ণা হোটেল। কিন্তু এ তল্লাটে সবাই বলে হরির হোটেল।

ঠিক এই সময় আমার মনে পড়ে গেল, আজ বেলা এগারোটায় খেয়েছি। তারপর ট্রেনে বার তিনেক বিস্বাদ চা। আর একই সময়ে ডাল-ভাত-মাছের ঝোলমিশ্রিত লোভনীয় খাদ্যের তীব্র ঘ্রাণ আমার বাঙালি পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধার উদ্রেক করল।

সটান হোটেলে ঢুকে কাছের বেঞ্চে বসলুম। ব্যাগটা একপাশে রেখে বললুম—আমার খুব খিদে পেয়েছে। শীগগির ব্যবস্থা করুন হরিবাবু। ডাল-ভাত যা হোক—

হরি ডাকল—খ্যাঁদা! ও খেঁদু! ঘুমোলি নাকি?

ভেতর থেকে ঢোলা হাফপ্যান্টপরা একটা নাদুসনুদুস গোলগাল গড়নের যুবক এসে একগাল হেসে বলল—তখন তোমাকে বলেছিলুম না হরিদা, দু'মুঠো চাল বেশি করে দিই? আর তরকারি তো অনেক আছে।

হরি বলল—তা হলে স্যারকে একখানা পুরো মিল দে।

কিছুক্ষণের মধ্যে গোগ্রাসে এক থালা ভাত-ডাল-তরকারি-মাছ পরম তৃপ্তিতে খেয়ে ঢেঁকুর উঠল। হাতমুখ ধুয়ে এবং মুছে বললুম—অপূর্ব! খাসা আপনার হোটেলের রান্না! খেয়ে এমন তৃপ্তি জীবনে পাইনি!

হরি বলল—অথচ ব্যাটাচ্ছেলেরা আমার হোটেলের বদনাম রটায়! কী আর বলব স্যার? আমার নামে থানায় পুলিশের কাছে নালিশ পর্যন্ত করেছিল। যাকগে সে-সব কথা। আপনি আমার অতিথি। আপনার কাছে দাম নেব না!

কিছুতেই হরি মিলের দাম নিল না। অবশেষে বললুম—ঠিক আছে। তা হলে আমাকে রাত্রে থাকার জন্য একটা ঘর ভাড়া দিন।

হরি জিভ কেটে বলল—ঘর তো নেই স্যার! আমার হোটেল শুধু খাওয়ার হোটেল। এখানে থাকার ব্যবস্থা নেই। আমি আর খ্যাঁদা ওপরের ঘরে রাত্তির কাটাই। নিচে কি থাকবার জো আছে? নানা উপদ্রবের চোটে অস্থির হতে হবে।

—কী উপদ্রব? হরিবাবু! আমি এই বেঞ্চে শুয়ে রাত কাটাতে পারব। কোনও উপদ্রব গ্রাহ্য করব না।

হরি হাসল। —আপনার মাথা খারাপ? কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমারও খিদে পেয়েছে। তা আপনি যাবেন কোথায়?

—কাঞ্চনপুর।

—দিব্যি জ্যোছনা রাত্তির! মোটে তো তিন কিলোমিটার রাস্তা। হাঁটতে হাঁটতে চলে যান। কোনও ভয় করবেন না। আমাদের এ তল্লাটে আর যা কিছু থাক, চোর-ছিনতাইবাজ-ডাকাত নেই। মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে চলে যান।

অগত্যা হোটেল থেকে বেরিয়ে আসছি, হরি হঠাৎ ব্যস্তভাবে ডাকল—স্যার! শুনুন স্যার!

ঘুরে দাঁড়ালুম। সে আমাকে অবাক করে ছ'টা অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট আমার হাতে গুঁজে দিল। বললুম—অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট কী হবে?

হরি মুচকি হেসে বলল—বাইরের মানুষ! হরির হোটেলে খেয়েছেন। যদি দৈবাৎ অম্বল হয়-টয়! আপনি আমার এ রাত্তিরের একমাত্র খদ্দের স্যার! আপনি আমার সার্টিফিকেটও বটে।

বলে সে হোটেলে ফিরে গেল। আমি এতক্ষণে একটু চিন্তায় পড়লুম। খেতে তো সবই সুস্বাদু মনে হচ্ছিল। তাই খেয়েছিও প্রচুর। প্যান্টের বেল্ট ঢিলে করতে হয়েছে। কিন্তু অ্যান্টাসিড কেন?

দু'ধারে মাঠ। নির্জন পিচরাস্তায় গুনগুন করে সত্যিই মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে হাঁটছিলুম। জ্যোৎস্নায় চারদিক বেশ স্পষ্ট। কিছুদূর চলার পর মনে হলো পেট বেজায় ওজনদার হয়ে উঠছে। তখন দুটো অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট মুখে পুরে চুষতে থাকলুম।

আরও কিছুদূর হাঁটার পর পেটের ওজন কমেছে মনে হল। সেইসময় নেহাতই খেয়ালবশে একবার পিছু ফিরে দেখি, আমার পিছনে কেউ হেঁটে আসছে। একজন সঙ্গী পাওয়া গেল ভেবে দাঁড়িয়ে গেলুম। অমনি সেই লোকটাও দাঁড়িয়ে গেল। বললুম—কে?

কোনও সাড়া এল না। একটু ভয় পেলুম। ছিনতাইবাজ বা ডাকাত নয় তো? চলার গতি বাড়ালুম। তারপর এক অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ্য করলুম। যতবার পিছনে তাকাচ্ছি, দেখছি জ্যোৎস্নায় কালো রঙের মূর্তির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। রাস্তার দু'পাশের মাঠ থেকে একজন-দু'জন করে আরও লোক এসে সেই ছায়ামিছিলকে বাড়িয়ে তুলছে। অবশেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে চ্যাঁচামেচি করে বললুম—তোমরা যেই হও, আমার কাছে ডাকাতি করার মতো মালকড়ি নেই। বন্ধুর মেয়ের অন্নপ্রাশনে উপহার দিতে কিছু পুতুল আর জামা কিনেছি। নগদ টাকাকড়ি যা আছে,

তা তোমরা কেড়ে নিয়ে ভাগাভাগি করলে প্রত্যেকে একটা আধুলির বেশি পাবে না। কাজেই তোমরা কেটে পড়ো।

আশ্চর্য ব্যাপার, কালো-কালো মানুষের দল স্থির দাঁড়িয়ে আছে। তারপর আবার কিছুটা হেঁটে গিয়ে ঘুরে দেখি, তারা সমান দূরত্বে আমাকে অনুসরণ করছে। এরা কারা? অজানা ত্রাসে শিউরে উঠলুম। সাহস দেখিয়ে খুব চেঁচিয়ে বললুম—সাবধান! আমার কাছে রিভলভার আছে। আমি কিন্তু পুলিশের লোক। গুলি করে মুণ্ডু উড়িয়ে দেব।

কিন্তু এই হুমকিতেও কাজ হলো না। আমি যত দ্রুত হাঁটছি, তারা একই দূরত্বে নিঃশব্দে হেঁটে আসছে। আমি থমকে দাঁড়ালে তারাও দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

এই অদ্ভুত ছায়াকালো মিছিল পিছনে নিয়ে হেঁটে চলা সহজ ছিল না। আমার গলা তৃষ্ণায় শুকিয়ে গেছে। সঙ্গে জলের বোতল নেই। এমনকি একটা টর্চও আনিনি। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে আমি দৌড়ুতে শুরু করলুম। দৌড়ুতে দৌড়ুতে যতবার পিছু ফিরে তাকাচ্ছি, সেই বিভীষিকা আমাকে অনুসরণ করছে।

কিছুক্ষণ পরে সামনে ঘন কালো গাছপালার ফাঁকে রাস্তার ধারে একটা মন্দির দেখতে পেলুম। মন্দিরের উঁচু খোলা চত্বরে কারা বসে কথা বলছিল। আমি দৌড়ে গিয়ে সেখানে দাঁড়াতেই লোকগুলো হইচই করে উঠল।—কে ? কে ?

হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম—আমি।

কেউ ধমকে বলল—আমি কে ?

—আজ্ঞে আমি কলকাতা থেকে আসছি। যাব কাঞ্চনপুর। বাস ফেল করে বড় বিপদে পড়েছি।

একজন বলল—তাই বলুন। তা বিপদটা কী?

—একদল কালো-কালো লোক আমাকে ফলো করে আসছে।

—সর্বনাশ! আপনি কি হরির হোটেলে খেয়েছেন?

—খেয়েছি। বড্ড খিদে পেয়েছিল।

অমনি আবার হইচই পড়ে গেল। —ওরে! এ হরির হোটেলে খেয়েছে রে! কী সর্বনাশ! আবার একা নয়, সঙ্গে হরির হোটেলে খাওয়া পুরো দলটাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের গাঁয়ে এসেছে।

এইসব বলতে বলতে লোকগুলো মন্দিরের পিছনে উধাও হয়ে গেল। তারপর গ্রামের কুকুরগুলো ডাকতে লাগল। আমি এবার কী করব ভাবছি, সেইসময় দেখলুম উঁচু চত্বরের পাশে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। বললুম—দেখুন তো মশাই, কী অদ্ভুত ব্যাপার? বিপদে পড়ে এখানে ছুটে এলুম। অথচ ওঁরা অমন করে পালিয়ে গেলেন!

লোকটি খিকখিক করে হেসে বলল—পালাবারই কথা। আপনি হরির হোটেলে খেয়েছেন কি না!

করুণ স্বরে বললুম—কেন? হরির হোটেলে খেলে কী হয়?

—যে খায়, সে ভেদবমি করে টেঁসে যায়।

—আমি কিন্তু টেঁসে যাইনি। হরিবাবু আমাকে অ্যান্টাসিড দিয়েছিলেন। দুটো খেয়েছি।

—দুটোতে কাজ হয় না মশাই! এখনও আপনার পেটে হরির হোটেলের ভাত আছে তো! তারই গন্ধে যত গণ্ডগোল বেধেছে। কারা আপনাকে ফলো করেছে বলছিলেন যেন?

—হ্যাঁ। একজন-দু'জন করে অন্তত তিরিশ-চল্লিশ জন হবে। জ্যোৎস্নায় সব কালো-কালো মূর্তি।

—তারা হরির হোটেলে খেয়ে টেঁসে গেছে। কথায় বলে, স্বভাব যায় না মলে। হরির রান্নাটা যে সুস্বাদু! সেই লোভে পড়ে পেট পুরে খেলেই কেলেঙ্কারি। ওরা ভেদবমি করে টেঁসে গিয়েছে বটে, কিন্তু লোভটা যায়নি। আপনার পেট থেকে হরির সুস্বাদু রান্নার গন্ধ টের পেয়েই ওরা আপনার পিছু নিয়েছে। বুঝলেন তো?

—বুঝলুম। কিন্তু আপনি দয়া করে আমাকে কাঞ্চনপুরে পৌঁছে দিন।

—কাঞ্চনপুর আরও প্রায় এক কিলোমিটার। সেখানে কাদের বাড়ি যাবেন?

—নির্মল সিংহের বাড়ি।

—ও! সিঙ্গিমশাইদের বাড়ি ? চলুন। আমার বাড়িও ওই গ্রামে। তবে সাবধান, আপনি আগে-আগে চলুন। আমি যাব পেছনে!

—কেন? আমাকে কি আপনি ভয় পাচ্ছেন?

—কিচ্ছু বলা যায় না! হরির হোটেলে এ পর্যন্ত যারা খেয়েছে তারা সবাই টেঁসে গেছে।

—আহা! বলছি তো আমার কিছু হয়নি!

লোকটি খিকখিক করে হেসে বলল—টাটকা টেঁসে যাওয়া বডি তো! তাই প্রথম প্রথম কিছু টের পাওয়া যায় না। মনে হয়, এই তো দিব্যি আমার বডিখানা আস্ত আছে! কিন্তু আত্মার ভ্রম। আসলে বডি কখন চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

—কী অদ্ভুত !

—মোটেও না। এমন হতে পারে আপনার বডির স্মৃতি আপনাকে এখনও আস্ত রেখেছে। যাক্ গে। চলুন। পিছনে তাকাবেন না। আমিও তাকাব না।

কিছুদূর হেঁটে যাওয়ার পর বললুম—দেখুন! আপনার যেমন আমাকে ভয় করছে, তেমনি আমারও আপনাকে ভয় করছে! কখন পিছন থেকে আপনি কী করে বসবেন!

—ঘাড় মটকে দেব বলতে চান?

—যা অবস্থা, তাতে এবার ওটুকুই যা বাকি।

—বাজে কথা বলবেন না! আপনি বড্ড অকৃতজ্ঞ মানুষ তো!

—আমাকে মানুষ বললেন যখন, তখন আর আমাকে ভয় কেন? বরং আপনার ভয় পাওয়া উচিত যারা আমাকে ফলো করে আসছিল, তাদের।

লোকটি থমকে দাঁড়াল।—এই রে! একেবারে ভুলে গেছি। আমার জামার পাশপকেটে টর্চ [illegible]। বের করা যাক। আগে আপনাকে টর্চের আলোয় দেখে নিই। তারপর এখনও কেউ [illegible] করছে কিনা দেখা যাক।

[illegible]ল আমাকে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে টর্চের

আলো ফেলল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সেই আলোয় দেখলুম, একদঙ্গল আস্ত কঙ্কাল ছিটকে দু'ধারে গাছপালার মধ্যে লুকিয়ে পড়ল।

আর লোকটাও সেই দৃশ্য দেখে প্রচণ্ড বেগে দৌড়ে কোথায় উধাও হয়ে গেল। আমার সৌভাগ্য, তার হাত থেকে জ্বলন্ত টর্চটা ছিটকে পড়েছিল। সেটা আমি কুড়িয়ে নিয়ে এবার নির্ভয়ে হেঁটে চললুম।

মাঝে মাঝে পিছু ফিরে টর্চের আলো ফেলছিলুম। কিন্তু আর কেউ আমাকে অনুসরণ করছিল না। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর রাস্তার বাঁকের মুখে মোটর সাইকেলের উজ্জ্বল আলো দেখা গেল। তারপর মোটর সাইকেলটা আমার কাছে এসে থেমে গেল। নির্মলের সাড়া পেলুম।—যা ভেবেছিলুম! এতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করে হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, আজ তো শনিবার। পুঁটু কি অত ভিড়ের মধ্যে বাসে উঠতে পারবে? হ্যাঁ রে! হেঁটে আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো? আয়! ব্যাকসিটে বস! দোষটা আমারই। বুঝলি?

মোটর সাইকেলের ব্যাকসিটে চুপচাপ উঠে বসলুম। যা ধকল গেছে, এখন আর কোনও কথা নয়।

নাঃ। পরেও আর কোনও কথা নয়। এমনকি হরির হোটেলে খাওয়ার কথাও চেপে যাব। হরির দেওয়া অ্যান্টাসিডের ট্যাবলেট দেখিয়ে বলব—রাতে কিছু খাব না! পেটের অবস্থা ভালো না। তা ছাড়া আমি হরির হোটেলে খেয়ে এসেছি শুনলে নির্মল নির্ঘাত আমাকে ফেলে পালানোর চেষ্টা করবে। তার মানে, মোটর সাইকেলের অ্যাকসিডেন্ট এবং আমি নিজেই ভূত হয়ে যাব। সর্বনাশ!

শুধু একটাই ভাবনা, হরির হোটেলের ভাত যতক্ষণ না পুরো হজম হচ্ছে, ততক্ষণ কি নির্মলের বাড়ির আনাচে-কানাচে সেই ছায়াকালো-কালো মিছিলের মূর্তিগুলো গন্ধ শুঁকতে ঘুরঘুর করে বেড়াবে? দেখা যাক।..........